# শরৎ-তর্পণ

প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যসমালোচকদের চোখে
শরৎ-সাহিত্যের মূল্যায়ন

রীডার্স কর্নার
৫ শঙ্কর ঘোষ লেন । কলিকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ—রাসপূর্ণিমা, ১৩৬৬

প্রচ্ছদ
শ্রীসমর দে

প্রকাশক ও মুদ্রক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ
বোধি প্রেস। ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন। কলিকাতা ৬

# সূচীপত্র

# ভূমিকা

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির গ্রন্থাগুলিরূপে 'শরৎ-তর্পণ' প্রকাশিত হল। আমাদের সাধ্য সামান্য; কিন্তু আন্তরিক প্রয়াসের ত্রুটি করিনি। 'শরৎ-তর্পণে' সংকলিত রচনাগুলির মাধ্যমে শরৎ-প্রতিভার নানা দিক উন্মোচিত হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

শরৎচন্দ্রের কোন সুস্পষ্ট সমাজচিন্তা ছিল কি? তিনি কি সত্যই নারীর স্বাধিকার বিষয়ে কুণ্ঠহীন? ১৯১৬ সালের পরবর্তী পর্বায়ে তিনি ক্রমশঃ সমাজপ্রগতির আলোকে সনাতন ধর্ম ও সংস্কার সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন? এই ধরনের আরো অনেক প্রশ্ন উঠতে পারে। উত্তর নিয়ে মতভেদ আছে, থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। কালোত্তীর্ণ জীবনশিল্পীরা তাঁদের কল্পজগতের নরনারীদের মধ্য দিয়ে এমন অনেক প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, যেগুলি তাঁদের সমকালকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে; তাঁদের পূর্বতন সংস্কারের প্রত্যয়মূল শিথিল হয়ে গেছে। তার মানে এই নয় যে, জীবনশিল্পী সমাধানের পথ পেয়ে গেছেন। হৃদয়ভাত সত্যের পথরেখা এত সহজে চোখের সামনে ফুটে ওঠে না। কিন্তু দেশকালের আলোড়নটা সত্য।

শরৎ-সাহিত্যে সমকালীন সমাজের সেই আলোড়ন সত্য হয়ে উঠেছে। তিনি যে 'বেদনার কেন্দ্রে বাণীর স্পর্শ' দিয়েছেন। তাই অসামান্য নরনারী তাঁর ভুবনে বিরল; সকলে আমাদেরই আপনজন। তাই তাদের ব্যর্থতা, বঞ্চনা, ক্লিন্নতা আমাদের অভিভূত করে।

শরৎ-তর্পণে কিছু পুনর্মুদ্রণ আছে। 'শরৎ-বন্দনা' নামে একটি গ্রন্থ লেখকের পঞ্চাশৎবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য; তাই একালের পাঠকদের জন্য সেকালের বন্দনাংশও যোগ করে দেওয়া হল।

অবনীনাথ রায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, কবিশেখর কালিদাস রায়, ডঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী, অধ্যাপক অচ্যুত গোস্বামী, ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, ডঃ দীপ্তি ত্রিপাঠী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ প্রথিতযশা সুধীসাহিত্যিকদের শরণ নিয়ে আমরা 'পিতৃ-তর্পণ' করলাম। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের প্রবন্ধ দুটিও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

কতগুলি রচনা গ্রন্থকেন্দ্রিক, কয়েকটি চরিত্রভিত্তিক। নারীর মূল্য, বিপ্রদাস, বিন্দুর ছেলে, চন্দ্রনাথ, অরক্ষণীয়া, শেষপ্রশ্ন সম্পর্কে যেমন আলোচনা আছে তেমনি সাবিত্রী, কিরণময়ী, জ্ঞানদা প্রমুখের চরিত্রবিচারও অবহেলিত হয়নি।

অনীতা গুপ্ত উনিশ-শতকীয় নবজাগরণের প্রেক্ষিতে শরৎ-সাহিত্যে নারী-মুক্তিচেতনার স্বরূপ সন্ধান করেছেন, মঞ্জুলা ভট্টাচার্য যাচাই করেছেন শরৎ-চন্দ্রের রবীন্দ্র-বিরোধিতার ভিত্তি। গোপাল হালদার, বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রমুখের প্রবন্ধ আমাদের শরৎ-ভাবনাকে দীপিত করেছে।

যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের মূল্যবোধও পরিবর্তিত হয়। ইদানীংকালের বাংলা সাহিত্য শরৎ-ঐতিহ্য পেরিয়ে এসেছে। কল্লোলের কালে তাঁর 'উজ্জ্বল উপস্থিতি' যতটা সত্য, আজ হয়ত ততটা নয়। তরুণ আলোচক পূষণ গুপ্ত, দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় এবং যশস্বিনী ডঃ দীপ্তি ত্রিপাঠীর মূল্যায়নে সে-বিষয়ে কিছু আন্তরিক প্রয়াস আছে। ডঃ ত্রিপাঠী ও অধ্যাপক অচ্যুত গোস্বামীর বিশ্লেষণ আধুনিক ঔপন্যাসিকরূপে শরৎচন্দ্রের স্থিরীকৃত আসনটির মহিমা নির্দেশ করেছে। বৈরাগ্য চক্রবর্তীর সাম্প্রতিক শরৎ-বিতর্কের খতিয়ানও কৌতূহলোদ্দীপক।

লাইনো হরফে সুমুদ্রিত এই বইটি সহৃদয় শিক্ষক-পাঠকবর্গের আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হবে না, ভরসা করি। সকলের যোগেই জাতির 'শরৎ-তর্পণ' সার্থক হয়ে উঠুক।

# মাতৃভাষা ও সাহিত্য

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গোড়াতেই বলিয়া রাখা ভাল, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি যে সাহিত্যের সকল দিক ও বিভাগ লইয়া প্রকাণ্ড একটা কাণ্ড বাধাইয়া দিতে পারিব, আমার এমন কোন মহৎ উদ্দেশ্য বা ভরসা নাই। তবে মাতৃভাষা এবং সাহিত্যের সাধারণ ধর্ম এবং প্রকৃতি এই ক্ষুদ্র স্থানে যতটা সম্ভব আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব মাত্র। আমার উদ্দেশ্য বৃহৎ নহে; অতএব যিনি বৃহৎ একটা আশা লইয়া আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পড়িতে বসিবেন, তাঁহার আশার তৃপ্তি সাধন করিতে আমি একান্ত অপারগ।

একটা কথা আমার অত্যন্ত দুঃখের সহিত মনে পড়িতেছে, আমার জীবনে আমি এমন দুই একটি কৃতবিদ্য বাঙ্গালীকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিয়াছি, যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষাগুলাই কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াও মাতৃভাষা জানা এবং না-জানার মধ্যে কোন পার্থক্যই দেখিতে পাইতেন না। তাঁহারা সব কটাই পাস করিয়াছেন এবং সরকারি চাকরিতে হাজার টাকা বেতন পাইতেছেন। অর্থাৎ যেসব অদ্ভুত কাণ্ড করিতে পারিলে বাঙ্গালী সমাজে মানুষ প্রাতঃস্মরণীয় হয়, তাঁহারা সেই সব করিয়াছেন। অথচ বাঙ্গলায় একখানা চিঠি পর্যন্ত লিখিতে পারিতেন না। অবশ্য, না শিখিলে কিছুই পারা যায় না—ইহাতেও অত দুঃখের কথা নাই, কিন্তু বড় দুঃখের কথা এই যে, তাঁহারা নিজেদের এই অক্ষমতাটা বন্ধু-বান্ধবের কাছে আহ্লাদ করিয়া বলিতে ভাল বাসিতেন। লজ্জাব পরিবর্তে শ্লাঘা বোধ করিতেন অর্থাৎ ভাবটা এই যে, এত ইংরিজি শিখিয়াছি যে, বাঙ্গলায় একখানা চিঠি লিখিবার বিদ্যাটুকু পর্যন্ত আয়ত্ত করিবার সময় পাই নাই। জানি না, এ রকম হাজার টাকার বাঙ্গালী আরো কত আছেন, কিন্তু এটা যদি তাঁহারা জানিতেন যে মাতৃভাষা না শিখিয়াও ঐ অতটা পর্যন্তই পারা যায়, কিন্তু তার ঊর্ধ্বে যাওয়া যায় না, ঐ চলা-বলা-খাওয়া-টাকা রোজগার পর্যন্তই হয়, আর হয় না, যথার্থই বড় কাজ, যা করিলে মানুষ অমর হয়, যাঁর মৃত্যুতে দেশে হাহাকাব উঠে, তেমন বড় কর্মী কিছুতেই হওয়া যায় না, তাহা হইলে নিজেদের ঐ অক্ষমতার পরিচয় দিবার সময় অমন করিয়া হাসিয়া আকুল হইতে পারিতেন না।

তাই আজ আমি এই কথাটাই আপনাদিগকে বিশেষ করিয়া স্মরণ করাইতে চাই যে, যথার্থ স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তার সাক্ষাৎ মাতৃভাষা ভিন্ন ঘটে না। যথার্থ বড় চিন্তার ফল সংগ্রহ করিবার পথ মাতৃগৃহদ্বারের ভিতর দিয়াই। বাঙ্গালী যখন বাঙ্গালী, সে যখন সাহেব নয়, তখন বিজাতি ভাষার মস্ত বড়

ফাটকের সম্মুখে যুগযুগান্তর দাঁড়াইয়াও কোনদিনই সে পথের সন্ধান পাইবে না।

একথা শুধু ইতিহাসের দিক দিয়াই সত্য নহে, মনোবিজ্ঞান ও ভাষা-বিজ্ঞানের দিক দিয়াও সত্য।

কেন যে আজ পর্যন্ত জগতে, মানুষ যত কিছু বড় চিন্তা করিয়া গিয়াছেন সে সমস্তই মাতৃভাষায়, বৈষয়িক উন্নতির অবনতির ফলে এক একটা ভাষা সাময়িক প্রাধান্য এবং ব্যাপকতা লাভ করা সত্ত্বেও এবং সেই ভাষা সর্বতোভাবে আয়ত্তাধীন থাকা সত্ত্বেও কেন যে চিন্তাশীল ভাবুকেরা নামের লোভ ত্যাগ করিয়া নিজেদের অমূল্য চিন্তারাশি মাতৃভাষাতেই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কেন মাতৃভাষা ভিন্ন অপরের ভাষায় বড় চিন্তায় অধিকার জন্মায় না, এই সত্যটা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে গেলে প্রথমতঃ ভাষা বিজ্ঞানের দুটো মূল কথা মনে করিয়া লওয়া উচিত।

ব্রহ্মাণ্ডে আছে কি? আছে আমার চৈতন্য এবং তদ্বিষয়ীভূত যাবতীয় পদার্থ। আন্তর্জগৎ এবং বাহ্যজগৎ। উভয়ে কি সম্বন্ধ এবং সে সম্বন্ধ সত্য কিম্বা অলীক. সে আলাদা কথা। কিন্তু এই যে পরিচয় গ্রহণ, একের উপরে অপরের কার্য. ইহাই মানবের ভাব এবং চিন্তা। এবং এই পদার্থ নিশ্চয়ই মানবের চিন্তার বিষয়। এমনি করিয়াই সমস্ত স্থূল বিশ্ব একে একে মানবের ভাব-রাজ্যের আয়ত্ত হইয়া পড়ে। ঘর, বাড়ী, সমাজ, দেশ প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ এক এক একটি চিন্তার জন্মদান করিয়া ইহারাই মানবচিত্তে এক একটি ভাব উৎপন্ন করে। অন্তর্জগৎ ও বাহ্যজগৎ উভয়েই বিচিত্র তথ্য ও ঘটনায় ভরিয়া উঠে। উভয় জগতের এই সব তথ্য ও ঘটনা ছাড়া মানুষ ভাবিতেই পারে না। অর্থাৎ ইহাদের দ্বারাই মানবচিত্ত আন্দোলিত হইয়া ইহাতেই পরিপূর্ণ হইয়া যায়। এক কথায় ইহারা ভাব ও ভাবনার কারণও বটে, ইহারা তাহার বিষয়ও বটে।

এইবার মনের মধ্যে পদার্থের পরীক্ষা হইতে থাকে। ভাব ও চিন্তার কাছে তাহাদের প্রকৃতি ও স্বরূপ ধরা পড়ে। ধর্ম ও গুণের হিসাবে নানা লক্ষণ-বিশিষ্ট হইয়া বাহ্যজগৎ এইবার ধীরে ধীরে সীমাবদ্ধ বা নির্দিষ্ট হইতে থাকে।

মানবের ভাব ও চিন্তাই যাবতীয় পদার্থে গুণের আরোপ করে। সে কি, আর একটার সহিত তাহার কি প্রভেদ স্থির করিয়া দেয়। তারপর পদার্থের সহিত পদার্থের তুলনা করিয়া সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া লক্ষণ নির্ণয় করিয়া ধর্ম-বিশিষ্ট করিয়া আমরা তাহাদের ধারণা কার্য সম্পূর্ণ করি।

বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন সময়ের মানব চিন্তা প্রণালী পর্যালোচনা করিলে স্পষ্ট দেখা যায়, এই চিন্তা-প্রণালী কয়েকটা সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত। একই নিয়মে মানবের চিন্তারাশি পরিপক্ক ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

যেমন বাহ্যজগতে দেখা যায় দুটি বস্তু একই সময়ে একই স্থানে অধিকার

করিতে পারে না, অন্তর্জগতেও ঠিক তাই। সেখানেও কোন দুটি বস্তু এক সঙ্গেই চিত্ত অধিকার করিতে পারে না। সেই জন্যই আমরা কোনমতেই এক সঙ্গে একই আয়াসে দুটি বস্তুর পরিচয় লাভ কিম্বা একটি বস্তুর দুটি গুণ নির্ণয় করিতে পারি না। আমরা বিষয় ভাগ করিয়া একটি একটি করিয়া লক্ষণ স্থির করি। অর্থাৎ চিন্তার কার্য ক্রমশঃ নিষ্পন্ন হয়। অন্তর্জগতে, মন যেমন দুটি বস্তু বা দুটি গুণ একসঙ্গে গ্রাহ্য করে না, বাহ্যজগতে পদার্থও তেমনি তাহার সবকটা গুণই একই সময়ে মানবচিত্তের কাছে প্রকাশ করে না। যুবতী রমণীর রূপ শিশুচিত্তের কাছে ধরা দেয় না। যে রূপের মূল্য উপলব্ধি করিবার জন্য শিশুচিত্তকে একটা নির্দিষ্ট বয়সের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয়।

এইজন্য ভাবের ক্রমিক বিকাশ, বয়োবৃদ্ধি ও ধারণাশক্তির বিকাশের উপর নির্ভর করে। এবং তাহার উপর ভাব ও চিন্তার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

কিন্তু চিন্তা-পদ্ধতির সর্বাপেক্ষা সাধারণ নিয়ম এই যে, পুরাতন ভাব ও ধারণার ভিত্তি অবলম্বন না করিয়া, প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত চিন্তাস্রোতে গা ভাসান না দিয়া মানবচিত্ত কোন মতেই নূতন ধারণা বা নূতন ভাব আয়ত্ত করিতে পারে না। জ্ঞাত ও সুনির্দিষ্ট পদার্থনিচয় অতীত দিনে যেভাবে চিত্তকে নাড়া দিয়া তাহার গুণ ও ধর্মের কাহিনী জানাইয়া দিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ তাহার সম্বন্ধে মনের মধ্যে যে জ্ঞান জন্মিয়া রহিয়াছে, সেই জ্ঞানের সহিত তুলনা না করিয়া কোনমতেই মানুষ পদার্থের নূতন লক্ষণ ও ধর্মের পরিচয় পাইতে পারে না।

যেমন করিয়া এবং যে যে উপায়ে শিশুচিত্তে প্রথম চৈতন্যের বিকাশ ঘটিয়াছিল, জানিয়া এবং না-জানিয়া যে সকল পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সেই তরুণ চিত্ত, ভাব, চিন্তা ও ধারণায় অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, যে সমস্ত জল হাওয়া ও আলোক পাইয়া তাহার জ্ঞানের অঙ্কুর পল্লবিত হইয়া আজ শাখা-প্রশাখায় বড় হইয়াছে, সেই জল হাওয়া আলোককে বাদ দিয়া আর একটা অভিনব প্রণালীতে মানবচিত্ত কোনমতেই নূতন জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। অর্থাৎ যেমন করিয়া সে মাতৃক্রোড়ে বসিয়া চিন্তা করিতে শিখিয়াছিল, মরিবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে সে-পথ ছাড়িয়া যাইতে পারে না—পুরাতন জ্ঞানকে অস্বীকার করিয়া পুরাতন পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া, কাহারোই নূতন জ্ঞান, নূতন চিন্তা জন্মে না।

আরো একটা কথা। ভাব ও চিন্তা যেমন ভাষার জন্ম দান করে ভাষাও তেমনি চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত, সুসম্বদ্ধ ও শৃঙ্খলিত করে। ভাষা ভিন্ন ভাবা যায় না। একটুখানি অনুধাবন করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন একটা ভাষা মনে মনে আবৃত্তি করিয়াই চিন্তা করে—যেখানে ভাষা নাই, সেখানে চিন্তাও নাই।

আবার এইমাত্র বলিয়াছি, পুরাতন নিয়মকে উপেক্ষা করিয়া, পুরাতনের উপর পা না ফেলিয়া নূতনে যাওয়া যায় না—আবার ভাষা ছাড়া সুসম্বন্ধ চিন্তাও হয় না—তাহা হইলে এই দাঁড়ায় বাঙ্গালী বাঙলা ছাড়া চিন্তা করিতে পারে না, ইংরাজ ইংরাজি ছাড়া ভাবিতে পারে না। তাহার পক্ষে মাতৃভাষা ভিন্ন যথার্থ চিন্তা যেমন অসম্ভব, বাঙ্গালীর পক্ষেও তেমনি। তা তিনি যত বড় ইংরাজি জানা মানুষই হউন, বাঙলা ভাষা ছাড়া স্বাধীন, মৌলিক বড় চিন্তা কোনমতেই সম্ভব হইবে না।

এসব বিজ্ঞানের প্রমাণিত তথ্য। ইহার বিরুদ্ধে তর্ক চলে না। চলে শুধু গায়ের জোরে, আর কিছুতে না।

যে ভাষায় প্রথম মা বলিতে শিখিয়াছি, যে ভাষা দিয়া প্রথম এটা ওটা সেটা চিনিয়াছি, যে ভাষায় প্রথমে 'কেন' প্রশ্ন করিতে শিখিয়াছি, সেই ভাষার সাহায্য ভিন্ন ভাবুক, চিন্তাশীল, কর্মী হইবার আশা করা আর পাগলামী করা এক। তাই যে কথা পূর্বে বলিয়াছি, তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতেছি, পর-ভাষায় যত বড় দখলই থাক, তাহাতে ঐ চলা-বলা-খাওয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা, টাকা রোজগার পর্যন্তই হয়, এর বেশী হয় না, হইতে পারে না।

তারপরে সাহিত্য। আমার মনে হয়, সর্বত্র এবং সকল সময়েই ভাষা ও সাহিত্য অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত। যেন পদার্থ ও তাহার ছায়া। অবশ্য প্রমাণ করিতে পারি না যে, পশুদের ভাষা আছে বলিয়া তাহাদের সাহিত্যও আছে। যাঁহারা 'নাই' বলেন, তাঁহাদের অস্বীকার খণ্ডন করিবার যুক্তি আমার নাই, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না যে, ভাষা আছে, কিন্তু সাহিত্য নাই।

ভাষা-বিজ্ঞানবিদেরা বলেন, মানবের কোন্ অবস্থায় তাহার প্রথম সাহিত্য সৃষ্টি তাহা বলিবার যো নাই, খুব সম্ভব, যেদিন হইতে তাহার ভাষা, সেইদিন হইতে তাহার সাহিত্য। যেদিন হইতে সে তাহার হত দলপতির বীরত্বকাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিল, যেদিন হইতে প্রণয়ীর মন পাইবার অভিপ্রায়ে সে নিজের মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছিল, সেইদিন হইতেই তাহার সাহিত্য।

তাই যদি হয়, কে জোর করিয়া বলিতে পারে পশু-পক্ষীর ভাষা আছে, অথচ সাহিত্য নাই? আমি নিজে অনেক রকমের পাখী পুষিয়াছি, অনেকবার দেখিয়াছি, তাহারা প্রয়োজনের বেশী কথা কহে, গান গাহে। সে কথা, সে গান, আর একটা পাখী মন দিয়া শুনে। আমার অনেক সময় মনে হইয়াছে, উভয়েই এমন করিয়া তৃপ্তির আস্বাদ উপভোগ করে, যাহা ক্ষুৎ-পিপাসা নিবৃত্তির অতিরিক্ত আর কিছু। তখন কেমন করিয়া নিঃসংশয়ে বলিতে পারি ইহাদের ভাষা আছে, গান আছে, কিন্তু সাহিত্য নাই? কথাটা হয়ত হাসির উদ্রেক করিতে পারে, পশু-পক্ষীর সাহিত্য! কিন্তু সেদিন পর্যন্ত কে ভাবিতে পারিয়া-

ছিল, গাছ-পালা সুখ-দুঃখ অনুভব করে? শুধু তাই নয়, সেটা প্রকাশও করে। তেমনি হয়ত, আমার কল্পনাটাও একদিন প্রমাণ হইয়া যাইতেও পারে।

যাক্ ও কথা। আমার বলিবার বিষয় শুধু এই যে, ভাষা থাকিলেই সাহিত্য থাকা সম্ভব; তা সে যাহারই হোক্ এবং যেখানেই হোক। অনুভূতির পরিণতি যেমন ভাব ও চিন্তা, ভাষার পরিণতিও তেমনি সাহিত্য। ভাব প্রকাশ করিবার উপায় যেমন ভাষা, চিন্তা প্রকাশ করিবার উপায়ও তেমনি সাহিত্য। জাতির সাহিত্যই শুধু জানাইয়া দিতে সক্ষম সে জাতির চিন্তাধারা কোন্ দিকে কোথায় এবং কত দূরে গিয়া পৌঁছিয়াছে। দর্শন, বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ, এমন কি যুদ্ধবিদ্যার জ্ঞান ও চিন্তাও দেশের সাহিত্যই প্রকাশ করে।

একবার বলিয়াছি, ভাষা ছাড়া চিন্তা করা যায় না। তাই জগতে যাঁহারা চিন্তাশীল বলিয়া খ্যাত, তা সে চিন্তার যে কোন দিকই হৌক, মাতৃভাষায় দেশের সাহিত্যে তাঁহারা ব্যুৎপন্ন একথা বোধ করি অসংশয়ে বলা যায়।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের প্রতি চোখ ফিরাইলে এই সত্য সহজেই সপ্রমাণ হয়। তাঁহারা দর্শন বা বিজ্ঞান লইয়াই থাকেন, লোকে তাঁহাদের চিন্তার ঐ দিকটার পরিচয় পায়। কিন্তু দৈবাৎ কোন কারণ-প্রকাশ পাইলে বৈজ্ঞানিকের অসাধারণ সাহিত্য ব্যুৎপত্তি দেখিয়া লোকে বিস্ময়ে অবাক হইয়া যায়। বিলাতের হাকসলি, টিনডল, লজ, ওয়ালেস, হেল্ম হোজ, হেকেল প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা খুব বড় সাহিত্যিক। আমাদের জগদীশচন্দ্র কোন খ্যাত সাহিত্যিকের অপেক্ষা ছোট নহেন।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় কিছুই থাকে না, যদি এই কথাটা মনে রাখা যায়, সাহিত্যকে বাদ দিয়া যাঁহারা বিজ্ঞান আলোচনা করেন, তাঁহারা বিজ্ঞানবিৎ হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু বাহিরের সংসার তাঁহাদের পরিচয় পায় না। কারণ, ভাষা সাহিত্যকে অবহেলা করার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাধীন চিন্তাশক্তিও অন্তর্ধান করে।

এইবার সাহিত্যের দ্বিতীয় অংশের কথা আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিব। কিন্তু তাহার পূর্বে এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহা কি? তাহা শুধু এই যে, মাতৃভাষা শিক্ষার যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে। পরের ভাষায় সংসারের সাধারণ মামুলি কর্তব্যই করা যায়, কিন্তু বড় কাজ, বড় কর্তব্যের পথ মায়ের উঠানের উপর দিয়াই—তাহার আর কোন পথ নাই। ইতিহাস ও বিজ্ঞান এই সত্যই প্রচার করে।

কিন্তু সাহিত্য বলিতে সাধারণতঃ কাব্য ও উপন্যাসই বুঝায়। সে যে নিছক কাল্পনিক বস্তু! এক শ্রেণীর কাজের লোক আছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস যাহা কল্পনা, তাহাই মিথ্যা এবং মিথ্যা কোনদিন কাজে লাগিতে পারে না। সেটা পড়িয়া নিশ্চয়ই জানিয়া রাখা উচিত, বিলাতের রাজা অষ্ট নম্বরের হেনরীর

কতগুলি ভার্যা ছিল এবং অমুক অমুক সালে তাহাদের অমুক অমুক কারণে, অমুক অমুক দশা ঘটিয়াছিল। কারণ, কথাগুলি সত্য কথা এবং দশাগুলি সত্যই ঘটিয়াছিল। কিন্তু কি হইবে জানিয়া বিষবৃক্ষের নগেন্দ্রনাথের ভার্যা সূর্যমুখীর কি দশা ঘটিয়াছিল এবং কেন ঘটিয়াছিল? তাহা তো সত্যই ঘটে নাই—লেখক বানাইয়া বলিয়াছেন মাত্র। বানানো কথা পড়িয়া বড় জোর সময়টাই কাটিতে পারে। কিন্তু আর কোন কাজ হইবে? তাঁহাদের মতে যাহা ঘটিয়াছে তাহাই সত্য, কিন্তু যাহা হয়ত ঘটিলে ঘটিতে পারিত, কিন্তু ঘটে নাই, তাহা মিথ্যা। কিন্তু বস্তুতঃ তাই কি? এইখানে কবির অমর উক্তি উদ্ধৃত করি—

'ঘটে যা তা সব সত্য নহে, কবি তব মনোভূমি
রামের জনম স্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।'

বস্তুতঃ ইহাই সত্য এবং বড়রকমের সত্য। ইংরাজরা যাহাকে A higher kind of Truth বলেন, ইহা তাহাই। সীতা দেবী যথার্থই শ্রীরামচন্দ্রকে অতখানি ভালবাসিয়া ছিলেন কিনা, ঠিক অমনি পতিগতপ্রাণা ছিলেন কিনা, যথার্থই রাজপ্রাসাদ, রাজভোগ ত্যাগ করিয়া বনে-জঙ্গলে স্বামীকে অনুসরণ করিয়াছিলেন কিনা, কিম্বা ঐতিহাসিক প্রমাণে তাঁহাদের বাস্তব সত্তা কিছু ছিল কি না, ইহাও তত বড় সত্য নয়, যত বড় সত্য কবির মনোভূমিতে জন্মিয়া রামায়ণের শ্লোকের ভিতর দিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

জানকী দেবী হউন, মানবী হউন, সত্য হউন, রূপক হউন; অত গভীর পতিপ্রেম তাঁহাতে সম্ভব অসম্ভব যাহাই হোক, কিছুমাত্র আসে যায় না, যখন ঐ গভীর দাম্পত্য প্রেমের ছবি কবির হৃদয়ে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারিয়াছে এবং যুগ-যুগান্তর নরনারীকে আদর্শ দাম্পত্য প্রেমে দীক্ষা দিয়া আসিয়াছে। ইহাই সত্য। সত্যকার অযোধ্যা, সত্যকার রাম সীতা অপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণে সত্য, কিন্তু কবির কল্পনায় যে রাম-সীতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, হয়ত তাহা আজ পর্যন্ত কোটি কোটি রামসীতাতে সত্য হইয়াছে।

সেদিন স্নেহলতার আত্মবিসর্জন কাহিনী সংবাদপত্রে পড়িয়াই মনে হইয়াছিল ঠিক এমনি করুণ, এমনি স্বার্থত্যাগের চিত্র কিছুদিন পূর্বে গল্প সাহিত্যে পড়িয়াছিলাম। সে মেয়েটিও দরিদ্র পিতাকে দুঃখ কষ্ট হইতে অব্যাহতি দিবার জন্যই আত্মবিসর্জন করিয়াছিল। তাহারও বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইতেছিল এবং পাত্র পাওয়া যাইতেছিল না।

সংবাদপত্রের কাহিনী ঐ একটি স্নেহলতাতেই সত্য কিন্তু কবির কল্পনায় যে মেয়েটি আত্মহত্যা করিয়াছিল, তাহা হয়ত শত সহস্রে সত্য।

স্নেহলতা শিক্ষিতা ছিলেন, কে জানে তিনি কাহিনী পড়িয়াছিলেন কিনা এবং স্বার্থ ত্যাগ মন্ত্র ইহাতেই পাইয়াছিলেন কিনা!

আমার বিশ্বাস কিন্তু এই। আমার নিশ্চয় মনে হয়, তিনি লেখাপড়া না

জানিলে, সাহিত্যচর্চা না করিয়া থাকিলে কিছুতেই এ শক্তি, এ বল নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেন না। কবির কল্পনা এমনি করিয়াই সত্য হয়, কবির কল্পনা এমনি করিয়াই কাজ করে।

দেশের কল্পনা, দেশের সাহিত্য, দেশের ইতিহাস বড় হউক, জীবন্ত হউক, সত্য হউক, সুন্দর হউক, এই প্রার্থনাই আজ আপনাদের কাছে নিবেদন করিতেছি। প্রত্যেক সুসন্তান অকপটে মাতৃভাষায় সেবা করুন, এইটুকু মাত্র ভিক্ষা আপনাদের কাছে সবিনয়ে করিতেছি। কিন্তু কি করিলে সাহিত্য ঠিক অমনটি হইবে, সে পরামর্শ দিবার স্পর্ধা আমার নাই। শুধু এইটুকু মাত্র বলিতে পারি, যাহা সত্য বলিয়া মনে হইবে অন্তরের সহিত যাহাকে সুন্দর বলিয়া বুঝিবেন, নিজের সাধ্যমত সেই পথ ধরিয়াই চলিবেন—তারপরে ফল ভবিষ্যতের হাতে।

যাঁহারা বড় সাহিত্যিক, বড় সমালোচক, তাঁহারা পরামর্শ দিতেছেন, উপদেশ দিতেছেন, ইংরাজি ভাব, ইংরাজি ভঙ্গী ত্যাগ করিয়া খাঁটি স্বদেশী হইতে। আমি নিজেও একজন অতি ক্ষুদ্র নগণ্য সাহিত্য সেবক, কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছি, তাঁহাদের পরামর্শ, তাঁহাদের উপদেশ যে ঠিক কি, তাহা এখন পর্যন্ত বুঝি নাই।

কে কোথায় হ্রস্ব ই-কার স্থানে ঈ দিয়াছেন, কে কোথায় অ-কারের পরিবর্তে ও-কার ব্যবহার করিয়া ভয়ানক অন্যায় করিয়াছেন, কে কোথায় কোন্ বিধবা বঙ্গনারীকে দিয়া এক মুমূর্ষু হতভাগ্য পরপুরুষের মুখে জল দিয়া সাহিত্যে বিষম কুরুচি টানিয়া আনিয়াছেন, এই সব লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে মহা তোলপাড় হইতেছে, কেন হইতেছে যথার্থ কি তাতে দোষ, কি হইলে ঠিকটি হইত, এ সব খুঁটিনাটি আয়ত্ত করিয়া তাহাতে মতামত দিবার ক্ষমতা বা প্রবৃত্তি কিছুই আমার নাই।

কোন সাহিত্য সেবককেই আমি উপদেশ দিতে পারি না, এই কর কিম্বা এই করা উচিত। শুধু এইটুকু বলি: হৃদয়ের মধ্যে এই সত্য জাগাইয়া রাখিয়া সাহিত্য সেবা করুন, যেন আপনার সেবা মাতৃভাষায় দ্বার দিয়া স্বদেশবাসীকে কল্যাণের পথে লইয়া যায়। তখন কি উচিত, কি উচিত নয়, তাহা দেশের হৃদয় ও প্রাণই বলিয়া দিবেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল-মে মাসের কোনো দিনে রেঙ্গুনের বেঙ্গল ক্লাবে প্রদত্ত ভাষণ।

রবীন্দ্রনাথকে দেশবাসীর পক্ষ থেকে যে প্রশস্তিপত্র দেওয়া হয়, তার শরৎচন্দ্ররচিত প্রতিলিপি

কবিগুরু,

তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।

তোমার সপ্ততিতম বর্ষশেষে একান্তমনে প্রার্থনা করি, জীবন-বিধাতা তোমাকে শতায়ুঃ দান করুন; আজিকার এই জয়ন্তী-উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হোক।

বাণীর দেউল আজি গগন স্পর্শ করিয়াছে। বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী, কত না সেবক ইহার নির্মাণকল্পে দ্রব্য-সম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা তোমার মধ্যে আজি সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তোমার পূর্ববর্তী সেই সকল সাহিত্যাচার্যগণকে তোমার অভিনন্দনের মাঝে অভিনন্দিত করি।

আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ ও ঐশ্বর্য তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয় চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃত-কৃতার্থ হইয়াছি।

হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়াছি অনেক, কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক।

হে সার্বভৌম কবি, এই শুভদিনে তোমাকে শান্তমনে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি নতশিরে বারম্বার নমস্কার করি। ইতি

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১১ পৌষ ৩৮

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

# শরৎচন্দ্রের রচনাবলীর প্রথম প্রকাশকাল

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৯১৩ | সেপ্টেম্বর | — | বড়দিদি (উপন্যাস) |
| ১৯১৪ | মে | — | বিরাজ বৌ (উপন্যাস) |
| | জুলাই | — | বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য গল্প (গল্প-সমষ্টি) |
| | অগস্ট | - | পরিণীতা (গল্প) |
| | সেপ্টেম্বর | -- | পণ্ডিতমশাই (উপন্যাস) |
| ১৯১৫ | ডিসেম্বর | — | মেজদিদি (গল্প-সমষ্টি) |
| ১৯১৬ | জানুয়ারি | — | পল্লী-সমাজ (উপন্যাস) |
| | মার্চ | — | চন্দ্রনাথ (উপন্যাস) |
| | অগস্ট | — | বৈকুণ্ঠের উইল (গল্প) |
| | নভেম্বর | -- | অরক্ষণীয়া (গল্প) |
| ১৯১৭ | ফেব্রুয়ারি | — | শ্রীকান্ত ১ম-পর্ব (উপন্যাস) |
| | জুন | -- | দেবদাস (উপন্যাস) |
| | জুলাই | — | নিষ্কৃতি (গল্প) |
| | সেপ্টেম্বর | — | কাশীনাথ (গল্প-সমষ্টি) |
| | নভেম্বর | — | চরিত্রহীন (উপন্যাস) |
| ১৯১৮ | ফেব্রুয়ারি | — | স্বামী (গল্প-সমষ্টি) |
| | সেপ্টেম্বর | — | দত্তা (উপন্যাস) |
| | সেপ্টেম্বর | — | শ্রীকান্ত ২য় পর্ব (উপন্যাস) |
| ১৯২০ | জানুয়ারি | -- | ছবি (গল্প-সমষ্টি) |
| | মার্চ | — | গৃহদাহ (উপন্যাস) |
| | অক্টোবর | — | বামুনের মেয়ে (উপন্যাস) |
| ১৯২৩ | এপ্রিল | - | নারীর মূল্য (সন্দর্ভ) |
| | অগস্ট | — | দেনা-পাওনা (উপন্যাস) |
| ১৯২৪ | অক্টোবর | — | নব-বিধান (উপন্যাস) |
| ১৯২৬ | মার্চ | — | হরিলক্ষ্মী (গল্প-সমষ্টি) |
| | অগস্ট | — | পথের দাবী (উপন্যাস) |
| ১৯২৭ | এপ্রিল | — | শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব (উপন্যাস) |
| | অগস্ট | — | ষোড়শী ('দেনা-পাওনা'র নাট্যরূপ) |
| ১৯২৮ | অগস্ট | — | রমা ('পল্লী-সমাজে'র নাট্যরূপ) |
| ১৯২৯ | এপ্রিল | — | তরুণের বিদ্রোহ (সন্দর্ভ) |
| ১৯৩১ | মে | — | শেষপ্রশ্ন (উপন্যাস) |

| | | |
|---|---|---|
| ১৯৩২ | অগস্ট | স্বদেশ ও সাহিত্য (সন্দর্ভ-সংগ্রহ) |
| ১৯৩৩ | মার্চ | শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব (উপন্যাস) |
| ১৯৩৪ | মার্চ | অনুরাধা, সতী ও পরেশ (গল্প-সমষ্টি) |
| | ডিসেম্বর | বিজয়া ('দত্তা'র নাট্যরূপ) |
| ১৯৩৫ | ফেব্রুয়ারি | বিপ্রদাস (উপন্যাস) |
| | | [মৃত্যুর পরে প্রকাশিত] |
| ১৯৩৮ | মার্চ | শরৎচন্দ্র ও ছাত্রসমাজ [ভাষণ-সমষ্টি ঃ সম্পাদনা—মুরারি দে] |
| | এপ্রিল | ছেলেবেলার গল্প [তরুণপাঠ্য গল্প-সমষ্টি] |
| | জুন | শুভদা (উপন্যাস) |
| ১৯৩৯ | জুন | শেষের পরিচয় (উপন্যাস ঃ শেষাংশ রাধারানী দেবীর লেখা) |
| ১৯৪৮ | ফেব্রুয়ারি | শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী (সম্পাদনা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) |
| ১৯৫১ | জুলাই | শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী (সম্পাদনা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) |
| ১৯৫৪ | নভেম্বর | শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র [সম্পাদনা—গোপালচন্দ্র রায়। পরে এই 'শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র' গ্রন্থের চিঠিগুলির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আরও বহু চিঠি একত্রিত করে 'শরৎচন্দ্র—৩য় খণ্ড' অর্থাৎ পত্রাবলী খণ্ডগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে]। |

# বিন্দুর ছেলে

## অবনীনাথ রায়

শরৎচন্দ্রের গল্প বা উপন্যাস পড়া এক, তাদের সম্বন্ধে লেখা আর। তাঁর লেখা পড়ে চোখ দিয়ে জল বেরিয়েছে, কিন্তু নিজে কেঁদেছি বলে অপরকে কাঁদাতে পারব, এমন কোন যুক্তি নেই। কেননা, একটা নির্ভর করে নিজের উপর, আর একটা নির্ভর করে নিজের শক্তির উপর। শরৎবাবু সত্যিই বলে-ছেন যে, চোখ দুটো থাকলেই পড়া যায়, কিন্তু হাত দুটো থাকলেই তো লেখা যায় না!

'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি' এবং 'পথনির্দেশ'—শরৎচন্দ্রের এই তিনটি গল্পকে ট্রিপলেট বলা যায়। তিনটিই ব্রহ্মদেশে লেখকের প্রবাসকালে লেখা হয়েছিল—প্রথমে 'রামের সুমতি', তারপর 'পথনির্দেশ' আর তারপর 'বিন্দুর ছেলে'। সব গল্পই যমুনায় ছাপা হয়। তখনো 'ভারতবর্ষ' জন্মগ্রহণ করে নি। যখন যমুনায় শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে' বেরুচ্ছিল, তখন 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথের 'রাসমণির ছেলে' বেরুচ্ছিল। দুজন শক্তিশালী লেখকের লেখার মধ্যে এইটুকু সংযোগ বর্তমান আছে।

শরৎবাবুর নিজের মত, ও-তিনটি গল্পের মধ্যে 'পথনির্দেশ' সবচেয়ে ভাল উতরেছে, যদিচ সাধারণের রায় তা নয়। সাধারণে বলে, 'বিন্দুর ছেলে' ও-তিনটি মণির মধ্যে কৌস্তুভ এবং আমার মনে হয় তারা মিথ্যে বলে না। লেখকের কোন একটি আদর্শের উপর পক্ষপাত থাকা অসম্ভব নয়। আর 'পথ-নির্দেশে'র আদর্শের উপর যে শরৎচন্দ্রের পক্ষপাত আছে, সেটা তাঁর অন্য লেখা থেকে ধরা পড়ে।

'বিন্দুর ছেলে' যখন প্রথম বেরুতে শুরু হয় তখন পাঠকমহলে একটি সাড়া পড়ে গিয়েছিল। সকলেই বলেছিলেন, কথাসাহিত্যক্ষেত্রে আবার এক-জন প্রকৃত শক্তিশালী লেখকের আবির্ভাব হয়েছে। শরৎবাবুর পরবর্তী কালের লেখা তাঁর সে গৌরব বাড়িয়েছে বই কমায় নি, এবং তাঁর সে গৌরব আজও তেমনি অম্লান। একথাও বোধ হয় নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, সাহিত্যের দরবারে শরৎচন্দ্রের আসন চিরজয়ী হয়ে গেছে—কেননা শরৎচন্দ্র তাঁর যে অভিজ্ঞতা দিয়ে জীবন-রসের পাত্র পূর্ণ করেছেন তা সত্যিই বিচিত্র ও অভিনব। সেই অভিজ্ঞতা থেকে যে মধু গল্পাকারে নিঃসৃত হয়েছে তার জুড়ি মেলাতে বাংলাদেশকে বহুকাল অপেক্ষা করতে হবে।

পৃথিবীতে একশ্রেণীর লোক দেখতে পাওয়া যায় যারা মনঃপ্রধান—মনের জোরেই তারা নড়ে-চড়ে বেড়ায়—শরীরটা তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ গৌণ। বিন্দু

এই-শ্রেণীভুক্ত। সে বড়লোকের মেয়ে—ছেলেপুলে হয় নি—ফিটের ব্যামো ছিল। কোন কারণে মন খারাপ হলেই তার মূর্ছা হত। তার বড় জা অন্নপূর্ণা এক-দিন এই ফিটের ব্যামোর এক আশ্চর্য ঔষধ আবিষ্কার করলেন। মূর্ছা হবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে নিজের দেড় বছরের ছেলে অমূল্যকে বিন্দুর কোলে বসিয়ে দিলেন—ছেলে কাঁচা ঘুম ভেঙে কেঁদে উঠল—বিন্দু প্রাণপণ বলে ছেলেকে বুকে চেপে ধরলে—সেদিন আর মূর্ছা যাওয়া হল না। এর পর থেকে অন্নপূর্ণা বিন্দুকে একেবারে ছেলে দিয়ে দিলেন।

বাড়িতে আর ছেলেপুলে ছিল না। সুতরাং অমূল্যধন দুই মাকে আশ্রয় করে বড় হতে লাগল। বিন্দু যখন ছেলে নিয়ে পড়ল তখন ঐ তার ধ্যানজ্ঞান হয়ে দাঁড়াল। বড় হয়ে তার ছেলে মানুষের মতো মানুষ হবে, দশজনে প্রশংসা করে বলবে 'ঐ অমূল্যধনের মা' এই ছিল তার আদর্শ। ঐ আদর্শে এতটুকু আঘাত লাগলেই বিন্দু ক্ষেপে উঠত। শেষে হলও তাই। ঐ ছেলের বিষয় নিয়েই তাদের দুই জায়ের মনান্তর হয়ে গেল।

ছেলেকে মানুষ করার সংকল্প মনে থাকলে তার বাপ-মাকে প্রত্যেক খুঁটি-নাটি বিষয়েও সাবধান হতে হয়। নরেন বিন্দুদের বাড়িতে আসা পর্যন্ত বিন্দু অমূল্যকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছিল। নরেন বয়াটে ছেলে—সে যাত্রাদলের গান গায়, অ্যাক্টো করে, আর পড়াশোনার নামে একেবারে মা। নরেন আসার পর থেকে অমূল্যর দশ-আনা ছ-আনা চুল ছাঁটার শখ হল, তার পকেটের মধ্যে থেকে পোড়া সিগারেটের অংশ পাওয়া গেল, অবশেষে সে বিন্দুকে না বলে অন্নপূর্ণার কাছ থেকে টাকা নিয়ে হেডমাণ্টারের জরিমানার টাকা শোধ করলে।

বিন্দু অমূল্যর ধরন দেখে ক্রমশঃই মনে মনে শঙ্কিত হচ্ছিল, শেষের ঘটনায় সে একেবারে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে উঠল। তার যত রাগ গিয়ে পড়ল বেচারা অন্নপূর্ণার উপর। কেননা তিনি টাকা না দিলে তো অমূল্যর এত সাহস হত না। রাগের মাথায় সে বলে ফেললে, 'কার পয়সা খরচ কর সেটা দেখতে পাও না? কার রোজগারে খাচ্চ-পরচ, সেটা জান না?'

অন্নপূর্ণা নিঃস্ব ঘরের মেয়ে ছিলেন—তিনি এই শ্লেষবাক্য সহ্য করতে পারলেন না। বিশেষ করে তিনি অনুমান করে নিলেন যে, এই শ্লেষের মধ্যে ভাসুরের উপার্জনহীনতার প্রতিও ইঙ্গিত আছে। তাঁর স্বামিগর্বে আঘাত লাগল। তিনি তৎক্ষণাৎ দিব্যি করে ফেললেন যে, বিন্দুদের দেওয়া ভাত আর খাবেন না—যদি খান তো যেন ছেলের মাথা খান। এই দিব্যি শুনে কানে আঙুল দিয়ে দীর্ঘ বার বছর পরে বিন্দু ফের মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

বিন্দু অন্নপূর্ণাকে দেবীর মতো ভক্তি করত—অন্নপূর্ণা বিন্দুকে সন্তানের চেয়েও ভালোবাসতেন। বিন্দু বলত যে অন্নপূর্ণাই আদর দিয়ে তার মাথা খেয়েছেন। সময়ে অসময়ে সে গল্প বলার জন্যে দিদির গলা জড়িয়ে [illegible]

করত। বিন্দু যখন এই ঝগড়ার পর নতুন বাড়িতে ছিল তখন তার মা তাকে বাপের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার কথা তুললেন। বিন্দু রাজী হল না; বললে, 'মা, মা, তা হয় না। যতক্ষণ বেঁচে আছে, ততক্ষণ যেখানেই থাক, সে-ই সব।' এখানে অন্নপূর্ণা বিন্দুর কাছে তার মায়ের চেয়েও উঁচুতে স্থান পেয়েছেন।

বিন্দু যে শুধু অন্নপূর্ণার কাছে আদর পেত তা' নয়—ভাসুর যাদবেরও সে অশেষ স্নেহের পাত্রী ছিল। তিনি কোন দিন বিন্দুকে 'বৌমা' বলে ডাকেন নি, 'মা' বলতেন। বিন্দুর কোন কথা তাঁর কাছে কোন দিন উপেক্ষিত হয় নি। তাঁরই কথামত তিনি পাঠশালা উঠিয়ে এনে বাড়িতে বসিয়েছিলেন। যখন দুই জায়ে ঝগড়া হল—পৃথগন্ন হলেন—তখন পর্যন্ত যাদব বিন্দুর এক-রত্তি দোষ দেন নি। বলেছিলেন, 'আগাগোড়াই কাজটা ভাল কর নি, বড়বৌ। আমার মাকে তোমরা কেউ চিনলে না। আমার মায়ের কথা শুধু আমি বুঝি। কিন্তু বড়বৌ, এই যদি না মাপ করতে পারবে তবে বড় হয়েছিলে কেন?' বললেন, 'কত সাধ করে সোনার প্রতিমা ঘরে আনলুম বড়বৌ, জলে ভাসিয়ে দিলে? আমি এখনি যাব।' এর চেয়ে সহজ এবং সরল ভাবে স্নেহের আন্তরিকতা প্রকাশ করার উদাহরণ আমার জানা নেই।

বিন্দুও এই ভাসুরকে দেবতার মতো ভক্তি করত। সে বলেছিল, 'এমন দেবতার মতো ভাসুর পেতে জন্মজন্মান্তরের তপস্যার ফল থাকা চাই।' তাই বাপের বাড়ি গিয়ে যখন সে মরণাপন্ন, তখন বাপমায়ের কথায় ঔষধ-পথ্য খেলে না, স্বামীর কথায় কোন ফল হল না, এমন কি অন্নপূর্ণার কথাও সেদিন কোন কাজে এল না। একমাত্র যাদবের কথাই সেদিন সে রেখেছিল। এই-খানে শরৎচন্দ্রের মৌলিকতা একটি লক্ষ্য করবার বিষয়।

যাদব বললেন, 'বাড়ি চল মা, আমি নিতে এসেছি।' 'আর একদিন যখন এতটুকু ছিলে মা, তখন আমিই এসে আমার সংসারের মা-লক্ষ্মীকে নিয়ে গিয়েছিলাম, আবার আসতে হবে ভাবি নি। তা শোনো, যখন এসেছি তখন হয় সঙ্গে করে নিয়ে যাব, না হয় ও-মুখো আর হব না। জান তো মা, আমি মিথ্যে কথা বলি নে।' সত্যভাষণপুঞ্জিত আত্মবিশ্বাসের এর চেয়ে শক্তিময় প্রকাশ কোন জাতির সাহিত্যে আছে বলে আমার জানা নেই।

বিন্দুর আদর্শবাদের কথা আগেই বলেছি—তার মন ভাঙলে শরীর আর টেকে না। যে অমূল্য তাকে ছেড়ে একটা রাত ঘুমুতে পারত না তাকে যখন সে এক মাসের উপর চোখে দেখতে পেল না, যখন সে বুঝলে দিদি তাকে ত্যাগ করেছেন, বট্‌ঠাকুরকে সে অপমান করেছে, তখন জগতে বেঁচে থাকার সব অবলম্বনই যেন তার হঠাৎ ফুরিয়ে গেল। বাপের বাড়ি এসে তার জ্বর হল—দিনে দুবার তিনবার মূর্ছা হতে লাগল—অবশেষে শেষ মূর্ছা আর ভাঙতে চায় না। যদি বা কোন শক্তিতে ভাঙত, নাড়ী তখন একেবারে বসে গেছে।

তারপর যখন সে ফের অমূল্যকে দেখলে, দিদিকে দেখলে, ভাসুর ঠাকুরের কথা শুনলে, তখন তার মন স্বপ্রতিষ্ঠিত হল—শরীরও সারল। অমূল্য, দিদি, ভাসুরকে নিয়েই তার সংসার—মাধব সেখানে গৌণ—বিন্দু-চরিত্রের এইটুকুই বিশেষত্ব।

মাধব যাদবের বৈমাত্রেয় ভাই কিন্তু দাদার উপর এই ছোট ভাইটির শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। লেখক সেটা অনেক কথার ভিতর দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। মাধব বললেন, 'আর গোলমাল করো না, যাও। বৌঠান যে রকম করে পা ফেলে বেড়াচ্ছেন, দাদা এখনি উঠে পড়বেন।' 'পাগল তুমি! দাদা শুনেচেন, আর গোলমাল করো না।' বিন্দু যখন চুপ করে থাকার জন্য অনুযোগ করেছিল তখন মাধব বললেন, 'ও-বিদ্যে আমার দাদার কাছে শেখা। ঈশ্বর করুন, যেন অমনি চুপ করে থেকেই একদিন যেতে পারি।'

অন্নপূর্ণার সঙ্গে বিন্দুর কলহের কথা মাধব শুনেছিলেন। বিন্দু রাগের মাথায় যা বলেছে সেটা যে তার মনের কথা নয় তা মাধব বিলক্ষণ জানতেন। কিন্তু ভাইয়ের অপমান তাঁর মর্মে গিয়ে বিঁধেছিল। বিন্দু যখন দুঃখে অনুশোচনায় কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছিল তখন তার কষ্ট মাধব বোঝেন নি তা নয়, তবু দাদাকে বিন্দুর হয়ে কিছু বলতে রাজি হলেন না। বললেন, 'হাজার দিব্যি করলেও আমি দাদাকে বলতে পারব না। তিনি নিজে জিজ্ঞাসা না করলে গিয়ে বলব, এত সাহস আমার গলা কেটে ফেললেও হবে না।'

কিন্তু এর চেয়েও মাধবের আরো বড় পরিচয় পরে আছে। বিন্দুকে বলেছিলেন, 'সংসারে যে যার অদৃষ্ট নিয়ে আসে, তেমনি ভোগ করে, তার জীবন্ত সাক্ষী আমি নিজে। কবে বাপ মা মরেচেন জানি নে, বড়-বৌঠানের মুখে শুনি আমরা বড় গরীব কিন্তু কোন দিন দুঃখ কষ্টের বাষ্পও টের পেলাম না। কোথা থেকে চিরকাল পরিষ্কার ধপধপে কাপড় জামা এসেচে তা আজও বলতে পারি নে। তারপর উকীল হয়ে মন্দ টাকা পাইনে। ইতিমধ্যে কোথা থেকে যে কেমন করে তুমি একরাশ টাকা নিয়ে ঘরে এলে, এমন অট্টালিকাও তৈরী হল—অথচ দাদাকে দেখ, চিরটাকাল নিঃশব্দে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেছেন, ছেঁড়া সেলাই করা কাপড় পরেচেন—শীতের দিনেও তাঁর গায়ে কখন জামা দেখিনি—একবেলা একমুঠো খেয়ে কেবল আমাদের জন্য—সব কথা আমার মনেও পড়ে না, দরকারও দেখিনে—শুধু দিন কতক আরাম করছিলেন --তা ভগবান সুদ শুদ্ধ আদায় করে নিচ্ছেন।' এই উক্তির মধ্যে যাদবের যে নিঃশব্দ আত্মদানের কাহিনী নিহিত আছে এবং মাধবের যে ঐকান্তিক ভ্রাতৃভক্তি এবং টেন্ডারনেস প্রকাশ পেয়েছে অন্য দেশের সাহিত্যে তার জুড়ি আছে কিনা আমি জানি না।

আমার মনে হয় মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং সকল সংসারেই হয়, যেমন বিন্দুদের

সংসারে হয়েছিল কিন্তু অমন অন্নপূর্ণা আমাদের সংসারে নেই বলে আর যাদবের মতো আমরা কেউ নই বলে আমাদের মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং-এর গ্রন্থি আর কিছুতেই খোলে না।

বাংলাদেশের পারিবারিক জীবনের রসস্রষ্টা শরৎচন্দ্রের জন্মদিনে আজ তাঁর উদ্দেশ্যে সসম্ভ্রমে নমস্কার করি। তিনি আমাদের পরিশ্রমখিন্ন অভাব-অনটন-পরিম্লান নীরস জীবনের দ্বারে মাধুর্যের যে আস্বাদ বয়ে নিয়ে এসেছেন তার জন্য তাঁকে নমস্কার করি। তিনি আমাদের ভাই-বোনের সম্বন্ধকে মধুর করেছেন, দেবর-বৌদিদির সম্বন্ধকে মহীয়ান করেছেন, বন্ধুর সম্বন্ধকে অকৃত্রিমতার গৌরবে পূত করেছেন। তাঁকে না পেলে আমাদের জীবন-পুস্তকের একটি অধ্যায়ই অনুন্মুক্ত থেকে যেত—জীবনকে গ্রহণ করবার একটি পরিপ্রেক্ষিতই আমাদের চোখে পড়ত না। তাঁকে না পেলে আমরা রমেশকে পেতুম না, উপীনকে পেতুম না, মহিমকে পেতুম না, নারায়ণীকে পেতুম না, সাবিত্রীকে পেতুম না, রমাকে পেতুম না,—

'তোমাকে ঘেরিয়া আজি নাচে মত্ত বিজয়িনী দল,
গ্রহে গ্রহে প্রণব-ওঙ্কার,
হে নারীপ্রাণের মুসা, হে গঙ্গার নব-ভগীরথ,
সেবকের লহ নমস্কার।'

## শরৎচন্দ্রের 'চন্দ্রনাথ'

### কবিশেখর কালিদাস রায়

চন্দ্রনাথ উপন্যাসখানি শরৎচন্দ্রের অল্প বয়সের লেখা। ইহার পাণ্ডুলিপিও তাঁহার কাছে ছিল না। ভাগলপুরে লেখা বইগুলির পাণ্ডুলিপি লইয়া শরৎচন্দ্র উধাও হন নাই। ঐগুলির প্রতি তাঁহার কোন মমতাও ছিল না। এসব পাণ্ডুলিপি তাঁহার মাতুলদের কাছে সযত্নে রক্ষিত ছিল। ব্রহ্মদেশ হইতে তিনি বার বার উপেনবাবুর (গাঙ্গুলী) কাছ হইতে ঐ পাণ্ডুলিপি চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন, নূতন করিয়া উহা লিখিয়া দিবার জন্য। চন্দ্রনাথের আখ্যানভাগের কথা তাঁহার ভালোরূপ মনেও ছিল না, আবছা আবছা যাহা মনে ছিল, তাহাতে পুনর্লিখিত না হইলে উহা ছাপিবার যোগ্য হইবে না বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল। 'যমুনা'র ফণীবাবুকে এই কথা তিনি একাধিক পত্রে জানাইয়াছিলেন। ফণীবাবুকে এক পত্রে শরৎচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—'আমার একেবারে ইচ্ছা নয় আমার পুরানো লেখা যেমন আছে তেমনি প্রকাশ হয়। অনেক ভুলভ্রান্তি আছে। সেগুলি সংশোধন করিতে যদি পাই ছাপা হইতে পারে, অন্যথা নিশ্চয় নয়।'

এদিকে উপেনবাবু সুরেনবাবু ইত্যাদি শরৎচন্দ্রের রচনার ভাণ্ডারীরা পুস্তকখানির পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে মনে করেন নাই। 'যমুনায়' ফণীবাবু শরৎচন্দ্রকে পুনর্লিখনের সুযোগ না দিয়াই 'যমুনা'তে ছাপিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র দূর প্রবাসে থাকিয়া সেই ভয়ে অস্থির হইয়া কেবলই পত্রাদি দিতেছিলেন। চন্দ্রনাথের জন্য তাঁহার উদ্বেগের সীমা ছিল না।

অনেক পীড়াপীড়ির পর শরৎচন্দ্র চন্দ্রনাথের কপি হাতে পাইয়াছিলেন। তারপর তিনি উহার আমূল পরিবর্তন করেন। পরিবর্তন সাধনের পর তিনি ফণীবাবুকে লিখিয়াছিলেন—

'চন্দ্রনাথ গল্প হিসাবে অতি সুস্পষ্ট। কিন্তু তাহা আতিশয্যে পূর্ণ হইয়া আছে। ছেলেবেলা অন্ততঃ প্রথম যৌবনে ঐরূপ লেখাই স্বাভাবিক বলিয়াই সম্ভব ঐরূপ হইয়াছে। যাহা হউক, এখন যখন হাতে পাইয়াছি, তখন এটাকে ভালো উপন্যাসে দাঁড় করানোই উচিত। অন্ততঃ দ্বিগুণ বাড়িয়া যাওয়াই সম্ভব। এই গল্পটির বিশেষত্ব এই যে, কোনরূপ ইম্মারিলিটির সংস্রব নাই।'

শরৎচন্দ্রের কাঁচা বয়সের লেখা চন্দ্রনাথ পুনর্লিখিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে—তাহার আগে ইহা খুব সেন্টিমেন্টাল ছিল, শরৎচন্দ্র এইরূপই বলিতেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন—ভাবাবেগের সংযম না

হইলে উৎকৃষ্ট আর্ট হয় না। পুনর্লিখিত হওয়া সত্ত্বেও ইহাতে ভাবাবেগেরই প্রাধান্য থাকিয়া গিয়াছে।

তাহার ফলে উপন্যাসখানি গীতিকবিতার সুরে মর্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে। এমন অপূর্ব গীতিমাধুর্য শরৎচন্দ্রের অন্য কোন উপন্যাসে আছে বলিয়া মনে পড়ে না। একটি বৃদ্ধ ও একটি শিশুকে অবলম্বন করিয়া শরৎচন্দ্র এই অপূর্ব গীতিমাধুর্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই উপন্যাসের শেষ অংশে শরৎচন্দ্র একজন কথাসাহিত্যিক নহেন, একজন শ্রেষ্ঠ কবি। শরৎচন্দ্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে কেবল সমাজভয়ে পরিত্যক্তা পত্নীর পুনর্গ্রহণের নির্ভীকতার কাহিনীই প্রথম শ্রেণীর একটি রচনার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই উপসংহারে কাব্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাই চন্দ্রনাথে সরযূর কথা ফুরাইয়া গেলেও কৈলাস খুড়োর কথা ফুরায় নাই। তাঁহার কথাতেই গল্পটির উপসংহার হইয়াছে। শেষ পরিচ্ছেদটি নৈবেদ্যের উপর তুলসীপত্রের ন্যায় বিরাজ করিতেছে।

সবচেয়ে উপন্যাসের যে চিত্রটি আমাদের স্মৃতিতে অক্ষয়, প্রীতিতে অন্তরঙ্গ হইয়া চিরদিন বিরাজ করে তাহা কৈলাস খুড়োর চরিত্র। এই চরিত্রটি বঙ্গসাহিত্যের নীলাভে যেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। এই চরিত্র সৃষ্টি করিয়া শরৎচন্দ্রের লেখনী ধন্য হইয়াছে।

মনুষ্যত্বের একটি পরিপূর্ণ আদর্শ, হৃদয়বত্তার একটি সম্পূর্ণাঙ্গ প্রতীক এই কৈলাস খুড়ো। এই চরিত্র সৃষ্টির জন্য শরৎচন্দ্রকে ধনিসংসার, মঠ, আশ্রম, টোল-চতুষ্পাঠী সমাজের উচ্চস্তর ইত্যাদিতে আদর্শ খুঁজিতে হয় নাই। কুড়ি টাকার পেনশনভোগী, দরিদ্র, দাবাখেলায় আসক্ত, একটি অল্পশিক্ষিত কাশীবাসী বৃদ্ধের মধ্যেই পাইয়াছেন। আমাদের চিরপরিচিত অথবা চির-অবজ্ঞাত জনসমাজের মধ্যে অনেক কৈলাস খুড়ো আছেন। আমাদের দৃষ্টি ঊর্ধ্বদিকে, আমরা কেবল শিক্ষাদীক্ষাসভ্যতাসংস্কৃতির মধ্যে আদর্শ মানুষ খুঁজি। সাধারণ লোকের মধ্যে আদর্শ মানুষ প্রত্যাশাও করি না। তাই মুক্ত-কণ্ঠে আমাদের স্বীকার করিতে হইতেছে—কৈলাস খুড়ো শরৎচন্দ্রের একটি অদ্ভুত আবিষ্কার। শরৎচন্দ্র নিশ্চয় ঐরূপ মানুষের সঙ্গে একদিন দাবা খেলিয়াছেন—তাই তাঁহার কাছে কৈলাস বড়ই অন্তরঙ্গ জন। যখন শরৎচন্দ্র কৈলাস খুড়োর সঙ্গে আমাদের পরিচিত করাইলেন তখনই আমার মনে হইল, লোকটা চেনা-চেনা, যেন কোথায় দেখিয়াছি। আমার কল্পনা আমার নিজের গাঁয়ের বাল্যকালের জানা লোকদের মধ্যে তাহার সন্ধান করিতে লাগিল। প্রথম পরিচয় হইতেই সে আমাদের অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে।

তাই তাহার খেলনায় আমরা অশ্রুসম্বরণ করিতে পারি না। এ অশ্রু

কাশীর গঙ্গাজলের চেয়ে পবিত্র। কৈলাসনাথেরই কাশীবাস সার্থক, কারণ কৈলাসনাথের বিশ্ব-ধুতুরার আস্বাদ তিনিই পাইয়াছিলেন।

কাব্যের দিক ছাড়া এই উপন্যাসে আরও একটা দিক আছে। সরযূর প্রতি গভীর দরদের দ্বারা শরৎচন্দ্র সামাজিক অন্ধ সংস্কারের অসারতা এবং তাহার ঊর্ধ্বে পরম সত্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্র সমাজকে গালাগালি করেন নাই, তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযানও চালান নাই, লৌকিক সংস্কারের তীব্র সমালোচনাও করেন নাই, পতিতার কন্যার জন্য কোমর বাঁধিয়া ওকালতিও করেন নাই। তিনি অতি সন্তর্পণে অত্যন্ত অনুদ্ধত ভঙ্গীতে পতিতার কন্যা সরযূকে সরযূতীরে মহাসতীর পদ্মাসনে বসাইয়া দিয়া আপনার প্রাণের সত্যকে রূপদান করিয়াছেন। উদারতার যে অত্যুচ্চস্তরে আরোহণ করিলে সরযূর মতো হতভাগিনীকে প্রসন্নচিত্তে কুললক্ষ্মীদের মণ্ডলীতে স্বীকার করা যায়, যে উদারতা মণিশঙ্কর বা দয়াল ঠাকুরের মধ্যে আসিয়াছে বটে, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে নয়—সে উদারতা চন্দ্রনাথের মধ্যে আসিতে পারে—তাহাও রূপযৌবনের আকর্ষণে ও সন্তানের দৌত্যে ও অনুরোধে। শরৎচন্দ্র নিজে ইহাদের ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই। সত্যোজ্জ্বল সমুদারতার উচ্চস্তরে অবস্থিত শরৎচন্দ্র তাই নিজে এই উপন্যাসে কৈলাসনাথের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৈলাসনাথের ভূমিকার মধ্য দিয়া শরৎচন্দ্র তাঁহার চিরবাঞ্ছিত সত্যকে রূপদান করিয়াছেন। চন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষ মাত্র। সে যে সরযূকে পরিত্যাগ করিয়াছে তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। যে দেশে রামচন্দ্র প্রজারঞ্জনের জন্য সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াও বন্দনীয় হইয়া আছেন, সে দেশের পাঠকের বিচারে চন্দ্রনাথ নিন্দনীয় হইবে কেন? রামচন্দ্র সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন—সীতা তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। সীতা বাল্মীকির তপোবনে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। এ বিষয়েও সাম্য আছে। কৈলাস খুড়ো-ই এই কাব্যের বাল্মীকি। কিন্তু ত্রেতাযুগের কাব্যে অন্নবস্ত্রের চিন্তার কথা বর্জনীয়—বর্তমান যুগের কাব্যে তাহা বাদ দেওয়া যায় না।

চন্দ্রনাথ সরযূকে ত্যাগ করিলেন—কিন্তু তাঁহার যোগক্ষেমের ব্যবস্থা হইল কি না তাহার খোঁজ লন নাই এবং বাল্মীকির আশ্রমে তাঁহার সীতা পেঁৗছিল কিনা তাহারও সংবাদ লন নাই। তবে চন্দ্রনাথের পক্ষে একটা কথা বলার আছে—চন্দ্রনাথ আর সরযূর পরীক্ষার কথা তোলেন নাই। না তুলিবার একটা কারণ এই সরযূ নিজে তো অপরাধিনী নয়, তাহার মা-ই কলঙ্কিনী। তাহা ছাড়া খুড়ো মণিশঙ্কর শেষ কথা বলিয়া দিয়াছিলেন—'যাহার টাকা আছে তাহার জাত মারে কে?' আর যাহাই হউক, চন্দ্রনাথ চরিত্র একেবারে মেরুদণ্ডহীন নয়—তাহার চরিত্রেও কিছু উদারতা ও শক্তি ছিল। চন্দ্রনাথ শকুন্তলা নাটকের দুষ্মন্ত চরিত্রকেও মনে পড়ায়—বিশেষতঃ পুত্র বিশ্বেশ্বরের কাজটা

অনেকটা সর্বদমন ভরতের মতই হইয়াছে। লৌকিক সংস্কারের সহিত সত্য ও প্রেমের দ্বন্দ্ব সাহিত্যের চিরন্তন বিষয়বস্তু। এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্র এই দ্বন্দ্বে প্রেমকেই এবং সত্যকেই বিজয়ী করিয়াছেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে মণিশঙ্করের কথাগুলো শরৎচন্দ্রের নিজেরই কথা—'দোষ লজ্জা প্রতি সংসারেই আছে। মানুষের দীর্ঘজীবনে তাকে অনেক পা চলতে হয়। দীর্ঘ পথটির কোথাও কাদা কোথাও পিছল, কোথাও বা উঁচু-নীচু আছে। তাই বহু লোকের পদস্খলন হয়। তারা কিন্তু সেকথা বলে না, তারা পরের কথাই বলে।

'পরের দোষ পরের লজ্জা চীৎকার করে বলে সে শুধু আপনাদের দোষটুকু গোপনে ঢেকে রেখে ফেলবার জন্য। তারা আশা করে পরের গোলমালে নিজেদের লজ্জাটুকু চাপা পড়ে থাক।'

চন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি প্রশ্নের সদুত্তর উপন্যাসে পাওয়া যায় না। চন্দ্রনাথ শিক্ষিত ভদ্র যুবক—সরযূকে সে খুবই ভালবাসিত—তাহার আর্থিক অবস্থা খুবই স্বচ্ছল। সে নিতান্ত অবিবেচক নয়। সে নিতান্ত সমাজভীরু শ্রেণীর লোকও নয়। একজন অজ্ঞাতকুলশীলা বিধবা পাচিকার কন্যাকে বিবাহ করার সৎসাহস তাহার ছিল। তাহা ছাড়া সে নিঃস্পৃহ উদাসী প্রকৃতির লোক। শ্রীকান্তের চরিত্রের প্রভাব বা পূর্বাভাস শরৎচন্দ্রের একাধিক যুবক চরিত্রে আছে—চন্দ্রনাথেও কিছু আছে। এই চন্দ্রনাথ স্ত্রী যে অন্তঃসত্ত্বা তাহা জানিত না। তাহা না জানা একেবারে অসম্ভব নয়। তবে জানিবারই কথা। সে জানিত না কিন্তু হরিবালা জানিত। হরিবালা তাহা চন্দ্রনাথকে জানাইয়াছিল। চন্দ্রনাথের আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু একথা জানা সত্ত্বেও চন্দ্রনাথ দুই বৎসর ধরিয়া সরযূর কোন খোঁজ লইল না। সে দয়াল ঠাকুর বা তাহার জননীর কাছে আশ্রয় পাইল কিনা সন্ধান লইল না। এতদিন সরযূ কোনও অর্থসাহায্য পায় নাই—সে খেয়ালও তাহার নাই। মুখে সে বলিল পাঁচশত টাকা করিয়া পাঠাইবে কিন্তু তাহার পর দুই বৎসর ধরিয়া সে যে কোন সাহায্যই পাঠাইল না, তাহার কোন সন্ধান সে রাখিল না। কোথায় কাহার নামে সেরেস্তা হইতে টাকা পাঠানো হয়, কে গ্রহণ করে, কোন খোঁজই সে রাখিল না। দয়াল ঠাকুর কি চরিত্রের লোক তাহা তাহার জানিতে বাকী ছিল না। সে আশ্রয় দিল কিনা এবং তাহার কাছে টাকা পাঠাইলে সরযূ পায় কিনা, তাহার খবরও সে লয় নাই। এইরূপ ঔদাসীন্য চন্দ্রনাথ চরিত্রের পক্ষে সমঞ্জস ও স্বাভাবিক কিনা, এ প্রশ্ন আজকালকার পাঠকের মনে জাগে। পাঁচশত টাকা মাসোহারার আদেশ চন্দ্রনাথের মুখেই শোনা যায় কিন্তু পাঁচশত টাকা মাসোহারা দিতে সক্ষম ধনিগৃহের কোন আবেষ্টনী অথবা ধনী সংসারের উপযুক্ত কোন আচরণ উপন্যাসে রূপ লাভ করে নাই। রাখাল ভট্টাচার্যকে জেলে পাঠানোর ব্যাপারটাও

খুব সতর্কতার সহিত রচিত হয় নাই। এই সকল ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের অল্প-বয়সের ছাপ থাকিয়া গিয়াছে। টাকাকড়ির আদানপ্রদান সম্বন্ধে রিয়ালিস্টিক সতর্কতা শরৎচন্দ্রের রচনায় কোন দিনই ছিল না। তবে অন্যান্য দিক হইতে সতর্কতা পরবর্তী রচনাগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দ্রনাথে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের সঙ্গম হইয়াছে। চন্দ্রনাথকে আধা-রোমান্স বলা যাইতে পারে।

# শরৎচন্দ্রের নায়িকা

## সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

রবিঠাকুরের সাধারণ মেয়ে মালতী বলেছিল :

পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প লেখো তুমি শরৎবাবু,
নিতান্ত সাধারণ মেয়ের গল্প,
যে দুর্ভাগিনীকে দূরের থেকে পাল্লা দিতে হয়
অন্তত পাঁচ-সাতজন অসামান্যার সঙ্গে,
অর্থাৎ সপ্তরথিনীর মার।
বুঝে নিয়েছি, আমার কপাল ভেঙেছে
হার হয়েছে আমার।
কিন্তু তুমি যার কথা লিখবে
তাকে জিতিয়ে দিয়ো আমার হয়ে—

হারজিতের মাপকাঠিও তার নিজের। শরৎচন্দ্রের উপর ভরসা ছিল না বলে কি করে জেতাতে হবে তাও বলতে ছাড়ে নি :

উচ্চ তোমার মন, তোমার লেখনী মহীয়সী
তুমি হয়তো তাকে নিয়ে যাবে ত্যাগের পথে
দুঃখের চরমে শকুন্তলার মতো।
দয়া করো আমাকে
নেমে এসো আমার সমতলে।

কবিতাটির রচনাকাল ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ। তার আগেই শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাস প্রকাশিত। বাকি তখনো বোধহয় 'শ্রীকান্তে'র শেষ পর্ব। শুধু শরৎচন্দ্রের নয়, রবীন্দ্রনাথেরও সৃষ্টির অন্তপর্বের সূচনা হয়ে গেছে। কাব্যে 'পুনশ্চ' (কবিতাটি পুনশ্চের অন্তর্ভুক্ত); 'শেষ সপ্তক', 'পত্রপুট' ও 'শ্যামলীর' যুগ। উপন্যাসের শেষ ফসল 'চার অধ্যায়' তখনও অপেক্ষিত। গল্পগুলি ইতিমধ্যেই গুচ্ছবন্ধ। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে : মালতীর সৃষ্টিকর্তা কি সত্যি মনে করতেন তার মালতীকে নিয়ে একটা নিটোল, রসোত্তীর্ণ গল্প লেখা চলে? সাধারণ মেয়ে (মালতী ছাড়াও) কি শরৎসাহিত্যে উপেক্ষিতার দলে?

সাধারণ মেয়ে হয়েও মালতী বঞ্চনার ক্ষোভ মেটাতে শরৎচন্দ্রের হাতে কিন্তু অসামান্যই হতে চেয়েছিল। যদিচ শরৎসাহিত্যের প্রধান লক্ষণ বাহিরের দিক থেকে অভাবনীয়ত্ব যথাসম্ভব পরিহার। কল্পনার রশি তাঁর কম লম্বা ছিল একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। তবে সে কল্পনা বহির্মুখী নয়,

অন্তর্মুখী; বাইরের আকস্মিকতার পেছনে যত না ছুটতো, তার চেয়ে বেশী ডুবে যেত মনের গহীনে। সাধারণ জীবন, বিশেষ করে অল্পখ্যাত ও অবহেলিত জীবনই তাঁকে আকৃষ্ট করেছে বেশী, সাধারণকে অসাধারণ মর্যাদাও তিনি দিয়েছেন, কিন্তু সে মর্যাদার বৈশিষ্ট্য ফুটেছে—মালতীর আকাঙ্ক্ষিত মর্যাদার মত স্থূল নয়। জীবনশিল্পী হিসেবে শরৎচন্দ্রের সেখানেই স্বকীয়তা!

মালতীর মতো ঠিক প্রথম দেখার মোহ নয়, বাল্যের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য, মন দেওয়া-নেওয়ার পর উপেক্ষিতা বা অতৃপ্ত নারী-চরিত্র শরৎ-সাহিত্যে বড় কম নেই, কিন্তু তারা মালতী হতে চায় নি। হয় রমা-রাজলক্ষ্মীর মতো হৃদয়দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, আর না হয় অভয়া-পার্বতী-কমললতার মতো ফুঁসে উঠেছে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠায়। কৃতকার্য হয়েছে কিনা সে কথা আলাদা। ভিন্ন ধরনের চরিত্রও আছে কিন্তু সেখানেও দেখি বিরোধবিদীর্ণ নারীহৃদয়ের সস্নেহ উদ্‌ঘাটন। মানসিক দ্বন্দ্ববিহীন নারীচরিত্র-চিত্রণ দুর্লভ না হলেও শরৎচন্দ্রের স্বভাবজাত নয়। যেখানে আকস্মিকতার জোরে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে যেমন, 'স্বামী'তে সৌদামিনীর ক্ষেত্রে, 'বড়দিদি'-তে মাধবীর ক্ষেত্রে, সেখানে স্বধর্ম বজায় রাখতে পারে নি শরৎচন্দ্রের কল্পনা। সৃষ্টিও তাই সার্থক হতে পারে নি।

শরৎচন্দ্রের বিশিষ্ট নারী-চরিত্রে একদিকে সুতীব্র প্রেমাকাঙ্ক্ষা (মালতীর ক্ষেত্রে ততটা সুতীব্র মনে করা শক্ত), আর একদিকে সংস্কারের পাষাণ-ভার। সে সংস্কার কখনো সামাজিক শাসনপ্রসূত, আবার কখনো মাতৃত্বের বোধলালিত! দুটি প্রতিকূল চিত্তবৃত্তির মন্থনক্লিষ্ট নারীহৃদয়ের পূর্ণরূপ পাঠকচিত্তকে বিহ্বল করে, কাঁদায়, লেখকের কল্পলোক থেকে পাঠকহৃদয়ে ঠাঁই করে নেয়। এর সবচেয়ে বড় কারণ, তারা কেউই মালতী হতে চায় নি, জীবনের ঋণ তারা আকস্মিক কৃতিত্ব অর্জন করে শোধ করতে চায় নি। পরিশোধ করেছে সহনশীলতা দিয়ে। এখানেই শরৎচন্দ্রের জিত অনেক বড় সাহিত্যিকের কাছে।

এই অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি শরৎসাহিত্যের শুধু অন্তঃদেশীয় নয়, আন্তর্দেশিক জনপ্রিয়তার উৎস। তা না হলে 'ভাবালুতার উচ্ছ্বাস' বলে আমাদের নামকরা সমালোচকরা যেসব উপন্যাস দূরে সরিয়ে রাখতে চান—সেইসব কাহিনী কি ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা ছাড়াও একাধিক বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয় নি?

দেশকালের ঘরোয়া সীমালোক ছেড়ে পাত্র-পাত্রী যদি না দেশকালাতীত চিরন্তন মানবমানবীর রূপ পরিগ্রহ করে থাকে, কাহিনীতে যদি মানব-প্রাণের শাশ্বত রূপচ্ছবিই যদি না বিধৃত থাকে তাহলে দেশবিদেশের অতি আধুনিক চিন্তাদর্শপুষ্ট নরনারী কেন এক বিগত যুগের সামাজিক কাহিনী পড়ে চোখে জল ধরে রাখতে পারে না? বাংলাভাষায় অবশ্য এইসব চরিত্র স্ফুটতর হয়েছে শরৎচন্দ্রের ভাষার জাদুতে, বর্ণনাকৌশলে, ভাষান্তরিত হওয়ার সময় সেই জাদু

পুরো মাত্রায় বজায় রাখা সম্ভব হয় না, তবু তো সমাদর কমে নি শরৎ-সাহিত্যের।

সাধারণ মেয়ের প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসা যাক।

রূপমুগ্ধ নরেশ বলেছিল :

'কেউ তার চোখে পড়ে নি আমার মতো।' তারপর বিলেত গিয়ে নিজেকে মনে হয়েছিল অসামান্যা। শরৎ-সাহিত্যে লম্পট আছে, ক্রূর প্রতিহিংসাপরায়ণ দুষ্ক্রিয়াসক্ত পুরুষ আছে; আবার নিতান্ত সহজ, সরল, আবেগপ্রবণ পুরুষও দুর্লভ নয়। কিন্তু নরেশ কোথায়? যে দেবদাস লোকভয়ে পার্বতীকে প্রত্যাখ্যান করেছে, সে অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হয় নি, নিজেকেই নিঃশেষ করেছে। যে সুরেশ অচলাসম্ভোগে জ্ঞানশূন্য, দুর্নিবার, সেই আবার অচলাকে ছেড়েছে অবহেলায়। পরিতৃপ্তিতে নয়--মনের বৈরাগ্যে। যে জীবানন্দ লম্পটশিরোমণি—তারও পরিবর্তন ঘটেছে, কারণ সেই পরিবর্তনের সম্ভাবনা ছিল তার চরিত্রে। আর এই সম্ভাবনার অভাবেই বেণী ঘোষাল, জনার্দন রায়, তারিণী চাটুয্যেদের কোন রূপান্তর নেই। নারীর মতো সহনশীলতাও দেখা গেছে বৃন্দাবন, শ্রীকান্ত, সবিতার স্বামী, গহর প্রভৃতি অনেক চরিত্রে।

শরৎ-সাহিত্যে মালতী-নরেশকে খোঁজার চেষ্টা বৃথা। নরেশের চিত্রকল্প বরং 'শেষের কবিতা'য় মিলতে পারে, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নয়। রবিঠাকুরের 'সাধারণ মেয়ে' শরৎচন্দ্রকে দিয়ে এমন একটি নিতান্ত মামুলী গল্প লিখতে বলেছে যাতে শরৎচন্দ্রের শক্তির অপব্যয় হওয়ারই সম্ভাবনা ছিল বেশী। আমাদের সৌভাগ্য যে, শরৎচন্দ্রের চোখে বাংলাদেশের সাধারণ মেয়েদের মধ্যেও এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছিল—যা তাদের শুধু চিনে নিতে নয়, শ্রদ্ধা ও বিস্ময় আকর্ষণেও সমর্থ।

# সাম্প্রতিক পত্র-পত্রিকায় শরৎ-প্রসঙ্গ

**বৈরাগ্য চক্রবর্তী**

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষে সাম্প্রতিক পত্রপত্রিকায় কথাশিল্পীর সাহিত্য ও ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে আলোচনা আমরা লক্ষ্য করেছি তার একটি অংশ শরৎ-মূল্যায়নে একটি সুস্থ রেওয়াজের পরিচয় দেয় যেমনি, তেমনি অপর একটি অংশ আমাদের আরও স্মরণ করিয়ে দেয় যে বিশেষ বিশেষ সাহিত্যগত সংস্কার ও গোষ্ঠীগত উচ্ছ্বাসের দরুন শরৎচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পরিবর্তে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কখনও কখনও তাঁর সম্মানহানিই ঘটেছে। দু-একটি পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের ব্যক্তি-জীবন সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী মন্তব্যও আমাদের চোখে পড়েছে। আবার অপর কোন পত্রিকায় লেখক শরৎ-অনুশীলনের পরিবর্তে হঠাৎ আত্মপ্রসাদ লাভ করেন এই বিশ্বাসে যে, আজ পর্যন্ত কেউই তাঁর মত পরিশ্রমে শরৎচন্দ্রের খোঁজখবর নেননি। আর এত সযত্ন খোঁজখবরের পরও যা লেখেন, তাতে রয়ে যায় পূর্বসূরীদের প্রতি অশ্রদ্ধা আর ভুল তথ্যের সমাবেশ।

প্রয়াত শরৎচন্দ্রকে অযাচিত প্রশংসাপত্র দেওয়ারও এক ব্যবস্থা চালু হয়েছে কিছু কিছু পত্রপত্রিকায়। এরকম কথাও বলা হয়েছে কোন কোনটিতে যে, শরৎচন্দ্রই শুধু বাংলা কথাসাহিত্যকে লোকায়ত উপকরণ, সাবলীল ভাষা ও অসামান্য মানবিকতা দান করেছেন। বিশ্লেষণহীন আলোচনায় তাঁরা শরৎচন্দ্রের নামের আগে 'তম'-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণগুলি যোগ করেন অনায়াসেই। আবার শরৎচন্দ্রের দীর্ঘ সাহচর্যে এসেছিলেন এমন কিছু সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব শরৎ-কৃতির আলোচনায় কথাশিল্পীর দু-একটি উপন্যাসের কেবল দু-একটি বাক্য বা বাক্যাংশের এমন সমস্ত কষ্টকল্প ব্যাখ্যা দেন, যা সুন্দর সহজ শিল্পকে অযথা বৈদগ্ধ্য-জটিল কোরে পাঠকমনকে ব্যতিব্যস্ত করে।

স্মারকগ্রন্থের স্বল্পপরিসরে এই প্রসঙ্গে আলোচনা দীর্ঘায়িত করার সুযোগ নেই। তবে যে সমস্ত পত্রপত্রিকার ইঙ্গিত উপরের চুম্বক আলোচনায় দেওয়া হয়েছে, সেগুলির কোনটিই যে সঠিক বস্তুবাদী বিশ্লেষণের ধার ধারে না, তা না বললেও চলে। শিল্পীকে 'দেবতা' বানাতেই তাঁরা বিশেষ আগ্রহী। এই ধরনের সমালোচকদের উদ্দেশ্যেই বুঝি বা শরৎচন্দ্র 'সত্য মিথ্যা' প্রবন্ধে বলেছিলেন—"পিতলকে সোনা বলিয়া চালাইলে সোনার গৌরব তো বাড়েই না, পিতলটারও জাত যায়।" শরৎভক্তির আতিশয্যে বা শরৎ-অনুরাগের অযৌক্তিক কণ্ডুয়নে তাঁরা প্রায়শঃই ভুলে যান যে, একজন সার্থক শিল্পীর শিল্পের মূল্যায়নে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত উচ্ছ্বাসের বিশেষ কোন মূল্য থাকে না; মূল্য

থাকে একটি জাতির সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তনের যে বিশেষ সময়ে শিল্পীর আবির্ভাব, সেই সময়কার মুখ্য সংঘাত-দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণী চিত্রণ, সেই সামাজিক দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় শিল্পীর পার্শ্বগ্রহণের ভূমিকা এবং সর্বোপরি শিল্পের মাধ্যমে পাঠকসমাজকে এক মহনীয় মূল্যবোধে উদ্দীপিত করার দক্ষতায়।

প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পশ্চিম বাঙলার এক বিশেষ ভূমিকার কথা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। এইসব আন্দোলনের মুখপত্রগুলিও তাদের সাংস্কৃতিক বিভাগে শরৎ-বিষয়ক আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছেন এবং মুখ্যতঃ মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য ও জীবনাদর্শের প্রাসঙ্গিকতার মূল্যায়নে যথেষ্ট অধ্যবসায়ের পরিচয় দিচ্ছেন। বিজ্ঞানসম্মত বস্তুবাদী এই আলোচনার ধারাও কিন্তু সর্বত্র অজটিল, ধীরগতি বা একমুখী নয়। তাই এর সুফলও পাঠকসমাজের কাছে অননুভব্য নয়। তবে বক্তব্যের উপস্থাপন এবং তথ্যের ব্যাখ্যাগত তারতম্যের দরুন এদের পারস্পরিক ত্রুটি-বিচ্যুতির বিশ্লেষণ সাধারণ পাঠককে শরৎ-অনুশীলনে উৎসাহিত করে সত্যি, কিন্তু আলোচ্য বামপন্থী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত শরৎ-আলোচনার দু-একটি বিষয় সম্পর্কে আমাদের চিন্তাভাবনা যে অস্বস্তিকর অবস্থার মুখোমুখী হয়, সে কথার কিছু অবতারণাও করা প্রয়োজন।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ রবীন্দ্র-গবেষক নেপাল মজুমদার শারদীয় 'নন্দন' (১৩৮২) পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাভাবনার আলোচনায় যে পদ্ধতির (তুলনামূলক ?) আশ্রয় নিয়েছেন তা আমাদের কাছে কাম্য মনে হয়নি। এরকম আলোচনায় রবীন্দ্রনাথকে কষ্টিপাথর ধরে নিয়ে শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তাধারার মূল্যায়নের মাধ্যমে তিনি বস্তুতঃ পাঠকমনে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে এক প্রচ্ছন্ন অশ্রদ্ধার উদ্রেক করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এটা করেছিলেন, শরৎচন্দ্র ওটা করেননি—এ ধরনের সমালোচনাও পেটিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর প্রতিনিধি শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় বিরোধী শক্তির সমাবেশের তাৎক্ষণিক যুক্তি নয়। সামগ্রিকভাবে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের (সর্বহারা বুদ্ধিজীবী বাদে) ধ্যান-ধারণায় যে দোদুল্যমানতা শ্রেণীচরিত্র হিসাবে পরিলক্ষিত হয় তা থেকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কি মুক্ত ছিলেন ?

জনৈক কানাইলাল ঘোষ লিখিত 'শরৎচন্দ্র' নামক বইয়ের উল্লেখ করে নেপালবাবু বলেছেন যে 'পথের দাবী' প্রকাশিত হওয়ার পর শরৎচন্দ্র ব্রিটিশ সরকারের কাছে মুচলেকা দিয়েছিলেন। 'মাসিক বাঙলাদেশ'-এর শরৎ-সংখ্যায় তপোবিজয় ঘোষ এ অভিযোগ খণ্ডন করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, মুচলেকা দিলে শরৎচন্দ্র 'তরুণের বিদ্রোহ' (১৯২১), 'শেষপ্রশ্ন' (১৯৩১), 'বিপ্রদাস' (১৯৩৫) লিখতে পারতেন না বা ১৯২৭ সালে কংগ্রেসের বিরোধিতা করে মুক্ত

বন্দীদের সংবর্ধনা জানাতে পারতেন না। এগুলির প্রতিটিতে ব্রিটিশবিরোধী বক্তব্য বা জাতীয়তাবাদের বীজ ছিল।

কিন্তু তর্কের খাতিরে মুচলেকা দেবার বিষয়টি ধরে নিলেও 'পথের দাবী' প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রকে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের পত্রে ব্রিটিশদের পক্ষে যে প্রশংসা উচ্চারিত হয়েছে তা মেনে নেওয়া যায় কি? শরৎচন্দ্রের মুচলেকা দেবার বিষয়টি তো রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাপত্রের ওজর হতে পারে না। নেপালবাবু কিন্তু তাই বলবার চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গেই বলি, শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক সততার প্রতি কটাক্ষপাত এখনও শেষ হয়নি। বাঙালীত্ববোধের প্রচারক জনৈক সাহিত্যিক এ বৎসর পশ্চিমবাঙলার একটি বিশিষ্ট শরৎ-মেলায় প্রদত্ত তাঁর ভাষণে এমন মন্তব্যও করেছেন যে, শরৎচন্দ্র তাঁর অতিপরিচিত বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর অবস্থান ও গতিবিধি সম্পর্কে পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবকে গোপনে অবহিত করেছিলেন। বিষয়টি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা কী ভাবেন, তা আমাদের এখনই জানা দরকার।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তার নিরিখে শরৎ-মূল্যায়নের অপর একটি ত্রুটি হল, রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার নিজস্ব দোদুল্যমানতা সম্পর্কে লেখকের অমনোযোগ। এ যুগের 'তীর্থক্ষেত্র' রাশিয়া দেখার পরও কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সামাজিক চিন্তা বেদ, উপনিষদ ও তপোবনের প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার রসে জারিত ছিল। আর সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের জোয়ারের যুগেও এন্ডারসনের শান্তিনিকেতন গমন, 'চার অধ্যায়' উপন্যাস রচনা প্রভৃতি ঘটনাগুলিও সাধারণের চোখ এড়িয়ে যাওয়া শক্ত।

তাই বলা যায়, শরৎচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ, উভয়ের মধ্যেই এই চিন্তার দোদুল্যমানতা বা বিরোধী শক্তির সমাবেশ ছিল। তবে কারুর ক্ষেত্রে সেটি অধিকমাত্রায় রাজনৈতিক এবং কারুর ক্ষেত্রে সেটি অধিকমাত্রায় আধ্যাত্মিক চরিত্রে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ফ্যাসি-বিরোধী আন্তর্জাতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ যেমন উজ্জ্বল, তেমনি স্বদেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকায় শরৎচন্দ্রের সাহিত্য ও রাজনৈতিক জীবনের ইতিবাচক কার্যকারিতাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

নেপালবাবু উত্থাপিত আর-একটি প্রসঙ্গ—রায়তীস্বার্থ-বিরোধী বিল সম্পর্কে শরৎচন্দ্র উদাসীন থাকার ফলে 'মারাত্মক' কৃষকবিরোধী বিল পাস হয়ে যায়। কিন্তু কৃষক-স্বার্থবিরোধী আরও সোচ্চার ঘোষণা কি আমরা রবীন্দ্রনাথের 'রায়তের কথা' প্রবন্ধে পাই না? সেখানে চাষীকে জমি ছেড়ে দেবার বিরুদ্ধে জমিদারদের স্বপক্ষে তিনি যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গল্পে অছিমুদ্দী কাটারী হাতে জমিদার বিপিনকে আক্রমণ করে ঠিকই কিন্তু সামাজিক রবীন্দ্রনাথের সোচ্চার চিন্তার জমিদাররা মেজাজে গোঁফ মোচড়ায়। সমস্যার

কোন হেরফের হয় কি তাতে? তাই এ সমস্ত ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে মাপকাঠি ধরে শরৎচন্দ্রের প্রতিক্রিয়াশীলতা নিরূপণে আমরা উৎসাহ পাই না।

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে যে অভিযোগটি নেপালবাবু মারাত্মকভাবে উপস্থিত করেছেন তাঁর প্রবন্ধের কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে—সেটা হ'ল ১৯১৬-১৭'-র বৎসরগুলোয় শরৎচন্দ্রের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের গতিপ্রকৃতি। বহু শরৎ-অনুরাগী এক্ষেত্রে স্পর্শকাতর হয়ে পড়বেন ঠিকই, কিন্তু বিষয়টির প্রতি উদাসীন থাকতে পারা যায় না। আমাদের বক্তব্য, নেপালবাবু বিষয়টির আলোচনায় আরও সতর্ক হতে পারতেন। সাময়িকভাবে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের শিকার হয়ে পড়াটাও যে তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের স্তব্ধগতি ও নৈরাশ্যের ফলশ্রুতি—এটা অনেক রাজনৈতিক কর্মীর জীবনে আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এলবার্ট হলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বিরোধী জনসভায় শরৎচন্দ্রের ভূমিকা ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থে এবং বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক উপাদানের অনুপ্রবেশজনিত দুরবস্থার প্রতিকারের পক্ষে। যেহেতু বাঙলাদেশে শতকরা পঞ্চান্ন জন মুসলমান, অতএব বাঙলা সাহিত্যেও শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ আরবী-ফারসী শব্দের প্রচলনের এক হাস্যকর যুক্তিও অনেকে তখন তুলেছিলেন এবং সাহিত্যে চালুও করছিলেন (দ্রষ্টব্য : শরৎচন্দ্র/ গোপালচন্দ্র রায়)। আর, এই বাঁটোয়ারা প্রসঙ্গে বিলেতে স্মারকলিপি প্রেরণের ব্যাপারে টাউনহলের সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য রবীন্দ্রনাথের নিকট থেকে সম্মতি 'আদায়' করেছিলেন শরৎচন্দ্র,—নেপালবাবুর এ ধরনের মন্তব্য শুধু শরৎচন্দ্র নয়, রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও সম্মানজনক নয় বলে আমাদের ধারণা। 'আদায় কথাটি দুর্বল-ব্যক্তিত্ব' আত্মভোলা, পরনির্ভরশীল ব্যক্তির ক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত হয়।

আমরা যে কোন ব্যক্তিত্বের আলোচনায় সর্বশেষ পরিণতি বা উত্তরণের ক্ষেত্রটিতে বেশী জোর দিতে চাই। নানান অভিজ্ঞতার ভিয়েনে একটি প্রখর ব্যক্তিত্ব মালিন্যমুক্ত হয়ে সর্বজনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিমানসে সাম্প্রদায়িকতার যে বীজ কিছুকালের জন্য বর্তমান ছিল, যদি তার উগ্রতা হ্রাস বা বিলোপ ঘটে থাকে (মুসলিম সমাজ সম্পর্কে তাঁর সাহিত্যিক-আগ্রহ লক্ষণীয়) এবং পরবর্তীকালে যদি তিনি আরও মহনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে থাকেন, তবে গণতান্ত্রিক-চেতনাসম্পন্ন সমালোচক জোর দেবেন সেই উত্তরণের ধারার উপর, তাঁর পশ্চাদমুখী চেতনার উপর কখনই নয়। যে কোন ধরনের সংস্কার, তা সে রবীন্দ্র-সংস্কারই বা হোক না কেন, একটি শিল্প বা একজন শিল্পীর আকাঙ্ক্ষিত বস্তুবাদী বিশ্লেষণেও বিভ্রম ঘটায়।

বামপন্থী পত্রপত্রিকার শরৎ-মূল্যায়নের অপর একটি লক্ষণীয় প্রবণতার প্রতি এবার দৃষ্টি ফেরানো যেতে পারে। মিহির আচার্য 'চতুষ্কোণ' পত্রিকার

বৈশাখ (১৩৮২) ও শরৎ-সংখ্যায় শরৎচন্দ্র সম্পর্কে যে 'ভিন্নমত' পোষণ করতে চেয়েছেন তার সমস্ত অংশ জুড়েই ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হয়েছে সমালোচকের শরৎ-সংস্কার। তাই, মহান রুশ সাহিত্যিক গর্কির সামগ্রিক সাহিত্য-চিন্তায় নীচুতলার মানুষ যে মর্যাদা পেয়েছে, যে ভাস্বর মহনীয়তায় বিশ্ব-বিপ্লবের সম্মুখ সারির সৈন্যের সম্মান অর্জন করেছে তারা—সে বিষয়ের প্রতি উদাসীন থেকে মিহিরবাবু গর্কির ছোটগল্পের মধ্যেই নিজের সন্ধান-লিপ্সা সীমিত রেখেছেন; আর তাই, শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের ইতিহাস-চিহ্ন গর্কির গল্পে খুঁজে পাননি। গর্কির ছোটগল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যেত সেগুলির মধ্যে শিল্পীর 'সজ্ঞান' ইতিহাস-চেতনার স্বাক্ষর কতখানি বিদ্যমান। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে লেখা গল্পগুলির মাত্র তিনটির উল্লেখ এখানে করা চলে। সেগুলি হ'ল—'সং অব দি ফ্যালকন', 'দি হার্ট অব ডাংকো', এবং 'এ মাইট অব এ গার্ল'। এ তিনটি গল্পে যথাক্রমে বিপ্লবী-চেতনার স্তর, শ্রমিক-চেতনার স্তর ও বুদ্ধিজীবীর বিপ্লবীচেতনায় সজ্ঞান উত্তরণের যে চিত্র পাওয়া যায়, সে রকম কোন দৃষ্টান্ত শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পে আমরা পাই কি? আমরা জানি, শরৎচন্দ্রের কাছে এতখানি আমরা আশা করতে পারি না। অথচ মিহিরবাবু গর্কির একটিও ছোটগল্পের উল্লেখ বা বিশ্লেষণ না করে এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আর নিজের বিশেষ প্রয়োজনেই সমগ্র গর্কি-সাহিত্য থেকে মুখ ফিরিয়েছেন তিনি। 'ইতিহাস-চিহ্নিত' শব্দটি যদি তিনি 'ইতিহাস-চেতনার স্বাক্ষরযুক্ত' অর্থে ব্যবহার কোরে থাকেন তবে বলতেই হবে, শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পে প্রতিফলিত ইতিহাস-চেতনা সজ্ঞান নয়। মহেশের সর্বহারা শ্রেণীতে রূপান্তরের মধ্যে শিল্পচেতনার যে দিক পরিস্ফুট হয়েছে, তার ব্যাখ্যা এঙ্গেলস-বর্ণিত সেই শিল্পীর সংবেদনের মধ্যে আমরা পাই, যিনি বিপ্লবী না হয়েও সৎ ও বিবেকসম্মতভাবে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্কগুলির চিত্র তুলে ধরেন—কনসেনশ্যাসলি ডেসক্রাইবিং দি রিয়্যল মিউচুয়াল রিলেশনস। তাই 'মহেশ' গল্পকে 'মার্কসবাদী চেতনার উন্মেষ' বলা যায় না; এইজন্য যে. গফুর এক শ্রেণী-সংযোজন ছেড়ে আর আর এক শ্রেণী-সংযোজন মেনে নিয়েছে অসহায়ভাবে। 'সাহিত্যে সমাজবাস্তববাদ' গ্রন্থের এক জায়গায় নগেন দত্ত বলেছেন যে, 'মার্কসবাদী নৈতিকতায় দায়িত্ববান শিল্পী এমন একটি চেতনশীল মনকে গড়ে দেন যাতে গফুররা ভাবতে পারে তারা সমাজের একটি সজ্ঞান অংশ এবং সমাজ-পরিবর্তন তাদের সচেতন প্রতিবাদের সঙ্গে জড়িত।'

গর্কি ও শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবনের ভবঘুরে বৃত্তির মধ্যেও একটা গুণগত পার্থক্য ছিল। উভয় শিল্পীই মানবজীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সম্পন্ন

নিজেদের সাহিত্য-সংবেদনকে সমৃদ্ধ করেছেন ঠিকই কিন্তু সমাজের কষ্টকর উৎপাদনকর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জীবনের প্রতিটি পর্বে জড়িয়ে থেকে গর্কি যে বিজ্ঞানসম্মত মননশীলতার অধিকারী হ'তে পেরেছিলেন, সন্ন্যাসী-বেশে ভ্রমণরত নিস্পৃহ ও উদাসীন শরৎচন্দ্রের পক্ষে সমাজপরিবর্তনের সেই মৌল দূরদৃষ্টি লাভ করাও কষ্টকর ছিল। যদিও সমসাময়িক সামাজিক শ্রেণীদ্বন্দ্বের তীব্রতার তারতম্যও এর জন্য অনেক দায়ী, কিন্তু এটাও ভুলে যাওয়া ঠিক নয় যে, ব্যক্তিগত জীবনচর্যা ও শ্রেণী-অবস্থানও ডি-ক্লাসড হওয়ার একটি নির্ধারক উপাদান।

মিহির আচার্য তাঁর প্রবন্ধের অপর এক অংশে উল্লেখ করেছেন যে—'উচ্চবর্ণ সমাজ-শিরোমণি সামন্তপ্রভুর জাঁতাকলে পিষ্ট অসহায় নরনারীর চিত্র সাহিত্যে শরৎচন্দ্রই যথার্থ বস্তুবাদী দৃষ্টিতে প্রথম উপস্থিত করলেন।' এই মন্তব্যটির মধ্যে ভাবালুতা প্রশ্রয় পেয়েছে বলেই আমরা মনে করি। 'যথার্থ বস্তুবাদী' হওয়া মানেই মার্কসবাদী হওয়া। আর শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীকে 'মার্কসবাদী' বলাতে আমাদের অস্বস্তি আরও বেড়েছে। আমরা জানি, শরৎচন্দ্রকে 'সর্বহারা মানবতাবাদের প্রতিভূ' বলেও একশ্রেণীর প্রবন্ধকার প্রশংসাপত্র দিচ্ছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের কোন সাহিত্যকর্মের মধ্যে মার্কসবাদী শিল্পীর প্রয়োজনীয় বিপ্লবী সচেতনতা ছিল কি? তাঁর সর্বাধিক আলোচিত রাজনৈতিক উপন্যাস 'পথের দাবী' নিয়ে অন্যত্র বহু আলোচনা বিশিষ্ট সমালোচকরা করেছেন। কিন্তু তাঁরাও নির্দ্বিধায় এতবড় প্রশংসাপত্র শরৎচন্দ্রকে দিতে পারেন নি। বর্তমান প্রবন্ধে সে বিষয়ে আলোচনার সুযোগ নেই। তবে সামন্তশ্রেণীর যাঁতাকলে পিষ্ট অসহায় নরনারীর কথা পুরোপুরি মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে না হলেও বিবেকবান সৎ শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গীতে কতখানি 'শ্রেণীচেতনায় সুপ্রবুদ্ধ' হতে পারে তার প্রমাণ আমরা পাই ১৮৭২ সালে লিখিত লালবিহারী দে'র 'গোবিন্দ সামন্ত' নামক উপন্যাসে। চাষীর অধিকারের স্বপক্ষে এবং জমিদারী উৎপীড়নের বিরুদ্ধে লেখা এই কাহিনীতে উৎপীড়িত মানুষের লাঞ্ছনার জন্য হা-হুতাশের চিত্র নেই, আছে তার বিক্ষোভের চিত্রায়ন। বাঙালী কৃষক-জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন আমরা সর্বপ্রথম এতে লক্ষ্য করি। বইটি ডারউইন ও টেনিসনেরও প্রশংসা পেয়েছিল (দ্রষ্টব্য : মাসিক বাঙলাদেশ, ৩য় বর্ষ দীপাবলী সংখ্যা)।

তাই জীবন্ত মানবিক ডকুমেন্ট হলেই মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সাহিত্য হয় না, হয় বস্তুবাদী। আর যথার্থ বস্তুবাদী বা মার্কসবাদী হতে হলে সেই ডকুমেন্টের উপর ঐতিহাসিক বা সামাজিক বিকাশ প্রক্রিয়ার প্রতিফলন ঘটাতে হয় (ভলাদিমির শ্চেরবিনা : লেনিন এবং সাহিত্যের সমস্যা)।

যে শরৎ-সংস্কার নিয়ে মিহিরবাবু শরৎ-আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছেন

সেই সংস্কার ক্ষেত্রবিশেষে রাজনৈতিক নেতা শিবদাস ঘোষকে কতখানি অসহিষ্ণু করে তোলে তার পরিচয় পাওয়া যায় 'যুব সংস্কৃতি' পত্রিকার শরৎ-সংখ্যায় (পৃষ্ঠা ১৫)। 'বৈকুণ্ঠের উইল' উপন্যাসের গোকুল চরিত্রের ভ্রাতৃত্ববোধের পরিচয় প্রসঙ্গে, স্ত্রীর আবদারেও গোকুল কতখানি অনমনীয় ছিল, সে কথা তিনি বলছিলেন। তারপর হঠাৎ তিনি 'শিক্ষিত রুচিবান, রবীন্দ্র-সংস্কৃতির উদ্‌গাতারা' স্ত্রীর অন্যায় আবদারে কত কান্ড করে সে কথা পাড়লেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের আলোচনায় কেবল রবীন্দ্রনাথের নাম জড়িয়ে অদৃশ্য ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে এই অশোভন কটাক্ষপাত আমাদের অনুভূতিকে আহত করে যেমনি, তেমনি এই স্থলে প্রবন্ধের রুচি সম্পর্কেও আমাদের সন্দেহ উদ্রেক করে।

প্রবন্ধের অন্যত্র গর্কি-সাহিত্য ও শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি শরৎচন্দ্রের শিল্পশৈলীকে গর্কির শিল্পশৈলী থেকে নিঃসন্দেহে উন্নত ধরনের বলে দাবি করেছেন। কিন্তু তিনি গর্কি বা শরৎচন্দ্রের শিল্পশৈলীর তুলনা-মূলক বিশ্লেষণাত্মক একটি আঁচড়ও কাটেননি। খুব সংক্ষেপে বলা যায়, গর্কির শিল্পশৈলী যাকে রেভলিউশনারি রোমান্টিক স্টাইল বলা হয়, তা বিশ্ববিপ্লবের চালিকাশক্তি হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর মহত্ত্ব সর্বাধিক উজ্জ্বলতায় ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে। যাইহোক, দেশে সঠিক মার্কসবাদী নেতৃত্বের অভাবের দরুনই শরৎচন্দ্র গর্কির চেয়ে বেশী সম্ভাবনা নিয়েও শরৎচন্দ্রই রয়ে গেলেন, গর্কি হ'তে পারলেন না—এরকম আফশোষের কথা একাধিকবার শুনলাম আমরা তাঁর কাছে।

শিবদাসবাবু তাঁর মূল্যায়নের স্থানে স্থানে সাহিত্যিকদের 'বড় বড় কথা বলা' বা তত্ত্বগম্ভীর জটিলতার অবতারণার বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করেছেন। আর সাহিত্যশৈলী, সাহিত্য-চিন্তা ও রসসৃষ্টির পারস্পরিক সম্পর্ক উন্মোচনে অযথা অস্পষ্টতার সৃষ্টি করে শরৎচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ রসসৃষ্টিকারী শিল্পীর শিরোপা দিয়েছেন। কিন্তু উপন্যাসে এথিকাল মাদারহুড, ইমপার্সনাল মাদারহুড, (শব্দগুলি শিবদাসবাবুর উদ্ভাবন, যৌথ পরিবারের ভ্রাতৃত্ববোধ প্রভৃতি ধারণাগুলোকে চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা ছাড়াও 'শেষপ্রশ্ন'-এর মত উপন্যাসে বার্নাড শ'র ডিবেট ড্রামাটাইজড নাট্যরীতি সদৃশ যে তত্ত্ব-বিতর্কের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন শরৎচন্দ্র, তার শৈল্পিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে নীরব থেকেছেন। এটিও তাঁর শরৎ-সংস্কারের রকমফের মাত্র। তবে তাঁর মূল বক্তব্য হল—শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী মূলতঃ বস্তুতান্ত্রিক। এ ব্যাপারে দ্বিমত না থাকারই কথা। সে অর্থে আমাদের দৃষ্টিতে অনেকে বস্তু-তান্ত্রিক। কেননা, ক্রিটিকাল রিয়লিজম আর সোস্যালিস্ট রিয়লিজম দুটি আলাদা ধারণা।

জন্মশতবর্ষের প্রেক্ষাপটে শরৎ-মূল্যায়নের যে সুযোগ আমাদের সামনে

উপস্থিত করেছে তার ব্যবহার যথাযথ হচ্ছে কি না, সে বিচার আমরা করতে বসিনি। কিন্তু 'শরৎ-সাহিত্যে নারীর স্থান' নামক অতি একান্ত আলোচনা থেকে শুরু কোরে 'শরৎচন্দ্র ও বিচ্ছিন্নতাবোধ' নামীয় অতি আধুনিক ধাঁচের যে সব আলোচনা আমাদের চোখে পড়েছে, সেগুলির সর্বত্র যে সমালোচনার সুস্থভঙ্গী বজায় রয়েছে, তা আমাদের মনে হয়নি। 'চতুষ্কোণ' শরৎ-সংখ্যায় নন্দগোপাল সেনগুপ্ত একটি মূল্যায়নে বলেন যে, তিনি (শরৎচন্দ্র) 'কোন সার্বভৌম বা বিশ্বজনীন সমস্যার সম্মুখীন হ'ন নি, কোন বৃহৎ জিজ্ঞাসা বা জীবনদর্শনের আলোও প্রক্ষেপ করেন নি, তাই তাঁর রচনা আবেগ ও অনুভূতির রাজ্যকে আলোড়িত করে বটে, কিন্তু বুদ্ধিকে কোন তত্ত্বজ্ঞানের আলোয় উজ্জীবিত করে না।' প্রথিতযশা জনৈকা মহিলা সাহিত্যিক এই মন্তব্যে স্পর্শকাতরতা প্রকাশ করেছেন একটি পরিচিত পত্রিকায়। আবার সার্বভৌম জীবনজিজ্ঞাসার ধারণায় রবীন্দ্রনাথের নাম স্মরণ করে কেউ কেউ প্ররোচিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বজিজ্ঞাসাকে প্রকারান্তরে কটাক্ষ করতে। আমাদের বক্তব্য, ব্যক্তিগত ভক্তি বা শ্রদ্ধা যেন একজন শিল্পীর সঠিক মূল্যায়নের ধারাটি পাঠকসমাজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে না রাখে। আর এ প্রসঙ্গে আমরা মনে করি ঐতিহাসিক বস্তুবাদী চেতনায় অভিষিক্ত হয়েও সার্বভৌম জীবন-জিজ্ঞাসা যে কটি কথাশিল্পে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে তার সংখ্যা সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যে খুবই কম। কিংবা সার্বভৌম বা শাশ্বত কোন জীবনদর্শনের ধারণাতেও বিতর্ক উঠতে পারে। কিন্তু, তাই বলে এসটাবলিশমেন্ট-এর বিরুদ্ধে যে সাহিত্য তীক্ষ্ন প্রতিবাদস্পৃহা গড়ে তোলে তার মূল্যকে কি আমরা খাটো কোরে দেখতে পারি? মনুষ্যত্বের সুস্থ বিকাশের পথে যে অন্তরায়গুলি বর্তমান সেগুলির বিরুদ্ধে যে সাহিত্য পাঠকমনে এক নিষ্করুণ কাঠিন্য ও আপোসহীন মনোভাব গড়ে তোলে, সে সাহিত্যকে কি আমরা মহনীয় মূল্যবোধ সঞ্চারী বলতে পারি না?

শরৎ-সাহিত্যের সদর্থক দিকগুলির পর্যালোচনা তৎকালীন আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই করতে হবে আর তাঁর সাহিত্যের ত্রুটি-বিচ্যুতির আলোচনাতেও একই প্রেক্ষাপট ব্যবহৃত হওয়া উচিত। অবশ্য সে চেষ্টা অনেকেই করেছেন। তাই সে ব্যাপারের পুনরুক্তি থেকে বিরত থাকাই ভাল। খুবই মোটা দাগে শরৎ-সাহিত্যের ইতিবাচক দিকগুলি সম্বন্ধে এককথায় বলা যায় যে, সে সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের কথা, যেটি তৎকালীন সমাজের মধ্যে সংঘাত, সামন্ততন্ত্রী স্বৈরাচারে নিগৃহীত গ্রাম-বাঙলা এবং ঐ নিগ্রহের বিরুদ্ধে পাঠকমনে এক সেন্টিমেন্ট গড়ে তোলার কথা এবং তাঁর সমাজসংস্কারক চেতনায় বিধৃত নারীপ্রগতি ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার কথা।

পরিশেষে, তাঁর সাহিত্যের ভাষা ও শৈলীর অনায়াস-স্বচ্ছন্দ প্রকৃতি সম্বন্ধে বর্তমান নিবন্ধকারের যা মনে হয়েছে তা হল—তাঁর ভাষার অন্তস্তলে ফল্গুধারার মত প্রবাহিত সংগীতময়তাই (মিউজিক্যালিটি) এর একটি প্রধান কারণ। শরৎচন্দ্র সঙ্গীতে খুবই আগ্রহী ও পারদর্শী ছিলেন। তাই তাঁর শব্দ-চয়ন ও প্রয়োগ-রীতির মধ্যে এই সাঙ্গীতিক গুণের অনুপ্রবেশ ঘটেছে স্বাভা-বিকভাবে। তাঁর সাহিত্যের যে সব স্থানে পাত্রপাত্রীর মুখে তত্ত্বের কচ্‌কচানি শোনা যায়, সেখানেও তা ক্লান্তিকর মনে হয়নি, এই গুণের অস্তিত্বের জন্য। তাঁর লেখনীর এই গুণটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় বার্নাড শ'র শব্দচয়নের কথা। যাইহোক, বিষয়টি নিয়ে অনেক চিন্তার অবকাশ আছে ; বিশেষজ্ঞ কেউ এ ব্যাপারে হয়ত চিন্তা করবেন।

# বাংলার নারীমুক্তি-আন্দোলনের ঐতিহ্য এবং শরৎচন্দ্রের ভূমিকা

অনীতা গুপ্ত

বাংলার নারীমুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাস সুদীর্ঘকালের। ১৮২৯-এ সতীদাহ-নিবারণ আইনের প্রবর্তন থেকে শুরু করে স্বাধীন ভারতে মেয়েদের ভোটাধিকার-লাভ পর্যন্ত এই আন্দোলনের ধারা বিস্তৃত। বাংলা সাহিত্যেও নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-জাগরণের বিভিন্ন স্তর লক্ষ্য করা যায়। মাইকেল মধুসূদন থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র পর্যন্ত নারীর বন্ধনমুক্তি সম্পর্কে চিন্তা চলেছে। সেই চিন্তায় কে কতখানি অগ্রসর হতে পেরেছেন, আজকের পাঠকের কাছে তাই নিরীক্ষার বিষয়। নারীমুক্তির ভাবনায় শরৎচন্দ্রের ঐতিহাসিক সাফল্য বিচারের প্রয়োজনে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর নারীমুক্তি-আন্দোলনের সামাজিক ইতিহাস অবশ্যই বিচার্য। সমাজের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত ব্যতীত শরৎচন্দ্রের সার্থকতা-বিচার সম্ভবপর নয়।

বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর নারীমুক্তি-আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজের আরোপিত সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে নারীকে মুক্ত করার প্রয়াস। আদিম সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। সন্তানধারণ ও সন্তানপালনের ভূমিকার গুরুত্ব অনুসারে মানবগোষ্ঠীগুলিতে মেয়েদের স্থান ছিল পুরুষের উপরে। মায়ের নামে সন্তানের পরিচয় হত।

গোষ্ঠীর কর্ত্রীত্ব থেকে পরিবার তথা পুরুষের সম্পত্তিরূপে নারীর সামাজিক মূল্যের এই পবিবর্তনের পিছনে রয়েছে সমাজপরিবর্তনের ইতিহাস। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রধান পৃষ্ঠপোষক চার্চ, পুরোহিত আর শাস্ত্রকাররা সামন্তপ্রভুদের সুবিধার্থে নারীর উপর সর্বপ্রকার ধর্মীয় অনুশাসন আরোপ করেছিলেন। যে কোন ধর্মে নারীকে ধর্মীয় আচরণে স্থান দেওয়া হয়নি। শিক্ষার জগৎ তার কাছে রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। নারীকে সমাজের কাছে হেয় এবং হীন প্রতিপন্ন করেছিলেন ধর্মীয় প্রভুরা। ভারতবর্ষে যেমন মনুসংহিতা, ইউরোপে খ্রীষ্টধর্মেও তেমন করে নারীকে সমাজে এক অপকৃষ্ট শ্রেণীর মধ্যে ফেলা হয়েছে। 'নারীর মূল্য' গ্রন্থে শরৎচন্দ্র বলেছেন, "জগৎ-বিখ্যাত সেণ্ট পল শিখাইয়াছেন, ধর্মসম্বন্ধে নারী পুরুষের মত কোন প্রশ্ন করিতে পারিবে না। সে সর্বদাই স্বামীর অধীন।"

ভারতবর্ষে বৈদিক যুগে ছিল আরণ্যক সমাজ। তপোবন-সভ্যতার কালে সমাজে নারীপুরুষের সমান মর্যাদার স্থান ছিল। ঋগ্বেদের যুগে মেয়েরা

স্বাধীনভাবে বিদ্যাচর্চা করতে পারতেন। যেসব মেয়েরা আজীবন অবিবাহিত থেকে ধর্ম ও দর্শন চর্চা করতেন, তাঁদের বলা হত ব্রহ্মবাদিনী। অনেক বিদুষী মহিলার নাম আমরা ঋগ্বেদে পেয়ে থাকি। ঋগ্বেদের অনেক অংশ নারীর রচনা। তখন জীবনাচরণে, প্রণয়ে ও পরিণয়ে মেয়েদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা ছিল।

স্মৃতিশাস্ত্রের যুগ থেকে সমাজে নারীর স্থান নানা প্রকার ধর্মীয় বিধি-নিষেধের দ্বারা সংকুচিত করা হয়েছিল। এই সময় থেকে মেয়েদের বাল্যবিবাহ সমাজে প্রচলিত হয়েছে। গৌতম-ধর্মসূত্র এবং বৌধায়ন ধর্মসূত্রে এর নির্দেশ আছে। বাল্যবিবাহের অনিবার্য ফল মেয়েদের স্বাধীনতা ও শিক্ষার সংকোচন। প্রসঙ্গত 'মনুসংহিতা'র দুটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করতে পারি—

(১) "দিবানিশি স্ত্রীলোককে পুরুষের অধীনে রাখিতে হইবে। কুমারী অবস্থায় পিতা, বিবাহের পর স্বামী এবং বৃদ্ধবয়সে পুত্রগণ তাহাকে রক্ষা করিবে, কোন অবস্থায়ই স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার থাকিবে না।"

(২) "স্ত্রী পতির জীবিতকালে তাঁহার পরিচর্যা (আজ্ঞাপালন) করিবে, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতির প্রতি অক্ষুণ্ণ ও অবিচালিত শ্রদ্ধা পোষণ করিবে। পতি যদি অসৎ, অন্য স্ত্রীলোকের প্রীতি আসক্ত এবং সর্বগুণহীন হয় তথাপি পতিকে সর্বদা দেবতার ন্যায় পূজা করিবে।"

সামন্ততান্ত্রিক সমাজে নারীপুরুষের বিবাহ হত পারিবারিক স্বার্থে, পারিবারিক প্রয়োজনে। পরিবারের মান-মর্যাদা, স্বার্থরক্ষা, সম্পদবৃদ্ধি বিবাহের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। কুলমর্যাদা, পণপ্রথা, বর্ণ-গোত্রবিচার প্রভৃতির উৎপত্তি এই কারণে। বাংলাদেশে কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্তন করেছিলেন রাজা বল্লাল সেন। দেবীবর ঘটক কুলীনদের যোগ্যতা অনুসারে মেলবন্ধন করে দিয়েছিলেন। তখন থেকে কুলীনকন্যাদের বিবাহের সমস্যা দেখা দিয়েছিল। পুরুষের বহুবিবাহপ্রথার উৎপত্তি কৌলীন্যপ্রথা থেকে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য যেমন পারিবারিক, তেমনি রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থসিদ্ধি এর সঙ্গে জড়িত। সামন্তপ্রভুদের সঙ্গে চার্চের অথবা শাস্ত্রসার-পুরোহিতদের ছিল জোটবাঁধা। মধ্যযুগে ইউরোপে ক্যাথলিক চার্চের ছিল অখণ্ড প্রতাপ। বাংলাদেশে সামন্তপ্রভুরা নিজেদের স্বার্থে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সহমরণপ্রথা, বিধবার পুনর্বিবাহ-নিষিদ্ধকরণ প্রভৃতি বিধি প্রবর্তন করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-আন্দোলনের নেতারা এই সামন্ত-তান্ত্রিক প্রথাগুলির বিরুদ্ধে কুঠার হেনেছিলেন।

॥ দুই ॥

বাংলাদেশে এই মধ্যযুগীয় অন্ধকারে নতুন চিন্তার আলো এনে দিয়েছিল

ইংরেজ শাসক। ইংরেজের শোষণের ইতিহাস গ্লানিকর, কিন্তু বিজিত দেশের কুসংস্কার মুক্তির প্রয়াস স্মরণীয়। এই শাসক ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য প্রতিভূ, তথাপি একথা ভোলা যায় না যে, রেনেসাঁস-উত্তর ইউরোপের মানুষ। গ্রীক সভ্যতা-সংস্কৃতির উৎস থেকে জন্ম নিয়েছিল রেনেসাঁস, ইতালিতে আত্ম-গোপনকারী গ্রীক পণ্ডিতের চিন্তার ফসল, তার আলো ইতালি থেকে সমস্ত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। ক্যাথলিক চার্চের অখণ্ড প্রভাব থেকে ইউরোপের মানুষকে মুক্ত করে, ইহজীবন তথা মানবজীবনের বিচিত্র অনুসন্ধিৎসার পথে মানুষের মন-বুদ্ধি-চিন্তাকে পরিচালিত করেছিল। এই ইংরেজ সরকার, যে একাধারে শাসক ও শোষক, অন্যদিকে রেনেসাঁস-উত্তর ইউরোপের মানুষ—সর্ব-প্রথমে সে-ই এদেশের মধ্যযুগীয় অন্ধ কুসংস্কারের মূলে আঘাত করেছিল। গঙ্গাসাগরে সন্তানবিসর্জন নিবারণ, সতীদাহপ্রথা নিষিদ্ধকরণ এবং বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন ও নারীশিক্ষা প্রসারে প্রথম ইংরেজ সরকারই এগিয়ে এসে-ছিলেন। প্রথমে সুপ্রীম কোর্ট কলকাতা শহরের মধ্যে সতীদাহ নিষেধ করে দিয়েছিল। ১৮১৫ থেকে ১৮১৭-এর মধ্যে ইংরেজ সরকার জেলা ম্যাজিস্-ট্রেট্দের উপর আদেশ দিয়েছিল সতীদাহপ্রথা নিবারণ ব্যাপারে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে সরকার সতীদাহ সম্পর্কে পুলিশ রিপোর্ট পেশ করেছিল। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আলোচনা হয়েছিল সতীদাহ সম্পর্কে। তেমনি বাংলাদেশে অকালবৈধব্যের বিষময় পরিণাম সম্পর্কে প্রথম সচেতন করিয়ে দিয়েছিল ভারতীয় 'ল কমিশন'—১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে শিশুহত্যা এবং ভ্রূণহত্যার ব্যাপক ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে 'ল কমিশন' দেখেছিলেন অকালবৈধব্য এর কারণ।

স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের ব্যাপারে মিশনারিদের উদ্যোগ এবং সরকারী প্রচেষ্টার কথা মনে রাখতে হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মিশনারিদের উদ্যোগে স্ত্রীশিক্ষার তিনটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। এদের নাম ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি, লেডীজ সোসাইটি, লেডীজ অ্যাসোসিয়েশন।†

১৮২১ খৃষ্টাব্দে মিস্ কুক্ ইংল্যান্ড থেকে কলকাতায় আসেন। তাঁরই উদ্যোগে এক বছরের মধ্যে কলকাতায় আটটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।‡ ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে, ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনকর্তৃক বালিকা বিদ্যালয়ের স্থাপনায় স্ত্রীশিক্ষার তোরণদ্বার উন্মুক্ত হয়।

রেনেসাঁস-উত্তর ইউরোপের দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্য এবং সমাজচিন্তার ফসল আমাদের দেশে এসে পৌঁছেছিল ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে। নব্য ইংরেজি শিক্ষিত যুবকদের যুক্তি ও মানবতাবোধ বাংলাদেশের মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর করে তুলেছিল। ডিরোজিওর ছাত্রমণ্ডলী 'ইয়ং বেঙ্গল' দল, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি নারীমুক্তি আন্দোলনের

পথিকৃৎগণ নব্যজ্ঞানের যুক্তির আলোতে বিচার করতে গিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন শাস্ত্র এখানে নারীমুক্তির পরিপন্থী। শাস্ত্র ছেড়ে বিচারবোধের কাছে, মানবতাবোধের কাছে, আইনের কাছে এ'দের আবেদন। এ'রা কেউ শাস্ত্র-ব্যবসায়ী নন।

সতীদাহপ্রথা নিবারণ ব্যতীত রামমোহনের একটি বড় কাজ হিন্দুনারীর পিতা অথবা স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার স্থাপনের চেষ্টা। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি গ্রে সাহেব হিন্দুর সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিষয়ে পুত্র অথবা পৌত্রের অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছিলেন। রামমোহন এই আইনের প্রতিবাদ করে 'হরকরা'তে এই বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ পত্রাকারে লিখেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন পিতার সম্পত্তিতে কন্যার, স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবা স্ত্রীর উত্তরাধিকার প্রবর্তিত হোক। গ্রে সাহেবের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি সুপ্রীম কোর্টে আপীল করেছিলেন।

১৮২৮-২৯, ডিরোজিও এবং তাঁর ছাত্রমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে'র বৈঠকে বিধবাবিবাহ, সহমরণপ্রথা, বহুবিবাহ প্রভৃতি সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক হত।

বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্র সেনের সমাজসংস্কার আন্দোলনে নারীমুক্তি চিন্তাই প্রাধান্য পেয়েছিল। সেজন্যই সনাতনপন্থীরা এ'দের সহ্য করতে পারেন নি।

উত্তর-রেনেসাঁসের যুগের ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রতিফলিত নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ বাংলা সাহিত্যে প্রথম মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪—১৮৭৩) কাব্যে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর কাব্যের নায়িকারা কেউ অবগুণ্ঠন-বতী, ব্রীড়ানম্র, অসূর্যম্পশ্যা নন। তাঁরা স্পষ্টভাষিণী, ঋজু, বলিষ্ঠ এবং স্বাধিকারচেতনায় দৃপ্ত। 'মেঘনাদবধকাব্যে' চিত্রাঙ্গদা প্রচণ্ড প্রতাপশালী রাবণকে প্রকাশ্য রাজদরবারে অভিযুক্ত করেছেন—"..হায় নাথ, নিজ কর্মফলে মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি।" প্রমীলা গর্বিতভাবে পরিচয় দিয়েছেন 'দানবনন্দিনী' এবং 'রক্ষকুলবধূ' রূপে, ধিক্কার দিয়েছেন দেবপ্রসাদধন্য 'ভিখারী রাঘবকে।' 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের রাধা বলে—'যে যাহারে ভালবাসে/সে যাইবে তার পাশে/মদন রাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে'? 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের নায়িকাদের স্বাধিকারচেতনা আরো প্রবল। 'সোমের প্রতি তারা' অথবা 'নীলধ্বজের প্রতি জনা'র উক্তির মধ্যে বিদ্রোহপ্রবণতা সুস্পষ্ট।

## ॥ তিন ॥

বঙ্কিমচন্দ্র সামন্ততান্ত্রিক সমাজের নির্দেশিত নারীপুরুষের বিবাহরীতি, নারীর গার্হস্থ্য জীবনাদর্শ, সতীধর্ম, সহমরণ, বহুবিবাহ, বিধবার একনিষ্ঠতা

বা ব্রহ্মচর্য পালনে বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। নারী সম্পর্কে সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজের ব্যবস্থায় তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল। 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে তিনি বহুবিবাহকে স্বীকার করেছেন। সপত্নীর সংসারে মানিয়ে চলার উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে প্রফুল্লকে তার জননেত্রীর পদ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন ব্রজেশ্বরের সংসারে। বিবাহিতা শৈবলিনীর পরপুরুষের প্রতি ভালবাসাকে তিনি ক্ষমা করেননি। প্রবল মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়েছেন। 'মৃণালিণী'তে মনোরমা-পশুপতির সহমরণ দেখিয়েছেন। বিধবাবিবাহের ধারণামাত্রকে তিরস্কার করেছেন 'বিষবৃক্ষে' সূর্যমুখীর উক্তিতে, বিদ্যাসাগরের প্রতি কটাক্ষে। 'মৃণালিনী'তে হেমচন্দ্র মনোরমাকে বলেছে, "তুমি বিধবা, যদি স্বামী ভিন্ন অপরকে মনেও ভাব, তবে তুমি ইহলোকে পরলোকে স্ত্রীজাতির অধম হইয়া থাকিবে।"

নারীর সতীত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে এক অত্যাজ্য ধর্ম—"স্ত্রীলোকের সতীত্বের অধিক আর ধর্ম্ম নাই।" (মৃণালিনী) অথবা "ধর্ম্মের জন্য প্রেমকে সংহার করিবে। স্ত্রীর পরম ধর্ম্ম সতীত্ব।" (ঐ) এসব উক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের। সতীত্বকে বঙ্কিমচন্দ্র নারীর নিজস্ব একটি শক্তিরূপে দেখেছেন যা স্বামী-নিরপেক্ষ, যে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় 'বিষবৃক্ষে'র সূর্যমুখীতে, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র ভ্রমরের মধ্যে, 'রজনী'র লবঙ্গলতায়, 'মৃণালিনী'র মনোরমাতে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে সতীত্ব অন্ধ, অযৌক্তিক এক সংস্কার, যার মূল অবচেতন মনের গভীরে প্রসারিত। 'শ্রীকান্তে'র অন্নদাদিদি, 'গৃহদাহে'র মৃণাল, 'পথ-নির্দেশে'র হেম, 'দেনাপাওনা'র ষোড়শী, 'চরিত্রহীনে'র সাবিত্রী তার দৃষ্টান্ত।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করলেও বঙ্কিম-চন্দ্রের নারীচরিত্র পরিকল্পনায় উত্তর-রেনেসাঁস যুগের ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব দেখা যায়। তাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাসে নারীচরিত্র অসাধারণ ব্যক্তিত্বময়ী।

'বিষবৃক্ষে'র সূর্যমুখী স্বামীর দুর্বলতার কথা জানতে পেরে নিজেই উদ্যোগী হয়ে নগেন্দ্রের সঙ্গে সূর্যমুখীর বিবাহ দিয়েছে। বিবাহের পর সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করেছে। মৃত্যুশয্যাশায়ী ভ্রমরের ক্ষমাহীনতার অনল কী মর্মদাহী! এই আগুন ভ্রমরকে দগ্ধ করেছে অথচ তাকে নির্বাপিত করার বাসনা ভ্রমরের নেই। গোবিন্দলাল তার কাছে ফিরে আসতে চাইলে ভ্রমর লিখেছে ঃ

"আপনার আসার জন্য সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া আমি পিত্রালয়ে যাইব। যতদিন না আমার নূতন বাড়ি প্রস্তুত হয়, ততদিন আমি পিত্রালয়ে বাস করিব। আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট, আপনিও যে সন্তুষ্ট, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

আপনার দ্বিতীয় পত্রের প্রতীক্ষায় রহিলাম।"

'রাজসিংহ' উপন্যাসে চঞ্চলকুমারী স্বেচ্ছায় প্রৌঢ় রাজসিংহকে পতিত্বে বরণ

করেছিলেন তাঁর বীরত্বের জন্য। 'মৃণালিনী'তে মনোরমা স্বেচ্ছায় সহমরণে উদ্যোগী হয়েছে—"আমি সেই নিরুদ্দিষ্টা কেশবকন্যা। অনুকরণ ভয়ে পিতা আমাকে এতকাল লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন। আমি আজ কালপূর্ণে বিধিলিপি পূরাইবার জন্য আসিয়াছি।"

'দুর্গেশনন্দিনী'তে আয়েষা অনেক বেশি স্বাধীন। রাত্রিকালে জগৎসিংহের দর্শনাভিলাষী আয়েষা একাকিনী কারাগারে উপস্থিত হলে ওস্মান তার কাছে কৈফিয়ত চায়। আয়েষা দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর দিয়েছে—"এ নিশীথে একাকিনী কারাগারের মধ্যে আসিয়া এই বন্দীর সহিত আলাপ করা, আমার ইচ্ছা। আমার কর্ম্ম উত্তম কি অধম, সে কথায় তোমার প্রয়োজন নাই।"

তারপর গ্রীবা উত্তোলিত আয়েষার সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি—"ওসমান, যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর, তবে আমার উত্তর এই যে, এ বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।" নারীর স্বাধিকারচেতনার এক বড় ঘোষণা।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে 'কপালকুণ্ডলা'র সেই অংশটি, নবকুমার মতিবিবির প্রেম প্রত্যাখ্যান করে তাকে আগ্রায় ফিরে যেতে বলে। মতিবিবির প্রবল আত্মাভিমান আহত হয়। তখন—"লুৎফ-উন্নিসা তীরবৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া সদর্পে কহিলেন— "এ জন্মে তোমার আশা ছাড়িব না।" তিনবার দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করেছে সে 'এ জন্মে' এবং 'আশা ছাড়িব না' শব্দগুলি। গ্রীবা উন্নত করে, রাজমোহিনীর মত, বিদ্যুৎস্ফুরিত আয়ত লোচনে মতিবিবি শেষবার বলেছিল—"এ জন্মে নয়। তুমি আমারই হইবে।"

নারীর ব্যক্তিত্বের সেই শক্তি দেখে বিস্মিত বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—"যে অজেয় মানসিক শক্তি ভারত রাজ্য-শাসন কল্পনায় ভীত হয় নাই, সেই শক্তি আবার প্রণয়-দুর্বল দেহে সঞ্চারিত হইল।" এই গর্বোন্নত ভঙ্গি, অভিমানস্ফুরিত মুখাবয়ব নবকুমারকে চিনিয়ে দিল বিস্মৃতপ্রায় পদ্মাবতীকে। বার বৎসরের বালিকা পদ্মাবতী একদিন রাত্রে স্বামীর রূঢ় আচরণের প্রতিবাদ জানিয়েছিল 'অনবনমনীয়' গর্বের ভঙ্গিতে।

নারীব্যক্তিত্বের এই শক্তিকে উপযুক্ত শিক্ষায় শাণিত কুঠারে পরিণত করা যেতে পারে—বঙ্কিমচন্দ্রের দূরদৃষ্টিতে সেই সম্ভাবনার কথা ধরা পড়েছিল। ভবানী পাঠক প্রফুল্লকে দেখে সেই সম্ভাবনার কথা ভাবতে পেরেছিলেন। গভীর অরণ্যে একাকী যে মেয়ে বুদ্ধি ও মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে না, যে অপরিচিত পুরুষ ভবানীপাঠকের প্রতিটি কূট প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর দেয়, ভবানী পাঠক তাকে দেখেই রঙ্গরাজকে বলেছিলেন—"সে সামগ্রী পাইবার নয়, তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। জগদীশ্বর লোহা সৃষ্টি করেন, মানুষে কাটারি গড়িয়া লয়। ইস্পাত ভাল পাইয়াছি, এখন পাঁচ সাত বৎসর ধরিয়া গড়িতে শাণিতে হইবে।"

পাঁচ বছরের শারীরিক মানসিক ব্যবহারিক শিক্ষায় এই পল্লীবধূ প্রফুল্লকে জননেত্রী দেবীচৌধুরাণীতে পরিণত করতে পেরেছিলেন ভবানী পাঠক।

বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে সামিল হবার মতো উপযুক্ত আরো একটি নারীচরিত্র বঙ্কিমসাহিত্যে দেখা যায়। সে হল 'আনন্দমঠের' শান্তি। অধ্যাপক পিতার টোলে পুরুষ সহাধ্যায়ীদের সঙ্গে তার বিদ্যাশিক্ষা, সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের সঙ্গে থেকে তার শারীরিক শিক্ষার সুযোগ ঘটেছিল। উভয়বিধ শিক্ষার গুণে এবং সাহস ও বুদ্ধির জোরে নবীনানন্দের ছদ্মবেশে সে আনন্দমঠের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থান করে নিয়েছিল। এমনকি বহুদর্শী সত্যানন্দকেও সে বিস্মিত করেছিল বুদ্ধির প্রখরতায় এবং শারীরিক শক্তির সামর্থ্যে। সত্যানন্দ শান্তিকে তিরস্কার করেছিলেন। স্বামী জীবানন্দের সন্ধানে সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ে যোগদানের জন্য। প্রদীপ্তা শান্তি সঙ্গে সঙ্গে সেই তিরস্কারের যোগ্য জবাব দিয়েছে—"আমি তাঁহার সহধর্ম্মিণী, তিনি ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত, আমি তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ করিতে আসিয়াছি।" শান্তি পত্নীর দায়িত্ব, কর্তব্যবোধ এবং অধিকারবোধের কথা বলেছে। ঋগ্বেদের যুগের নারীর মতো শান্তিও বিবাহিত জীবনে নারীপুরুষের সহযোগিতা ও সমকক্ষতার ধারণাই মনে পোষণ করে।

বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর স্বাধীনতার প্রশ্ন তুলেছিল কপালকুণ্ডলা। ননদিনী শ্যামাসুন্দরীর হিতার্থে গভীর রাত্রে অরণ্যে একাকী শিকড় তুলতে যাওয়ার প্রসঙ্গে শ্যামাসুন্দরী নিজেই তাকে নিষেধ করে, পাছে নবকুমার রাগান্বিত হয়। জন্মস্বাধীন কপালকুণ্ডলা তখন বলে ওঠে—"ইহাতে তিনি যদি অসুখী হয়েন, আমি কি করিব ? যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।" পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগে'র কুমুদিনীর মুখে এই ধরনের উক্তি শুনি।

## ॥ চার ॥

রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে নারীর বিদ্রোহ ও মুক্তির কথা লিখেছেন তাঁর সমকালের সামাজিক পটভূমির দ্রুত পরিবর্তনকে অনুধাবন করে। তাঁর উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিত বাস্তব, মধুসূদন বা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো রোমান্সের জগৎ নয়। তাঁর উপন্যাসের নারীদের প্রত্যক্ষ সংঘাত শুরু হয়েছে পারিবারিক-সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের অনুধাবন ও বিশ্লেষণ অনেক বেশি বাস্তবানুগ।

প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইউরোপের সামাজিক পটভূমির দ্রুত পরিবর্তন শুরু হয়। শিল্পবিপ্লবের পর শ্রমিকের কাজে মেয়েরা নিযুক্ত হতে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের ধাক্কায় অর্থনৈতিক কাঠামো বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন থেকে কলকারখানায়, অফিসে, বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠানে কর্মীমেয়েদের সংখ্যা

দ্রুত বাড়তে থাকে। শিল্পবিপ্লবের আবির্ভাবে পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার অবসানকাল ঘনিয়ে আসে। দুটি মহাযুদ্ধের আঘাতে পুরাতন সমাজব্যবস্থার কাঠামো ভেঙে পড়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে কর্মী-মেয়েদের সংখ্যাধিক্য হওয়ার ফলে মেয়েরা ভোটাধিকারের জন্য আন্দোলন শুরু করে। ১৯২০ সালে মেয়েদের ভোটাধিকারের জন্য আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হয়। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ইবসেনের 'এ ডল্‌স্ হাউস'-এর নায়িকা নোরা তার স্বামী হেলমারের কথার উত্তরে বলেছে, 'আমি মনে করি সবার আগে আমি মানুষ।' ১৯১৪-তে জার্মানির রোজা লুক্সেমবার্গ এবং ক্লারা সেৎকিনের নেতৃত্বে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে। এঁরা দুজনে মেয়েদের মধ্যে কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রচারের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। অবশেষে ১৯১৭ সালে রাশিয়ার জারতন্ত্রের পতনে বলশেভিক বিপ্লবে মেয়েরা উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে। ম্যাক্সিম গর্কীর 'মাদার' উপন্যাসে মেয়েদের এই নতুন ভূমিকার পরিচয় রয়েছে।

এই দ্রুতপরিবর্তনশীল সামাজিক পটভূমিকায় নারীপুরুষের পুরাতন সম্পর্কেরও দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ইবসেনের 'এ ডল্‌স্ হাউস'-এ যার ইঙ্গিত আছে। ক্লারা সেৎকিন রচিত 'আমার স্মৃতিতে লেনিন' (লেনিন : নারীমুক্তি : প্রগতি প্রকাশন : মস্কো) পুস্তিকায় পরিবর্তনশীল এই দুনিয়ায় নরনারীর সম্পর্কের, বিবাহিত জীবনের ধারণার পরিবর্তনের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করেছেন। লেনিনের উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

১। "প্রাচীন অনুভূতি ও চিন্তাধারার পৃথিবী ভেঙে যাচ্ছে। আগেকার সামাজিক বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ছে, ছিঁড়ে যাচ্ছে।"

২। "যুদ্ধের পরিণাম এবং সূচিত বিপ্লবের আবহাওয়ায় প্রাচীন মতাদর্শের মূল্যে ভেঙে পড়ছে, তাদের রক্ষণশক্তি যাচ্ছে হারিয়ে। নতুন নতুন মূল্য দানা বাঁধছে ধীরে ধীরে লড়াইয়ের মাধ্যমে। মানুষের সঙ্গে মানুষের, পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্কের ধারণাগুলির হচ্ছে আমূল পরিবর্তন। আমূল পরিবর্তন হচ্ছে অনুভূতি আর চিন্তাধারারও।"

৩। "বুর্জোয়া বিবাহ-রীতির পচন, দুর্গন্ধ এবং নোংরামি, তার বিচ্ছেদের দুরূহতা, তার স্বামীর স্বাধীনতা এবং স্ত্রীর দাসত্ব আর তার যৌননীতি ও সম্পর্কের জঘন্য মিথ্যায় শ্রেষ্ঠ মন অতিশয় ঘৃণায় ভরে ওঠে।"

৪। "বুর্জোয়াদের ধারণা মতো বিবাহ-পদ্ধতি এবং যৌন মিলন আর তৃপ্তি দেয় না। প্রলেতারীয় বিপ্লবের মতোই বিবাহ এবং যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একটি বিপ্লব ঘনিয়ে আসে।"

নরনারীর সম্পর্কের বিবাহিত জীবনের যে পরিবর্তনের কথা লেনিন বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র উপন্যাসে তারই বিভিন্ন স্তর আমরা দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথ তিনবার ইউরোপ ভ্রমণে বের হয়েছিলেন। যৌবনে ব্যারিস্টারি

পড়ার জন্য প্রথম ইংল্যান্ড গিয়ে সেখানকার স্ত্রীস্বাধীনতা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন—'ইউরোপ প্রবাসীর পত্রে' সে কথা আছে। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় ভ্রমণের ফলে সমাজের বিভিন্ন স্তরে মেয়েদের জীবনের পরিবর্তন তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর নিজের পরিবার ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীপ্রগতির প্রাঙ্গণ। স্বদেশের সমাজে দেখেছিলেন সামন্তযুগের অবসান। এই সময় উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়েরা অধিক সংখ্যায় শিক্ষার জগতে প্রবেশ করছিলেন। বাংলাদেশের মেয়েরা রাজনৈতিক সংগ্রামেও যোগ দিতে শুরু করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত নারীমুক্তির বিচিত্র স্তর রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যনাট্যে ছোটগল্পে উপন্যাসে দেখিয়াছেন। রেনেসাঁসের পরবর্তীকালের রোমান্টিক সাহিত্যের একটি বিশেষ প্রবণতা ছিল নারীর উপর দিব্যমহিমা আরোপ করা। দান্তে ও পেত্রার্কার কাব্য থেকে তার শুরু। 'চিত্রাঙ্গদায় নায়িকা চিত্রাঙ্গদা প্রথম সেই আরোপিত অলীক মহিমার আবরণ নিজের হাতে ভেঙে দিয়ে বলেছে—'দেবী নহি, নহি আমি সামান্য রমণী।'

'যোগাযোগে' কুমুদিনীর মা নন্দরাণী স্বামী মুকুন্দলালের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বৃন্দাবন চলে গিয়েছিলেন। 'মানভঞ্জন' গল্পের গিরিবালার প্রতিশোধস্পৃহা আরো তীব্র। স্বামী গোপীনাথ এক অভিনেত্রীর প্রতি আসক্ত। চরম প্রতিশোধ নেবার আকাঙ্ক্ষায় গিরিবালা গৃহত্যাগ করে রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রীর ভূমিকায় আবির্ভূত হয়। 'স্ত্রীর পত্রে' মৃণালের প্রতিবাদ ও গৃহত্যাগ বাংলাদেশের সমাজের মূল বনিয়াদে গিয়ে আঘাত করেছে।

মৃণালের গৃহত্যাগের প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী। বিন্দু নামে এক পিতৃ-মাতৃহীন নিরাশ্রয় বালিকার প্রতি সমাজের নিষ্ঠুর পীড়নের প্রতিবাদে মাখন বড়ালের গলির সাতাশ নম্বর বাড়ির মেজ বৌ মৃণাল সংসার ত্যাগ করেছিল। 'পয়লানম্বর' গল্পের অনিলার গৃহত্যাগের কারণ 'এ ডলস্ হাউস'-এর নায়িকা নোরার মতো। উদাসীন গ্রন্থকীট স্বামীর গৃহে অথবা ধনবান প্রেমিক সীতাংশুমৌলীর প্রাসাদে নিছক 'মেয়েমানুষ' হয়ে বেঁচে থাকার অগৌরবের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য অনিলার এমন নিঃশব্দে গৃহত্যাগ।

'অপরিচিতা' গল্পের শম্ভুনাথ অপমানকর বিবাহরীতি, দেনা-পাওনার সম্পর্ক, পাত্রের চারিত্রিক দুর্বলতা ও পাত্রের অভিভাবকের নির্লজ্জতার প্রতিবাদে কন্যা কল্যাণীর ভাবী পাত্রকে বিবাহ আসর থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

'চোখের বালি'র বিনোদিনীর সঙ্গে 'বিষবৃক্ষের' কুন্দনন্দিনী, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণী এবং শরৎচন্দ্রের কিরণময়ী, সাবিত্রী রমা ও হেমের সঙ্গে তুলনা করলে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য বোঝা যাবে। বিধবা

বিনোদিনীর বিহারীর প্রতি ভালোবাসার মধ্যে লেখকের অথবা বিনোদিনীর অথবা বিহারীর কোন পাপচেতনা, অপরাধবোধ নেই। যেমন আছে পূর্বোক্ত চরিত্রে। বিধবার প্রণয়কে পরিণয়ে পরিণতি দেওয়ার প্রতিকূল পরিবেশ তখনকার সমাজে ছিল না। বাস্তবগত কারণে বিনোদিনীই শেষপর্যন্ত বিহারীর বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। ব্যক্তিত্বময়ী সর্বগুণসম্পন্না বিনোদিনীর পাশে আত্মবিলাসী মহেন্দ্র এবং অন্যনির্ভর বালিকা আশার অসম্পূর্ণ দাম্পত্য জীবনের দুর্বলতা আমাদের চোখে পড়ে।

'গোরা' উপন্যাসে বিনয় ও ললিতা উভয়ে নিজ সমাজের নিষেধ অগ্রাহ্য করে বিবাহবন্ধনে মিলিত হয়েছিল। একমাত্র পরেশবাবু ব্যতীত তাদের এই বিবাহে আর কোন আত্মীয়বন্ধু সমর্থন জানায় নি। অপরদিকে গোরা নতুনকালের মেয়ে সুচরিতার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছে—"তোমাকে দেখে অবধি একটি নূতন কথা দিবারাত্রি আমার মাথায় ঘুরছে। এতদিন সে কথা আমি ভাবিনি। কেবলই আমার মনে হচ্ছে কেবল পুরুষের দৃষ্টিতেই তো ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ হবেন না। আমাদের মেয়েদের চোখের সামনে যেদিন আবির্ভূত হবেন সেইদিনই তাঁর প্রকাশ পূর্ণ হবে। তোমার সঙ্গে একসঙ্গে একদৃষ্টিতে আমি আমার দেশকে সম্মুখে দেখব এই একটি আকাঙ্ক্ষা যেন আমাকে দগ্ধ করছে।"

সুচরিতা ও ভারতবর্ষ গোরার কাছে অবিচ্ছেদ্য।

'চতুরঙ্গে' দামিনী যেন সেই আদিম যুগের শক্তিময়ী নারী। ধর্ম যার পায়ে দাসত্বের শৃঙ্খল পরিয়েছিল। নিঃসন্তান বিধবা দামিনীকে যৌবনকালে তার পতিদেবতা জীবনস্বত্ব দিয়ে তার বাড়ি ও সম্পত্তি গুরু লীলানন্দ স্বামীকে দিয়ে যায়।

যে ধর্ম জীবনবিরোধী, যার দাসত্ব করতে হয় মানুষকে, যা আচ্ছন্ন করে দেয় মানুষের সহজ বিচারবুদ্ধি, সেই ধর্মের ঘরে সেবাদাসী হয়ে থাকতে রাজী নয় দামিনী। দামিনী তাই লীলানন্দ স্বামীর সম্প্রদায়ের সর্বপ্রকার বিধি ইচ্ছাপূর্বক লঙ্ঘন করে। সে বিদ্রোহ করে শচীশকে বলে, "তোমাদের ভক্তরা যে এই ভক্তিহীনাকে ভক্তির গারদে পায়ে বেড়ি দিয়া রাখিয়াছে।" শচীশ তাকে অন্যত্র যাবার জন্য অনুরোধ করলে দামিনী প্রতিবাদ করে বলেছে, "তোমাদের কোনো ভক্ত বা এক মতলবে এক বন্দোবস্ত করিবেন, কোনো ভক্ত বা আর এক মতলবে আর এক বন্দোবস্ত করিবেন—মাঝখানে আমি কি তোমাদের দশ পঁচিশের ঘুঁটি?' তার চরম সিদ্ধান্ত সে শচীশকে জানিয়েছে, "আমাকে তোমাদের ভালো লাগিতেছে না বলিয়া তোমাদের ইচ্ছায় আমি নড়িব না।"

যে ধর্ম বহু যুগ ধরে নারীর পায়ে শৃঙ্খল পরিয়েছে, প্রশ্রয় দিয়েছে পুরুষকে, দামিনী সেই ধর্মের ধ্বজাধারীদের প্রতি তীব্র, তীক্ষ্ম প্রশ্নবাণ

নিক্ষেপ করেছে, "তার দয়া নাই, বিশ্বাস নাই, লজ্জা, শরম নাই। এই নির্মম নিষ্ঠুর সর্বনেশে রসের রসাতল হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার কী উপায় তোমরা করিয়াছ?"

শেষ পর্যন্ত ধর্মের দাসত্ব থেকে দামিনীকে মুক্তি দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শ্রীবিলাসের সঙ্গে বিধবা দামিনীর বিবাহ হয়েছিল।

সামন্ততান্ত্রিক যুগের দাম্পত্য সম্পর্ক, বিবাহের ধারণা, নারীপুরুষের সম্পর্কের যে পরিবর্তনের কথা লেনিন ক্লারা সেৎকিনের স্মৃতিকথাতে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে', 'যোগাযোগ' উপন্যাসের বিষয় এই পটভূমিকায় উপস্থাপিত হয়েছে। নব্যযুগের শিক্ষিত যুবক নিখিলেশ জমিদার, সামন্ততান্ত্রিক পরিবারের শেষ বংশধর। তার দুই বিধবা ভ্রাতৃবধূর বিবাহিত জীবনের অপমান ও বেদনা সম্ভবত এই সমাজের সমস্ত নারীর দুঃখকে বুঝবার শক্তি তাকে দিয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষার ফলে সে জেনেছে 'স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ।' নিখিলেশ বুঝেছিল, "সমস্ত সমাজ যে চারিদিক থেকে আমাদের মেয়েদের মনকে চেপে ছোটো করে বাঁকিয়ে রেখে দিয়েছে।" বিমলাকে সে শিক্ষার সুযোগ করে দিয়েছে গৃহে, ইংরেজ শিক্ষিকা রেখে। বাইরের পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত করতে চেয়েছে। নিখিলেশ বলেছে, "আমি চাই বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও, আমি তোমাকে পাই। ওইখানে আমাদের দেনাপাওনা বাকী আছে।" সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিবাহরীতিতে স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক আরোপিত। বিশেষ করে আমাদের হিন্দুবিবাহে স্বামীর ক্ষেত্রে আইডিয়া আরোপিত হয়ে এসেছে, পূর্বতন সমাজে বিবাহিত নারী পতিনামে এক আইডিয়াকে পুজো করে এসেছে এতাবৎকাল। নিখিলেশ সেই পুরাতন পদ্ধতির মূলে আঘাত করতে চেয়েছে, "এখানে আমাকে দিয়ে তোমার চোখ কান মুখ সমস্ত মুড়ে রাখা হয়েছে—তুমি যে কাকে চাও তাও জান না, কাকে পেয়েছ তাও জান না।"

স্বামী নামে এক আইডিয়াকে নয়, নিখিলেশের ব্যক্তিস্বরূপকে বুঝুক বিমলা, তার স্বাধীন বিচারশক্তি দিয়ে, নিখিলেশ এই চেয়েছিল, "স্ত্রী বলেই যে তুমি আমাকে কেবলই মেনে চলবে তোমার উপর আমার এ দৌরাত্ম্য আমার নিজেরই সইবে না।" জীবনের কঠিন দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে বিমলা বুঝতে পেরেছিল নিখিলেশের ব্যক্তিস্বরূপ।

ক্লারা সেৎকিনের স্মৃতিকথাতে বুর্জোয়া সমাজের বিবাহ-সম্পর্কে লেনিন বলেছেন, 'বুর্জোয়া রাষ্ট্রে বিবাহ এবং পরিবার সম্পর্কে যে আইনের নিগড় বর্তমান, সেটা অমঙ্গলকে বাড়ায়, আর বিরোধকে তীক্ষ্ণতর করে তোলে। এটাই হল—"পবিত্র মালিকানার নিগড়। ক্রয়-বিক্রয়ের মনোবৃত্তিকে, নীচতা

ও কদর্যতাকে সেটা পবিত্র করে তোলে। বাকীটা সম্পূর্ণ হয় "সম্ভ্রান্ত" বুর্জোয়া সমাজের অন্তর্নিহিত প্রবঞ্চনা দ্বারা।'

বিবাহিত সম্পর্কের নামে তথাকথিত এই 'পবিত্র মালিকানা'র নিগড়ের বিরুদ্ধে 'যোগাযোগে'র কুমুদিনীর বিদ্রোহ। তার পিতা মুকুন্দলালের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদে জননী নন্দরানী গৃহত্যাগ করেছিলেন। মুকুন্দলাল স্ত্রীকে ভালোবাসতেন, তাঁকে গৃহিণীর মূল্য দিয়েছিলেন। কিন্তু ধনকুবের মধুসূদনের সঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক পরিবারের মেয়ে কুমুদিনীর দাম্পত্য সম্পর্ক 'ক্রয়-বিক্রয়ে'র মনোবৃত্তি এবং 'পবিত্র মালিকানা'র ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। বিরোধ এইখানেই। পজিটিভিস্ট বিপ্রদাসের কাছ থেকে ভগিনী কুমুদিনীর শিক্ষালাভ হয়েছিল। দাদার উদার শিক্ষায় কুমুদিনীর মনে নিজস্ব রুচি, ধারণা এবং এক ধরনের মানসিক স্বাতন্ত্র্য গড়ে উঠেছিল। বিপ্রদাস নিখিলেশের মতোই এই সমাজের মেয়েদের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতো, 'আমি দেখতে পাচ্ছি, মেয়েদের যে অপমান, সে আছে সমস্ত সমাজের ভিতরে, সে কোনো একজন মেয়ের নয়।' এবং "সহ্য করা ছাড়া মেয়েদের অন্য কোন রাস্তা একেবারেই নেই বলেই তাদের উপর কেবলই মার এসে পড়ছে। বলবার দিন এসেছে যে সহ্য করব না।"

মধুসূদন যেদিন টাকার জোরে কুমুদিনীকে বিয়ে করে নিয়ে চলে গেল সেদিন আঁচলে গ্রন্থিবন্ধ তাদের যুগল মূর্তিকে বিপ্রদাসের 'বীভৎস' মনে হয়েছিল।

কুমুদিনী-মধুসূদনের দাম্পত্যজীবনের বিরোধ প্রধানত মানসিক—রুচি, ব্যক্তিত্ব এবং মূল্যবোধের। মধুসূদনের ভালোবাসা ছিল কুমুদিনীর প্রতি, কিন্তু বিবাহ এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে সে মালিকানার দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত। এর বাইরে তার দৃষ্টি যায় না। মতির মায়ের ভাষায় মধুসূদন শুধু অন্যকে গোলামি করায় না, নিজেও গোলামি করে। কুমুদিনী বিবাহ করতে প্রস্তুত হয়েছিল স্বামী সম্পর্কে এক ভাবমূর্তিকে মনে ধারণ করে।

মধুসূদনের ব্যবহারে আহত হয়ে তাই সে প্রশ্ন করেছে—"গৃহিণী সচিবঃ সখীমিথঃ/প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ—এই ফর্দের মধ্যে দাসী তো কোথাও নেই। সত্যবানের সাবিত্রী কি দাসী? কিংবা উত্তররামচরিতের সীতা?"

সংঘাতের চরম মুহূর্তে কুমুদিনী মধুসূদনের গৃহ পরিত্যাগ করে চলে এসেছে। সন্তানসম্ভাবনার কথা শুনেও সে খুশী হয়নি, বরং মধুসূদনের সঙ্গে তার রক্তমাংসের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য হয়ে গেল মনে হওয়ায় সম্পর্কের 'বীভৎসতা' তাকে পীড়িত করেছে। বিপ্রদাসকে সে বলেছে, "দাদা, সেইদিন তুমি আমাকেও স্বাধীন করে নিয়ো। ততদিন ওদের ছেলেকে আমি ওদের হাতে দিয়ে যাব। এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যেও খোয়ানো যায় না।"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সমস্ত পৃথিবী জুড়ে মেয়েদের বাঁচার লড়াই শুরু হয়ে গেছে। আমরা আজ বুঝতে পেরেছি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত মেয়েদের কোন স্বাধীনতাই সম্ভবপর নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষপর্বের দুটি উপন্যাসে মেয়েদের সেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথাও বলেছেন।

'শেষের কবিতা'র লাবণ্য অধ্যাপক পিতার কাছে যথাযোগ্যভাবে শিক্ষিত হয়ে উঠেছে। পিতা অবনীশের দ্বিতীয় বিবাহের পর লাবণ্য আর পিতৃগৃহে থাকে নি। পৈতৃক সম্পত্তির সমস্ত উত্তরাধিকার প্রত্যাখ্যান করে লাবণ্য সুদূর শিলঙে চলে এসেছে যোগমায়ার কন্যার গৃহশিক্ষিকার কাজ নিয়ে।

'চার অধ্যায়ে' এলার পিতা নরেশ দাশগুপ্তও ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, সাইকোলজিতে বিলিতি ডিগ্রীপ্রাপ্ত। তিনি পেশায় অধ্যাপক, তীক্ষ্ণ তাঁর বৈজ্ঞানিক বিচারশক্তি। কন্যা এলাকে তিনি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলেন। সুন্দরী এবং সুশিক্ষিতা এলার বিবাহবিরোধিতা এত প্রবল ছিল যে বহু উপযুক্ত পাত্রকে সে প্রত্যাখ্যান করেছিল, বাংলা সাহিত্যের গবেষণায় নিযুক্ত রেখেছিল নিজেকে। অবশেষে পিতার মৃত্যুর পর ইন্দ্রনাথের আহ্বানে সে নারায়ণী হাই স্কুলের শিক্ষকতার কাজ নিয়ে পিতৃব্যগৃহ ত্যাগ করে চলে এসেছিল। 'মালঞ্চে'র সরলা স্বাধীন ও স্বনির্ভর মেয়ের আর-একটি দৃষ্টান্ত।

## ॥ পাঁচ ॥

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের সময়-সীমা ১৯০৩ থেকে ১৯৩৪ সাল। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের সময়-সীমা ১৯১৭ থেকে ১৯৩৩। অথচ নারীমুক্তি-আন্দোলনের যতগুলি স্তর আমরা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে পাই, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে তা পাই না। ১৩৩০ সালে শরৎচন্দ্র 'নারীর মূল্য' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটির মধ্যে তাঁর বহু পঠনের এবং নারীর প্রতি যথার্থ সহানুভূতির পরিচয় রয়েছে। অথচ এই গ্রন্থে তিনি নারীমুক্তির কোন পথ দেখাতে সমর্থ হন নি। এই গ্রন্থে শরৎচন্দ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন সমাজের নারীনির্যাতন এবং নারীর অবমূল্যায়নের বহু দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। বোঝা যায় সর্বদেশের, সব সমাজের নারীর জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর প্রবল অনুসন্ধিৎসা ছিল। এই গবেষণামূলক কাজের পিছনে রয়েছে নারী সম্পর্কে তাঁর ব্যাপক ও গভীর সহানুভূতি।

'নারীর মূল্য' গ্রন্থে শরৎচন্দ্র সামন্ততান্ত্রিক সমাজে নারীর মুক্তির প্রধান প্রতিবন্ধক যে ধর্ম সেকথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। ধর্মের পিছনে পুরোহিত ও রাষ্ট্রের মিলিত শক্তি কীভাবে ও কেন কাজ করছে সে কথা তিনি কোথাও বলেন নি। সমাজে পুরুষ ও নারীর এই অসম অবস্থার জন্য 'সতীত্ব' কথাটি শুধু মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে, পুরুষের জন্য নয়, এই ইঙ্গিত

রয়েছে 'নারীর মূল্য' গ্রন্থে। কিন্তু কীভাবে মেয়েদের পতিতাবৃত্তিগ্রহণে বাধ্য করা হয়েছে তার কোন ইতিহাস এই গ্রন্থে কোথাও নেই। চন্দ্রমুখী, রাজলক্ষ্মী, এবং বিজলী—শরৎচন্দ্রের এই তিন নারী যারা দেহোপজীবিনীর জীবিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল, তাদের জীবনে যন্ত্রণার ইতিহাস এবং সামাজিক পরিস্থিতিকে বড় করে না দেখিয়ে শরৎচন্দ্র তাদের উপর সতীত্বের এক অবমূর্তি আরোপিত করে তাদের পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। ক্লারা সেৎকিনের স্মৃতিকথাতে লেনিন বলেছেন, "...এই ব্যাপারে আমার খুব মনে পড়ছে এক সাহিত্যিক রেওয়াজের কথা, যাতে প্রত্যেক বারবনিতাকেই দেখানো হত লক্ষ্মীমণি ম্যাডোনা হিসাবে।"

পতিতাবৃত্তি থেকে মেয়েদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার পথ নির্দেশ করেছেন লেনিন ঐ গ্রন্থে—উৎপাদনের কাজে তাদের ফিরিয়ে আনা এবং সামাজিক অর্থনীতিতে তাদের স্থান করে দেওয়া।

কী উপন্যাসে, কিংবা 'নারীর মূল্য' গ্রন্থে শরৎচন্দ্র পতিতাবৃত্তিকে আড়াল করে পতিতাদের কথা বলেছেন। যেমন 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' প্রসাদপুরের কুঠীতে রোহিণীর জীবনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে লেখক বঙ্কিমচন্দ্র যবনিকা টেনে দিয়ে বলেছেন যে তিনি পাপের চিত্র আঁকতে কুণ্ঠিত, জানি না এই ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের সেই ধরনের কোন কুণ্ঠা ছিল কিনা। 'রেজারেক্‌শন' ও 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশ্‌মেন্ট' গ্রন্থে, রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক' গল্পে, এমনকি সুবোধ ঘোষের 'বারবধূ'তেও পতিতাবৃত্তি ও জীবনের যে যন্ত্রণাদায়ক চিত্র আছে শরৎচন্দ্র পতিতাকে 'লক্ষ্মীমণি ম্যাডোনা'য় পরিণত করে সেই বৃত্তির যন্ত্রণাকে আড়াল করেছেন।

গ্রন্থের শেষে শরৎচন্দ্র সব দেশের সব সমাজে নারীর মূল্য প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন করেছেন, "সুসভ্য মানবের সুস্থ সংযত শুভবুদ্ধি যে অধিকার রমণী জাতিকে সমর্পণ করিতে বলে, তাহাই সামাজিক নীতি এবং তাহাতেই সমাজের কল্যাণ হয়। কোন একটা জাতির ধর্মপুস্তকে কি আছে না আছে, তাহাতে হয় না। নারীর মূল্য বলিতে আমি এই নীতি ও অধিকারের কথাই এতদূর পর্যন্ত বলিয়া আসিয়াছি।" শরৎচন্দ্রের এই আবেদন মানুষের শুভবুদ্ধি ও মানবতাবোধের কাছে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সনদ রূপে 'নারীর মূল্য' উল্লেখযোগ্য।

১৩৩০ সালে 'নারীর মূল্য' যখন প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশে তথা বিশ্বে নারীমুক্তি আন্দোলনের বৃহত্তম ঘটনাগুলি অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। প্রথম মহাযুদ্ধ তখন সমাপ্ত। ইউরোপে শ্রমিক ও কর্মী মেয়ের সংখ্যা তখন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯২০ সালে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে মেয়েদের ভোটাধিকারের জন্য আন্দোলন। রুশ-বিপ্লবের ঐতিহাসিক সাফল্য তখনকার পৃথিবীতে বিস্ময়-

কর সংবাদ। রুশ-বিপ্লবে মেয়েদের যোগদান, বিপ্লবে মেয়েদের ভূমিকা সম্পর্কে লেনিনের নির্দেশ, বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার শ্রমিকমেয়েদের জীবনের দ্রুত উন্নতি এবং পতিতাবৃত্তিধারী মেয়েদের সম্পর্কে লেনিনের কার্যসূচী প্রভৃতি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা সম্পর্কে শরৎচন্দ্র এই গ্রন্থে একান্ত অনবহিত। বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে তখন মেয়েদের সংখ্যাবৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষকতার কাজে, রাজনীতিতে মেয়েরা এগিয়ে এসেছেন। শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে বিশ্বদুনিয়ার দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। নারীমুক্তি সম্পর্কে যে-কোন অনুসন্ধিৎসু বুদ্ধিজীবীর কাছে এসব ঘটনা এড়িয়ে যাবার নয়। অথচ 'নারীর মূল্য' গ্রন্থে এসব ঘটনার উল্লেখমাত্র নেই। গ্রন্থটি পড়লে মনে হয় আমরা যেন এক অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগে বাস করছি। নারীর মুক্তির প্রধান পথ শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, 'নারীর মূল্য' গ্রন্থে এই দুটির একটিও উল্লিখিত হয়নি।

॥ ছয় ॥

১৩৩৮-এ প্রকাশিত হয়েছে শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন'। এই গ্রন্থে কমল আশুবাবু সম্পর্কে বলেছে, "পৃথিবীর ক্রীতদাসদের স্বাধীনতা দিয়েছিল একদিন তাদের মনিবেরাই, তাদের হয়ে লড়াই করেছিল সেদিন মনিবের জাতেরাই, নইলে দাসের দল কোঁদল করে, যুক্তির জোরে নিজেদের মুক্তি অর্জন করেনি। বিশ্বে এমনিই হয়, শক্তির বন্ধন থেকে শক্তিমানেরাই দুর্বলকে ত্রাণ করে। তেমনি 'নারীর মুক্তি আজও শুধু পুরুষেরাই দিতে পারে। দায়িত্ব তাদেরই'।"

১৩৩৮-এও প্রগতিশীলা নামে পরিচিত কমল চিন্তা করছে নারীর মুক্তি আজও শুধু পুরুষেরা দিতে পারে। অথচ তখন পৃথিবীর সমাজে নারী নিজেই এগিয়ে এসেছে নিজের মুক্তির জন্য। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'চতুরঙ্গ', 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা' তখন প্রকাশিত হয়েছে।

নারীমুক্তি সম্পর্কে তাঁর ধারণা এত অস্পষ্ট, এত পশ্চাদ্‌বর্তী ছিল বলেই শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে কোথাও যথার্থভাবে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে নারীর মুক্তির কথা ভাবতে পারেননি। অভয়া, কিরণময়ী প্রভৃতির বিদ্রোহ সমাজের মূলীভিত্তিতে আঘাত করেনি। কমল, অভয়া, কিরণময়ী—এরা সকলে বাংলাদেশের বাইরে থেকে সমাজদ্রোহিতার কথা বলেছে।

সবচেয়ে বড় অভিযোগ উঠতে পারে কিরণময়ী চরিত্রটি সম্পর্কে। দিবাকরকে কিরণময়ী বলেছে, "সমাজ উন্মত্ত হয়ে যখন তার সত্যিকার সীমাটি লঙ্ঘন করে, তখন তাকে আঘাত করাই উচিত। এ আঘাতে সমাজ মরে না—তার চৈতন্য হয়, মোহ ছুটে যায়।"

সমাজকে আঘাত করতে গিয়ে আহত হয়েছে নিজে, পাঠকের করুণা

কুড়িয়েছে। রাতের অন্ধকারে অনুজতুল্য, নিরপরাধ, অনভিজ্ঞ দিবাকরকে নিয়ে সুদূর আরাকানে পালিয়ে যাওয়া, সেখানে নোংরা পল্লীতে লোকনিন্দিত জীবন যাপন করা, অবশেষে মস্তিষ্কবিকৃতি—এই কি যথার্থ বিদ্রোহের পরিণাম? কিরণময়ীর মধ্যে নতুন করে বাঁচার, স্বাধীনভাবে বাঁচার সম্ভাবনা ছিল। তার জীবনে উপেন্দ্র এসেছিল সুস্থভাবে বাঁচার সম্ভাবনা নিয়ে। কিরণময়ীর মধ্যে ছিল তীক্ষ্ন বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, মানসিক শক্তি, অধ্যয়নস্পৃহা। দর্শন-বিজ্ঞান-পুরাণ-সাহিত্য সম্পর্কে তার বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধিৎসা আমাদের বিস্মিত করে। এতগুলি সম্ভাবনার কোনটিই কিরণময়ীকে সুস্থভাবে বাঁচার পথ দেখাতে পারেনি। তাকে ঠেলে দিয়েছে বিকৃতির পথে। কিরণময়ী সম্পর্কে লেখকের এই অবিচার আমাদের পীড়িত করে। যে ধর্মকে লেখক নারীজীবনের সর্ব-প্রকার অনিষ্টের মূল কারণ রূপে উল্লেখ করেছেন 'নারীর মূল্য' গ্রন্থে, সেই ধর্মবিশ্বাসহীনতাই কি কিরণময়ীর বিভ্রান্তির কারণ? 'ঈশ্বর আছে কি না' উন্মাদ অবস্থায় তাকে এই দুরূহ প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে দেখা যাবে কেন?

'শেষ প্রশ্নে'র কমল সমগ্র শরৎসাহিত্যে একমাত্র ব্যতিক্রম। কিন্তু কমলের জন্ম বাংলাদেশের বাইরে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন পরিবেশে। চা-বাগানের এক বড় সাহেবের সঙ্গে এক হিন্দুনারীর অসামাজিক মিলনের ফলে কমলের জন্ম। এই ইউরোপীয়ান জন্মদাতার কাছে কমলের পুঁথিগত এবং মানসিক শিক্ষা। স্বাধীনতার মন্ত্র কমল তার কাছ থেকেই পেয়েছে। কমল জন্মস্বাধীন। কমল সম্পর্কে নীলিমা যে কথা বলেছিল তা যথার্থ, "ও যেন ঠিক নদীর মাছ। জলে ভেজে না, ভেজার প্রশ্নই ওঠে না। খাওয়া-পরার চিন্তা নেই, শাসন করার অভিভাবক নেই, চোখ রাঙাবার সমাজ নেই—একেবারে স্বাধীন।"

চিন্তায় এবং বিশ্বাসে কমল স্বনির্ভর। নিজে যা সত্য বলে বোঝে তাকেই সে গ্রহণ করে। প্রচলিত ধারণা, সংস্কার ও বিশ্বাস থেকে তার সত্যবোধ জন্ম নেয়নি। কমল বলেছে, "নারীজীবনের সত্যাসত্য নির্দেশের ভার নারীর 'পরেই থাকে।" বিবাহের স্থায়ী বন্ধনে তার আস্থা নেই। কোনপ্রকার আনুষ্ঠানিক বিবাহরীতিতে তার বিশ্বাস নেই। কমলের ক্রীশ্চান স্বামী মারা যাবার পর সে শৈবমতে শিবনাথকে বিবাহ করে। শিবনাথ তাকে পরিত্যাগ করলে কমল কোন অভিযোগ জানায়নি। অজিত তাকে বিবাহ করতে চাইলে কমল কোন-প্রকার অনুষ্ঠানের বন্ধনে আবদ্ধ হতে অস্বীকার করে।

অতীত অপেক্ষা বর্তমানের উপর সে গুরুত্ব দিয়েছে বেশি। যা কিছু গতিশীল তাকেই প্রাণশক্তির লক্ষণ বলে সে মনে করে। পত্নীর মৃত্যুর পর আশুবাবুর ব্রহ্মচর্য পালনকে সে প্রশংসা করে না. বৈধব্যের নামে আত্মনিগ্রহকে সে ধিক্কার দিয়েছে। হরেন্দ্রের আশ্রমে তরুণ ব্রহ্মচারীদের কৃচ্ছ্রসাধনকে সে প্রশংসা করেনি। সত্যের কোন শাশ্বত সংজ্ঞায় তার বিশ্বাস নেই। আনন্দ

ক্ষণিকের হলেও তার মূল্য দিতে সে প্রস্তুত। অন্ধ জাতীয়তাবাদে অথবা ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শে তার কোন শ্রদ্ধা নেই। কমল বলেছে, "ভারতবর্ষের আদর্শ যে চিরকালের আদর্শ এই বা কে স্থির করে দিল বলুন?" অর্থাৎ প্রচলিত ধারণা, সংস্কার, অসংগতি ও বিশ্বাস এবং নীতির মূলে যেখানেই কোন অযৌক্তিকতা এবং মিথ্যাচারকে সে দেখেছে, সেখানেই আঘাত করেছে কমল।

এ হেন কমল যার স্বাধীনতাস্পৃহা এত প্রবল যে কুলি-মজুরের জামা সেলাই করে গ্রাসাচ্ছাদন করে সে শেষপর্যন্ত ধনবান অজিতের জীবনসঙ্গিনী হয়ে থাকার বিলাসিতাকে গ্রহণ করলো। এই কমল তার প্রথম বিবাহের ক্রীশ্চান স্বামীর মৃত্যুর পর দীর্ঘদিন একাহারী ও নিরামিষাশী থেকে হিন্দু ঘরের বিধবা মহিলাদের মতো জীবনযাপন করে গেছে। এই কমলের সঙ্গে বিপ্লবী রাজেনের মানসিক মিল ও আত্মিক যোগ আমরা খুঁজে পাই। অথচ নারী-জীবনের স্বতঃসিদ্ধ পরিণামে শেষপর্যন্ত কমলের মতো মেয়ের জীবন মিলিয়ে দিয়ে শরৎচন্দ্র নারীপ্রগতির ধারণাকে ক্ষুণ্ণ করেছেন।

'পথের দাবী'র ভারতী ও সুমিত্রা শিক্ষিত ও স্বাধীন মেয়ের দৃষ্টান্ত। কিন্তু সেখানেও বাস্তবতার মাত্রা কতখানি অক্ষুণ্ণ আছে সে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু এরাও বাংলাদেশের বাইরের সমাজের মেয়ে। ভারতী বাঙালী ক্রিশ্চান, স্বাধীন ও স্বনির্ভর। অথচ অপূর্বর সংগে ভারতীর আচরণ যেকোন নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণকন্যার মতো। এই ভারতীই মর্মাহত হয়েছে শুনে যে নবতারা তার স্বামীর মৃত্যুর পনের দিনের মধ্যে শশীপদকে বিবাহ করতে প্রস্তুত হয়েছে। এই নবতারাকে কেন্দ্র করে মনোহর-সুমিত্রা-অপূর্বর সুদীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। নবতারার কোন সম্মানিত জীবন ছিল না স্বামী-গৃহে। সুমিত্রা বলেছে, "নবতারার স্বামিগৃহে তার বিবাহিত জীবনকে আমি গৌরবের জীবন বলতে পারিনে।" যে স্বামীকে নবতারা ভালবাসতে পারেনি, তাকে ত্যাগ করে দেশের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা অনেক বেশি বড় ধর্ম—এ কথা সুমিত্রা তথা শরৎচন্দ্র মনে করে থাকেন। এই প্রসঙ্গে সুমিত্রা ও কমলের উক্তি অনেকটা এক মনে হয়, "যে সমাজে কেবলমাত্র পুত্রার্থেই ভার্যা গ্রহণের বিধি আছে, নারী হয়ে তাকে তো আমি শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারিনে। আপনি সতীত্বের চরম উৎকর্ষের বড়াই করছিলেন, কিন্তু এই যে-দেশে বিবাহের ব্যবস্থা, সে-দেশে ও বস্তু বড় হয় না, ছোটই হয়। সতীত্ব তো শুধু দেহেই পর্যবসিত নয়, অপূর্ববাবু, মনেও তো দরকার।"

বিপ্লবীদলের নেত্রীর মুখে এটি যোগ্য উক্তি। 'যোগাযোগে'র কুমুদিনীও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সতীত্বের ধারণাকে মেনে নিতে পারেনি। মধুসূদনের সঙ্গে তার দৈহিক মিলনকে তার অশুচি বলে মনে হয়েছে।

অথচ যে নবতারাকে কেন্দ্র করে এই সব স্বপ্নস্পর্শ, প্রগতিমূলক আলোচনা সেই নবতারা কথি শশীকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, তার কাছ থেকে অর্থ আত্মসাৎ করে সুদর্শন এক তরুণকে নিয়ে উধাও হয়। তখন বিপ্লবী মেয়েদের এই অন্তঃসারশূন্য চরিত্রের কলঙ্ক সমস্ত আলোচনাটাকে মসীলিপ্ত করে তোলে, নবতারার স্বামিত্যাগের মহৎ দৃষ্টান্ত, স্বাধীন জীবনের ক্ষেত্রে তার দুঃসাহসিক পদক্ষেপকে এক অস্থিরচিত্তা নারীর স্বেচ্ছাচারে পরিণত করার দায়িত্বজ্ঞানহীনতা আমাদের কাছে ক্ষমার অযোগ্য হয়ে ওঠে।

কমল যা হতে পারতো সুমিত্রা যেন তারই প্রত্যাশিত পরিণতি। কমলের মতো সুমিত্রা জন্মসূত্রে পুরোপুরি বাঙালিনী নয়। ইহুদী মাতা ও বাঙালী ব্রাহ্মণ পিতার সন্তান সুমিত্রা মিশনারি বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ করেছে। জীবনের একুশ বছর তার অতিক্রান্ত হয়েছে সমাজ-অপরাধীদের বৃত্তে, কোকেন, আফিমের চোরাচালানে। কিন্তু বিপ্লবী সব্যসাচীর সংস্পর্শে আসা মাত্রই, সুমিত্রার জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটে। পরবর্তীকালে সুমিত্রার যে পরিচয় পাই. সেখানে সুমিত্রা বিদুষীশ্রেষ্ঠা. সমস্ত পৃথিবী ঘুরে আসার অভিজ্ঞতা তার আছে, বিভিন্ন ভাষায় সে পারদর্শিনী, 'পথের দাবী'র প্রেসিডেন্ট. বিপ্লবী সব্যসাচীর অশেষ আস্থাভাজন। কিন্তু কেমন করে সুমিত্রাকে জীবনের পঙ্ক থেকে উদ্ধার করে, বৃহত্তর কর্মের উপযুক্ত করে তোলা হল, তার কোন ইতিহাস এই গ্রন্থে নেই, যেমন নেই তার যথার্থ কাজের কোন পরিচয়। সব্যসাচীর বিপ্লবী পরিকল্পনার সুযোগ্য সহকর্মী এই সুমিত্রা এই গ্রন্থে সর্বক্ষণ প্রবল অভিমান এবং অনুচ্চারিত ভালোবাসার আবেগের দ্বারা সব্যসাচীর কাজে আপাত বাধা সৃষ্টি করেছে। অভিমানিনী বধূর মতো আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে সে বারংবার সব্যসাচীকে দুঃসাহসিক অভিযানের পথে বাধা দিতে চেয়েছে। ভারতীর প্রতি তার ঈর্ষা ও বিদ্বেষ তাকে সাধারণ নারীর পরিচয়ে নামিয়ে এনেছে। 'চার অধ্যায়ে' এলা-অতীনের প্রেমের কাণ্ডকারখানা সন্ত্রাসবাদের শ্বাসরুদ্ধ পরিবেশে অসত্য হয়ে উঠেছে. তবে সে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না বলে, নরনারীর আদিম আকর্ষণকে বড় করে দেখিয়েছেন। কিন্তু বিপ্লববাদের মন্ত্র-উদ্গাতা শরৎচন্দ্র এক বিপ্লবী নারীকে অভিমানিনী নারীর পর্যায়ে নামিয়ে চরিত্রের ভারসাম্য বিনষ্ট করেছেন। এক্ষেত্রে আমরা গোর্কীর 'মাদার' উপন্যাসে বিপ্লবী মেয়েদের স্মরণ করতে পারি। প্রেমচেতনা ও বিপ্লবচেতনা যেখানে ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। বিপ্লব ও প্রেম এখানে পরস্পরের প্রতিবন্ধক নয়। পাভেলের প্রণয়িনীর মধ্যে নারীর প্রেম ও কমনীয়তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে বিপ্লবী মেয়ের দুঃসাহসিকতা. সংগঠন-ক্ষমতা. পঠনশীলতা এবং কষ্টসহিষ্ণুতা। এমন বিপ্লবী মেয়ের কল্পনা রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের থাকা সম্ভবপর নয়। বিপ্লবী মেয়ে এলা নারীর আদিম

শক্তি দিয়ে অজগরের মতো গ্রাস করেছে ধনীর দুলাল রোমান্টিক অতীনকে। এতবড় সর্বনাশ ও হঠকারিতা কোন বিপ্লবী মেয়ের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

এইভাবে আর একটি সম্ভাবনাপূর্ণ নারীচরিত্রের অপমৃত্যু ঘটিয়েছেন শরৎচন্দ্র 'দেনা-পাওনার' ষোড়শী চরিত্রের মধ্যে। ষোড়শী একটি বলিষ্ঠ, নির্ভীক, তেজস্বী ও স্বাধীন চরিত্র। কিন্তু ধর্মদ্রোহী শরৎচন্দ্র এমন একটি চরিত্রকে বেঁধেছেন গ্রামীণ ধর্মতন্ত্রের বনিয়াদে। ষোড়শীর প্রধান পরিচয় সে দেবী চণ্ডীর ভৈরবী। গ্রাম্য ভৈরবীরা সাধারণতঃ অত্যন্ত ধর্মান্ধ হয়। কিন্তু ষোড়শীচরিত্রে গ্রামীণ সংকীর্ণতা লেখক দেখাননি। বরং ষোড়শী বিদুষী, শিক্ষিতা, ধর্মশাস্ত্রে পারদর্শিনী ; তার শাস্ত্রজ্ঞান শিরোমণিমশায়কেও লজ্জা দেয়। সে সর্বসংস্কারমুক্ত। মুসলমান ফকির সাহেব তার জীবনে আলো এনে দিয়েছে। পরপুরুষ সম্পর্কে তার মনে সাধারণ নারীসুলভ কোন সংস্কার নেই। অপরিচিত পুরুষ নির্মলকে সে অতি অনায়াসে হাত ধরে ঝড়ের রাতে পার করে দেয়। বিলাতফেরত ব্যারিস্টার নির্মলের কাছে সে পরম বিস্ময়ের বস্তু। জীবনের দুঃখ তাকে কঠিন ধাতুতে পরিণত করেছে। ইস্পাতের ধার এনেছে চরিত্রে। যখন গ্রামের সমাজ তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে ষোড়শী তখনও একাকী, অনমনীয়, অবিচলিত। রায়মশাই অথবা জমিদারের গোমস্তা এককড়ির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো মানসিক বলিষ্ঠতা ও সাহস তার আছে। সাগর সর্দার ও তার খুড়োকে পুলিসের হাত থেকে রক্ষা করে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা সেই করে দিয়েছিল। জমিদারের বিরুদ্ধে ভূমিজ প্রজাদের সে সংঘবদ্ধ করেছে, জমির জন্য লড়াই করার নির্দেশ দিয়েছে। এহেন ষোড়শীর শৈশব-জীবন অতিবাহিত হয়েছে অন্ধকারে। তার মায়ের জীবনের ইতিহাস কলঙ্কিত। পিতা তারাদাস চিরকাল দুরাচার করে এসেছে মেয়ের বিরুদ্ধে। কমল-সুমিত্রার মতোই আমাদের মনে প্রশ্ন ওঠে ষোড়শী সম্পর্কে যে, জীবনের অন্ধকার পরিবেশ থেকে এদের মানসিক চেতনা উদ্দীপিত হলো কীভাবে। যে বিবাহ তার প্রহসনমাত্র সেই বিবাহের স্বামীকে সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে একবার মাত্র স্পর্শ করে তার দীর্ঘদিনের সংগ্রামী জীবনের পরিবর্তন ঘটলো কী ভাবে ? অথচ এই জীবানন্দ চৌধুরী অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ, মদ্যপ, চরিত্রহীন। দুবার চৌর্যবৃত্তির দায়ে সে অভিযুক্ত। প্রজাপীড়নে সে নিষ্ঠুর। নারীর চরম অপমানেও সে দ্বিধাহীন। ষোড়শীকে দুবার সে জীবনের চরম দুর্গতির পথে ঠেলে দিয়েছে। অথচ এমন স্বামী-রত্নই ষোড়শীর দীর্ঘ জীবনকে আমূল পরিবর্তিত করে দিলো। রবীন্দ্রনাথের কুমুদিনীর বিপরীত। অথচ আশ্চর্য, 'দেনাপাওনা' ও 'যোগাযোগ' দুটি উপন্যাসই রচিত হয়েছে একই বছরে—১৯২৩ সালে। এমনকি, বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী'তে ব্রজেশ্বর ও প্রফুল্লের মধ্যে সম্পর্কের সত্যতা ছিল। ব্রজেশ্বর যতই দুর্বল হোক, সে সৎ ও প্রেমিক।

প্রফুল্লকে সে যথার্থ ভালোবাসতো। প্রফুল্লর জীবনে এক রাত্রির মধুর মিলনের স্মৃতিসম্পদ সঞ্চিত ছিল। এই অন্ধ স্বামী-সংস্কার শরৎচন্দ্রের প্রায় প্রত্যেকটি নারী-চরিত্রের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। এর মূল বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী, রমা, ষোড়শী, অন্নদাদিদি, মৃণাল, হেম প্রভৃতি চরিত্র এর দৃষ্টান্ত। সাবিত্রী ও রাজলক্ষ্মীর মধ্যে দৈহিক অশুচিতাবোধ এত তীব্র যে তাদের ভালোবাসা অপরাধচেতনার জটিলতায় দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। রাজলক্ষ্মীকে একসময় ধর্মের কাছে আত্মসমর্পণও করতে হয়েছে। ঘৃণ্য অপরাধে অভিযুক্ত স্বামীর জন্য অন্নদাদিদির গৃহত্যাগ এবং দুঃখবরণের কোন যুক্তিসংগত কারণ আমাদের চোখে পড়ে না। এই অপরাধচেতনার দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গেল কিরণময়ী। এমনকি, দুলে-বাগ্দী ঘরের মেয়ে অভাগী হিন্দু সধবা রমণীদের মতো সতীত্বের গৌরবের জন্য লালায়িত হয়ে ওঠে। একমাত্র ব্যতিক্রম 'দেবদাসে'র পার্বতী। বিবাহজনিত সংস্কার অথবা সমাজের ভয় দেবদাসের প্রতি তার ভালোবাসাকে আড়াল করতে পারেনি। এই দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী'র লবঙ্গলতার তুলনায় পার্বতী অনেক বেশি সত্য, স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ।

কুষ্ঠাশ্রমের দাসীবৃত্তি গ্রহণ করে ষোড়শী গ্রাম ত্যাগ করে চলে যায়। জমিদারের বিরুদ্ধে গ্রামের ভূমিজ প্রজাদের সংঘবদ্ধ করার কাজে ষোড়শীর জীবনে এক ভূমিকা তৈরী হতে পারতো। শরৎচন্দ্র সেই সুযোগ গ্রহণ করেননি।

ষোড়শীর মতো 'পল্লীসমাজে'র রমাও অসুস্থ অবস্থায় গ্রাম ত্যাগ করেছে কাশীবাসের সংকল্প নিয়ে। সেকালের বাংলা সাহিত্যে বিধবা মেয়েদের সেই ছিল মোক্ষধাম। রমা তেজস্বী, বুদ্ধিমতী, স্পষ্টবাদিনী। অসূর্যম্পশ্যা কন্যা নয়। প্রয়োজন হলে সে পুরুষের মতো কর্মদক্ষতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারে। জমিদারি পরিচালনার ক্ষমতায় সে পুরুষের সমকক্ষ। অথচ সেই যদু মুখুজ্জের কন্যাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে রমেশের শত্রুর ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছে। অবশেষে গ্রাম ত্যাগ করে তার মানসিক যন্ত্রণার অবসান ঘটেছে। রমেশের গ্রামোন্নয়নের কাজ রমার সহযোগিতায় সার্থক হতে পারতো। সমাজোন্নতির কাজে উভয়ের সহযোগিতার মধ্য দিয়ে রমা-রমেশের জীবনে তথা বাংলা উপন্যাসে এক নতুন মাত্রা সংযোজিত হতে পারতো। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে ফকির সাহেবকে বাদ দিলে এমন কোন পুরুষচরিত্র চোখে পড়ে না যারা নারীমুক্তির সহায়ক। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে যেমন আছে বিহারী, জ্যাঠামশাই, সতীশ, শ্রীবিলাস, পরেশবাবু, বিনয়, নিখিলেশ, বিপ্রদাস। শরৎচন্দ্রের পুরুষ-চরিত্র এতই দুর্বল যে তারা সকলেই পুরাতন ঘুণধরা সমাজের ক্রীড়নক। শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর পার্শ্বচর, তার অর্থে

শ্রীকান্তের জীবিকা নির্ভর, কঠিন অসুখ থেকে তাকে বাঁচায় রাজলক্ষ্মী, অথচ 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের চারটি খণ্ড জুড়ে শ্রীকান্তের মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংকোচের টানাপোড়েন দেখিয়েছেন লেখক। এমনকি রমেশের মতো শিক্ষিত, উদার, সংস্কারমুক্ত যুবকেরও রমার প্রতি আকণ্ঠ অভিমান। রমার জীবনের দ্বন্দ্ব ও বেদনার মূল কারণ বুঝতে সে অসমর্থ। দেবদাস পার্বতীর অসংকোচ আত্ম-নিবেদনের কাছে কুণ্ঠিত, দ্বিধাগ্রস্ত, অবশেষে সারা জীবন ধরে সে কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করে সে আত্মহননের মধ্য দিয়ে। 'গৃহদাহে'র মহিম রবীন্দ্রনাথের নিখিলেশের মতো নীরব ভালোবাসা, বেদনা, ধৈর্য ও ক্ষমা দিয়ে অচলাকে স্বস্থানে ফিরে আসতে সাহায্য করেনি। সতীশের বালকসুলভ আচরণ সাবিত্রীর জীবনে দুঃখকে দ্বিগুণিত করেছে।

অর্থাৎ নারীজীবনের বেদনার দিকটা যত ভেবেছেন শরৎচন্দ্র, তার মুক্তির দিকটি সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ততটা সক্রিয় ছিল না। শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ব্যতীত নারীমুক্তি যে সম্ভবপর নয়, সে ধারণা তাঁর লেখায় খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়নি। বরং শিক্ষিত আধুনিক মেয়েদের সম্পর্কে তাঁর মনে দ্বিধা ও বিরূপতা ছিল। বন্দনা এবং সরোজিনীকে তিনি রীতিমত হিন্দুয়ানার পরীক্ষায় পাশ করিয়ে নিয়েছেন। অচলা ও বিজয়া—এই দুই শিক্ষিতা ব্রাহ্মকন্যা নিজেদের জীবনসঙ্গী নির্বাচনে কোথাও বলিষ্ঠতার পরিচয় দেয়নি। বিজয়া দয়াল ও নলিনীর কৌশলে শেষপর্যন্ত নরেনের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। অচলার দ্বন্দ্ব তার জীবনে চূড়ান্ত ট্র্যাজেডি এনেছে। রবীন্দ্রনাথের বিমলা শেষপর্যন্ত জীবনের সত্যকে চিনে নিতে পেরেছিল।

নারীমুক্তির প্রবক্তারূপে নয়, নারীজীবনের বেদনার রূপকার হিসাবে শরৎচন্দ্র আমাদের অভিনন্দনযোগ্য। বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজে ব্রাহ্মণ্য-শাসনের প্রভাবে, জমিদার-পুরোহিতের জোটবন্ধ ষড়যন্ত্রে, নারীজীবনের চূড়ান্ত বেদনা তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর ছোট-গল্পে ও উপন্যাসে দুলে-বাগ্দী পরিবারের মেয়ে অভাগী থেকে উচ্চবর্ণ সমাজের মেয়ে রমা পর্যন্ত সকলে সমান দরদের সঙ্গে সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। এই ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজের হাতে নিপীড়িত হয়েছে রাজলক্ষ্মী, অন্নদাদিদি, রমা, সাবিত্রী, পার্বতী, হেম, ষোড়শী, অভয়া ও কমললতা। গ্রামীণ সমাজের হাতে অরক্ষণীয়া কন্যার ঘটে চরম অপমান, কৌলীন্যপ্রথার অভিশাপ নেমে আসে বামুনের মেয়ে সন্ধ্যার জীবনে, বিহারের দূর গ্রামে গৌরী তেওয়ারীর দুই কন্যার জীবনে মৃত্যু অবধারিত হয়, সাবিত্রীকে হতে হয় মেসের দাসী, রাজলক্ষ্মীকে পিয়ারী বাইজী। অভাগীর স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয় ব্রাহ্মণ সমাজপতির হাতে। পচনধরা এই সামন্ততান্ত্রিক সমাজের দুষ্ট ক্ষত প্রকাশ করে শরৎচন্দ্র ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

# শরৎচন্দ্রের সাবিত্রী ও কিরণময়ী

ডঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী

প্রথমেই মনে পড়ে 'চরিত্রহীনে'র সাবিত্রীর কথা। 'চরিত্রহীন' পুস্তকখানির নামকরণ মধুর। আপাতদৃষ্টিতে চরিত্রহীনের অধিকাংশ চরিত্রই ভ্রষ্ট। সতীশ, সাবিত্রী, কিরণময়ী, দিবাকর প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেকেই চরিত্রহীন; অথচ তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে এমন একটা দিক আছে যাহাতে তাহারা প্রত্যেকেই তথাকথিত চরিত্রবান অপেক্ষা অধিকতর চরিত্রবান। সাবিত্রী নামটিও মধুর। 'সাবিত্রী' নাম কি শ্লেষবোধে শরৎবাবু মনোনীত করিয়াছেন! যাক, পটলডাঙার মেসের যবনিকা উত্তোলনমাত্রই পাঠকের সংগে পরিচয় হইল সাবিত্রীর। সাবিত্রী মেসের সর্বময়ী। স্নেহযত্নে সবাইকে আপন করিয়া লইয়াছে। সতীশও তাহার আপন হইল। অন্তর্দৃষ্টির প্রভাবে একদিনেই সাবিত্রী সতীশকে আপন করিয়া লইল। স্নেহের নিকট শরৎবাবু চিরকালই দুর্বল। এইজন্যই শরৎবাবু নারীচরিত্রে স্নেহের দিকটাই সবিশেষ চিত্রিত করিয়াছেন। সাবিত্রীর নিবাস তাহার পাতানো মাসী মোক্ষদার গৃহ। মোক্ষদা বিধু ইত্যাদি ভদ্রনারী নহে। দুখানা নোট আঁচলে বাঁধিয়া দিলে তাহারা গেলাস ছোঁয়। তাহাদের গৃহে সময় অসময়ে মুড়ি কড়াই ভাজা, হাঁসের ডিমের খোসা, কাঁকড়াচিবানো, চিংড়িমাছের খোলা ছড়াছড়ি যায়। অথচ সেই মোক্ষদা মাসীর গৃহে বাস করিয়া সাবিত্রী মেসে দাসীবৃত্তি করে, নিরামিষ আহার করে, একাদশী পালন করে, বিপিনের অর্থ ও বিলাসপ্রস্তাবকে ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করে। মোক্ষদা মাসীর কথায় ভবিষ্যতের জন্য কোন বন্দোবস্ত করে না। সুতরাং সাবিত্রীকে সাধারণ পতিতার পর্যায়ে ফেলিতে কুণ্ঠা বোধ হয়। অথচ যে হিন্দু মহিলা পরপুরুষ ভুবনমোহনের সঙ্গে গৃহত্যাগ করিয়া সমাজের বাহিরে অভদ্র আবেষ্টনীর মধ্যে বাস করিতেছে তাহাকে পতিতা ভিন্ন অন্য কি বিশেষণ দেওয়া যাইতে পারে? সতীশ কতবার কতভাবে সাবিত্রীকে নিকটে টানিয়াছে, কিন্তু সাবিত্রী চিরকাল তাহাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে। সতীশ একদিন তাহাকে স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে নাই। সতীশ জ্যোতিবাবুকে সগর্বে বলিয়াছিল, "সাবিত্রী যদি নিজের ইচ্ছায় আমাকে ছেড়ে না যেত আমি যতদিন বাঁচতুম তাকে মাথায় করে রাখতুম।" সরোজিনীর ব্যাপারে সাবিত্রীর উদারতা ছিল যথেষ্ট। সাবিত্রী সতীশকে অতিমাত্রায় ভালবাসিয়াছিল; অথচ সে বিশেষভাবে জানিত যে যথার্থ প্রেম, প্রিয়তমাকে শুধু নিকটেই টানে না, দূরেও সরাইয়া দেয়; সাবিত্রীর ভোগলিপ্সা নাই, অর্থপিপাসা নাই।

সামাজিক দাবি নাই, অপরকে বিলাইয়া দিয়া তাহার আনন্দ। সাবিত্রী সতীশকে ত্যাগ করিয়া যেভাবে তেতলায় দাসীবৃত্তি দ্বারা জীবনযাপন করিয়াছে, ত্রিশ টাকার জন্য সতীশের নিকট আসিয়া প্রার্থনা জানাইয়াছে তাহা সাবিত্রীর একনিষ্ঠ মনের পরিচায়ক। পথভুলে কিংবা আত্মীয় ভুবনমোহনের প্ররোচনায় যদি সে গৃহত্যাগ না করিত, তবে কি সে হিন্দুঘরের আদর্শ মহিলা হইত না। মনোবিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, রাজলক্ষ্মীর মতো সাবিত্রী কখনো দেহকে পণ্য সাজাইয়া অর্থোপার্জনের চেষ্টা করে নাই। রাজলক্ষ্মীর মতো সাবিত্রীর দানধ্যান নাই, সাবিত্রীর অভাববোধ অতি অল্প—দেহের দিক দিয়াই হউক, অথবা মনের দিক দিয়াই হউক। সাবিত্রী তাহার সর্বস্ব নিবেদনের ভিতর দিয়া সতীশকে সমর্পণ করিয়াছিল।

সতীশের সঙ্গে সরোজিনীর বিবাহ দিয়া সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিল। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে বিবাহ দেওয়ার কথা বলিলেও শেষপর্যন্ত বিবাহ দিয়া উঠিতে পারে নাই। রাজলক্ষ্মীর নিকট শ্রীকান্ত চিরকাল পার্শ্বচর ব্যক্তিরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। রাজলক্ষ্মীর ইচ্ছাই প্রায়শঃ জয়ী হইয়াছে। শ্রীকান্ত একান্তভাবে 'লেডিজ ম্যান'; রাজলক্ষ্মী, অভয়া, কমললতা পর পর শ্রীকান্তকে আকর্ষণ করিয়াছে। অন্যদিকে সতীশ বলিষ্ঠ, সবল পুরুষ। সাবিত্রী পুরুষরূপেই সতীশকে দেখিয়াছে, আশ্রয়স্থল মনে করিয়াছে। অন্যদিকে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

কিরণময়ী ও হারাণবাবুর বিবাহিত জীবন অতীব করুণ। স্বামীর ভালোবাসা সে কখনো পায় নাই। বাড়ির মধ্যে স্বামী, কিরণময়ী আর শাশুড়ী। একজন দার্শনিক—তিনি স্ত্রীকে প্রাণপণে পড়াইয়া খুশী। আর-একজন ঘোর স্বার্থপর, পুত্রবধূকে খাটাইয়াই সুখী। দুইটি বিরুদ্ধ প্রকৃতির পুরুষ-নারীর প্রেমহীন মিলনকে হিন্দুসমাজে বিধির নির্বন্ধ বলিয়া নতশিরে মানিয়া লওয়া হয়। কিন্তু কিরণময়ী তাহা মানিয়া লইল না। এখানেই কিরণময়ীর ট্র্যাজেডি আরম্ভ। হারাণবাবু স্ত্রীকে ভাবিলেন শিষ্যা, যেমন একদিন চন্দ্রশেখর ভাবিয়াছিল শৈবলিনীকে। কিরণময়ীর মনে অতৃপ্ত বাসনা ভালোবাসিবার এবং ভালোবাসা পাইবার—স্বামীকে সর্বদেহমন দিয়া পাইবার আকাঙ্ক্ষা। স্বামীর দৃষ্টি যখন দূরে দর্শনের জীর্ণপত্রে নিবদ্ধ, তখন হয়তো কিরণময়ী ভাবিতেছিল একটু স্নেহের কথা—একটুখানি প্রেমের বিলাস। রুগ্ন শয্যায় স্বামী মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিল, স্ত্রী তখন প্রতীক্ষা করিতেছিল অনঙ্গ ডাক্তারের। তৃষ্ণার্ত কিরণময়ী নর্দমার গাঢ় কালো জল অঞ্জলি ভরিয়া পান করিতে গেল। অনঙ্গ ডাক্তার সংসারের অর্ধেক খরচের ভার মাথায় লইয়াছিল—সে দারিদ্র্য অবশ্য স্বার্থান্ধ শাশুড়ী অঘোরময়ীর। কিন্তু প্রভাতের আলোকে যেমন নিশীথরাত্রির তারা মিলাইয়া যায়, তেমনি একদিন অকস্মাৎ অনঙ্গ

ডাক্তার গেল কিরণময়ীর চিত্ত হইতে মিলাইয়া উপেন্দ্রর আগমনে। কিরণময়ী আর নর্দমার কালো জলে তৃপ্ত রহিল না। উপেন্দ্র স্বচ্ছ সলিল; অবগাহন করিয়া কিরণময়ী স্নিগ্ধ হইল, উপেন্দ্রকে ভালোবাসিল। সে ভালোবাসা তীব্র, অতি তীব্র, বাধা মানে না, শাসন মানে না, সমাজ মানে না, সম্মান মানে না। সর্ববিষয়ে উপেন্দ্র ভালোবাসিবার পাত্র ছিল বটে। কিন্তু কিরণময়ীর পাত্র-নির্বাচনে ভুল হইল ঐখানে যে উপেন্দ্রের গৃহে ছিল তাহার একান্ত নির্ভর-শীলা স্বামিগতপ্রাণা বিশ্বাসিনী সুরবালা। উপেন্দ্র কিরণময়ীকে প্রশ্রয় দিল না। কিরণ একদিন সজ্ঞানে উপেন্দ্রের নিকট আত্মবিশ্লেষণ করিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। সহৃদয় উপেন্দ্র সদ্যোবিধবা অস্থিরা অধীরা কিরণময়ীকে দিবাকরের অভিভাবিকা নিযুক্ত করিয়া তাহার ভার গ্রহণ করিল। কিছুকাল পরে একদিন অঘোরময়ীর ব্যঙ্গোক্তিতে তিক্ত হইয়া কিরণময়ীর উপর ঘৃণায় তাহাকে মুখের উপর অপমান করিল, তাহার প্রদত্ত অন্ন প্রত্যাখ্যান করিল। দিবাকরকে কিরণময়ীর সংসর্গ ত্যাগ করিতে আদেশ করিল। তাহাকে 'ভাইপার' নাস্তিক অপবিত্র বলিয়া তিরস্কার করিল। কিরণময়ী ক্রোধে আত্মহারা হইল। শরৎবাবুর মতে, কিরণময়ী-দিবাকর নাটকের এ ঘটনা হইল প্রত্যক্ষ প্রচ্ছদপট। এইক্ষণ হইতে দিবাকরকে আবর্তন করিয়া চলিল কিরণময়ীর প্রতিশোধের প্রচেষ্টা। কিরণময়ীর সৌন্দর্য মেধা বুদ্ধি প্রেম অতি উগ্র। ভালো করিবার, মন্দ করিবার শক্তি তাহার মাত্রাহীন। যেদিন প্রতিশোধ লইবার আকাঙ্ক্ষা মনে জাগ্রত হইল সেদিন কিরণ পাত্রাপাত্র বিচার করে নাই, ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই। পর্বতগাত্র হইতে নিঃসৃত বহুকালস্তব্ধ নির্ঝরিণী-ধারার মতো অপরিমেয় বেগে সম্মুখে যাহা পাইয়াছে, তাহাই সবেগে ভাসাইয়া চলিয়াছে কিরণময়ীর প্রেম, অথবা প্রতিহিংসা অথবা জিগীষা। কিরণময়ী দিবাকরকে আকৃষ্ট করিল যেমন আকর্ষণ করে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অসন্দিগ্ধ প্রজাপতিকে।

শরৎবাবু প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে কিরণময়ী নিজেকে অপমান করিয়াও দিবাকরের ভিতর দিয়া উপেন্দ্রকে শাস্তি দিল। অবশ্য নিজেও তার জন্য কম শাস্তি গ্রহণ করে নাই। আরাকানে বাড়িওয়ালা তাহাকে 'বারবনিতা' আখ্যা দিল। 'বেবুশো' বলিয়া শ্লেষ করিল। জাহাজে দিবাকরের সঙ্গে অত্যন্ত অশোভন ব্যবহার ও অশ্লীল আলাপ সত্ত্বেও শরৎবাবুর কিরণময়ী আত্মসংযমী। শরৎবাবুর মতে, আপাতদৃষ্টিতে দেহসর্বস্ব হওয়া সত্ত্বেও কিরণময়ী দিবাকরের সঙ্গে একত্রবাস করিয়াও তাহার দেহ নষ্ট করে নাই।—নিজেকে দিবাকরের লুব্ধ দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। সুতরাং শরৎবাবু প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে কিরণময়ীর মনোধারার গতিনির্দেশ দেহজ নহে, তাহা মস্তিষ্কজ, বিকৃত মনের প্রতিকূল প্রক্রিয়া। কিরণময়ী

দিবাকরকে স্পষ্ট বলিয়াছিল, "অপরাধের ভারে যখন আমার মাথা নুয়ে পড়বে তখন তোমার উপেনদাদার ঘাড়েও উঁচু করে রাখবার মত মাথা কিছুতেই রাখবো না।" আরাকানে কিরণময়ীর ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া দিবাকর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তাহলে কি আমার সর্বনাশ করবার জন্যই এ বিপদ টেনে এনেছিলে, কোনদিন কি ভালোবাসোনি?" কিরণময়ী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "না, তোমার নয়, আর একজনের সর্বনাশ করছি ভেবেই তোমার ক্ষতি করছি।" কিরণময়ী পরিশেষে স্বীকার করিল যে তাহার আগাগোড়াই 'ভুল হয়ে গেছে।'

আমরাও বলতে পারি কিরণময়ীর চরিত্র-অঙ্কনে শরৎবাবুর 'আগা'তে ভুল না হইলেও 'গোড়া'তে ভুল হইয়াছে। কিরণময়ীর চরিত্রের মূল বস্তু কী? তাহাকে দেখিলাম, হারাণবাবুর পত্নী, অনঙ্গ ডাক্তারের অভিসারিকা, উপেন্দ্রের প্রেমিকা, দিবাকরের মোহিনী, পরিশেষে গঙ্গাতীরে পাগলিনী। 'চরিত্রহীনে'র প্রথমাংশে কিরণময়ী দেহসর্বস্ব, উদ্দাম, প্রমত্ত, চতুর যুবতী। হারাণবাবুকে বিবাহ করিয়াছে, অনঙ্গ ডাক্তারকে মজাইয়াছে, উপেন্দ্রকে ভালোবাসিয়াছে, দিবাকরকে ডুবাইয়াছে। কিরণময়ীর ভিতর আদর্শজ্ঞান ছিল, তাই একদিনে অনঙ্গ ডাক্তারকে জীবনচিত্র হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিয়া দিতে পারিয়াছিল। সতীশ ও উপেন্দ্র একই নিশীথে হারাণবাবুর রুগ্নশয্যার পার্শ্বে তাহার জীর্ণ ভগ্নগৃহে কিরণময়ীর দৃষ্টিপথে আসিয়াছিল। সতীশের সুন্দর রূপ, নিটোল স্বাস্থ্য এবং যুবজনোচিত বিলাসসজ্জা কিরণময়ীকে মুগ্ধ করে নাই। কারণ কয়েকদিন হইতে কিরণ শাশুড়ী ও স্বামীর নিকট উপেন্দ্রর পরোপচিকীর্ষার বিষয় শুনিয়া শুনিয়া উপেন্দ্রের বিষয়ে একটা উচ্চ ধারণা করিয়াছিল। বিশেষতঃ প্রথম পরিচয়ের রাত্রে সতীশের ব্যঙ্গোক্তিগুলি রুচিসম্মত ছিল না। সুতরাং উপেন্দ্রই কিরণময়ীকে বেশী আকৃষ্ট করিল। বোধহয় তখনও স্বামীর চিতা-ভস্মের উষ্ণতা ছিল, অথচ সদ্যোবিধবা কিরণময়ী উপেন্দ্রের নিকট নিঃসংকোচে প্রেমনিবেদন করিল। কয়েকদিন পরেই আবার দিবাকরকে দিতেছিল রতি-শাস্ত্রের পাঠ। এই দুইয়ের ভিতর সামঞ্জস্য কোথায়?

শরৎবাবু দিবাকর-কিরণময়ী নাটকের একটা প্রচ্ছদপট প্রস্তুত করিলেন। উপেন্দ্রের প্রত্যাখ্যান ও অপমান এবং কিরণময়ীর প্রতিহিংসাস্পৃহা। শরৎ-বাবুর মতে, কিরণময়ী মনস্তত্ত্বের কেন্দ্রমূল হইল উপেন্দ্র। শরৎবাবু প্রতি-শোধস্পৃহাকে কিরণময়ীর জীবনে বিশেষ স্থান দান করিয়া কিরণময়ীর কার্য-কলাপকে যুক্তিসঙ্গত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, কিরণময়ীর প্রতিশোধস্পৃহা জাগিল কোন্ দিক হইতে? ঘটনাব্যপদেশে দেখা যায় যে, শাশুড়ী অঘোরময়ী উপেন্দ্রের সঙ্গে গঙ্গাস্নান হইতে ফিরিয়া আসিয়া দরজায় করাঘাত করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে কিরণময়ী দিবাকরের নিকট বর্ণনা করিতেছিল—নারীর রূপ কাহাকে বলে? নারীত্ব কী? ভালোবাসা

কাহাকে বলে? মনোবিজ্ঞানবিদ হিন্দুনারী বয়ঃকনিষ্ঠ বিদ্যার্থী দেবরের নিকট কি নারীতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। অঘোরময়ী তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিল—'হলেই বা দেওর, বউমানুষের সোমত্ত বয়সের ছেলের কাছে' ইত্যাদি ইত্যাদি। অবশ্য এই ইঙ্গিত অনুচিত নয়। এই তিরস্কারের মধ্যে মাত্রাধিক্য ছিল। তখনও প্রতিশোধ মনস্তত্ত্বের কোন প্রশ্নই উঠে নাই। কিরণময়ী দিবাকরকে বুঝাইতেছিল—সন্তানধারণের যে-সমস্ত লক্ষণ সবচেয়ে উপযোগী, তাই নারীর রূপ, ইহার পশ্চাতে কি দিবাকরের মনে নারীদেহের প্রতি লোভ জন্মাইবার প্রচ্ছন্ন চেষ্টা ছিল না? আরও বহু অবান্তর কথা বলিয়া চিবুক স্পর্শ করিয়া কিরণময়ী দিবাকরকে কোন্ পথে টানিতেছিল? শরৎবাবু বলিতে চাহিয়াছেন যে, দিবাকরের প্রতি তাহার বাস্তবিক কোন আকর্ষণ ছিল না। প্রগল্ভা নারী কথায় কথায় শ্লীলতার মাত্রা অতিক্রম করিয়াছিল মাত্র। এই যুক্তিদ্বারা কিরণময়ীকে সমর্থন করার চেষ্টা এবং শিশুকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে হস্ত-স্থাপন করিয়া অগ্নির দাহিকাশক্তি পরীক্ষা করিতে উপদেশ প্রদান করা একই কথা। শরৎবাবুর মতে উপেন্দ্রের প্রতি হিংস্র প্রতিশোধ লইবার বাসনা-প্ররোচিত হইয়াই কিরণময়ী দিবাকরের প্রতি এই অশিষ্ট আচরণ করিয়াছে। কারণ উপেন্দ্র তাহার প্রদত্ত অন্নগ্রহণে নিষেধ করিয়াছিল। ক্রোধে আত্মহারা হইয়া কিরণময়ী বলিল, "বিধবার কাছে সেও যা তুমিও তা।" কী গ্লানিকর কথা! উপেন্দ্র বলিয়াছিল, "আপনাকে চিনি, কিন্তু কথাটা জেনে রাখুন যে ভালো আপনি কাউকে বাসতে পারবেন না। সে সাধ্য নেই আপনার, শুধু সর্বনাশ কর্তেই পারবেন।"

প্রতিশোধস্পৃহা এখান হইতে আরম্ভ হইতে পারে। ইহার পূর্বে তো কৃতজ্ঞতা। কৃতজ্ঞতার ঋণ কি দিবাকরের নিকট নারীরূপ বিশ্লেষণ করিয়া শোধ করিল? এই দিবাকরের সঙ্গে প্রেমচর্চার মূলে উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য-বিহীন কাব্যরসাস্বাদন? অথবা প্লেটোনিক ডিসকাসনস্? মোটের উপর কিরণময়ীর চরিত্রে পারম্পর্য রক্ষিত হয় নাই। শরৎচন্দ্র সমস্ত যুক্তি সত্ত্বেও কিরণময়ীর চরিত্র-অঙ্কনে সফলকাম হইয়াছেন কিনা সন্দেহ।

# উপন্যাসের কবিত্ব ও শরৎচন্দ্র

অজয়কুমার ঘোষ

সাধারণতঃ কবিত্বের ক্ষেত্র উপন্যাস নয়, কাব্যই। প্রাচীন ভারতীয় আলঙ্কারিক দৃষ্টিতে অবশ্য 'কাব্য' কথাটির মধ্যে ব্যাপকভাবে সর্বশ্রেণীর সাহিত্যশাখাই অঙ্গীভূত। এমন কি গদ্য 'কথা'-শাখাটিও বাদ যায়নি। কিন্তু প্রাচীন 'কথা'-সাহিত্য ও আধুনিক কথাসাহিত্য (অর্থাৎ উপন্যাস) এক বস্তু নয়। উপন্যাস সম্পূর্ণ আধুনিক কালের সৃষ্টি এবং বিশেষ সমাজপরিবেশ থেকে জাত। দুয়ের মধ্যে কালের দূরত্ব যেমন দুস্তর, ভাবের পার্থক্যও তেমনি বিস্তর। আর 'কাব্য' কথাটিও আজকাল কবিতা অর্থেই ব্যবহৃত।

আধুনিক কথাসাহিত্য বা উপন্যাসে কাব্যসৃষ্টির অবকাশ কতখানি সেইটিই বর্তমান ক্ষুদ্র নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

প্রচলিত বিশ্বাস যে কাব্য না লিখে কবি হয় না। কিন্তু বঙ্কিমের কবিত্ব তাঁর উপন্যাসেই, 'ললিতা ও মানস'-এ নয়। শেক্সপীয়রের কবিত্ব তাঁর কাল-জয়ী নাট্যসমূহেই, অধিকন্তু সনেটগুচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব কি তাঁর কাব্য-কবিতা ছাড়াও 'গল্পগুচ্ছ', 'নৌকাডুবি', 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'শেষের কবিতা' প্রমুখ গল্প-উপন্যাসে প্রকাশ পায়নি? হেমিংওয়ের 'দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সী' উপন্যাস হলেও কি একটি খণ্ডকাব্য নয়? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'-তে পদ্মাতীরবর্তী মানুষের দৈনন্দিন জীবনসংগ্রামের তীব্রতা ও কঠোর বাস্তব সমস্যা সত্ত্বেও কি একেবারেই কাব্যরস রহিত? বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস কি শুধুই অপু-জীবনের কাহিনী মাত্র? প্রকৃতি ও মানবজীবন সম্পর্কে লেখকের কবিদৃষ্টি কি এতে বিশেষ করে প্রকাশিত হয়নি? আর তাঁর 'আরণ্যক' উপন্যাস তো কাব্যগুণেই সমৃদ্ধ। তার ফলে কি এর উপন্যাস-ধর্ম ক্ষুন্ন হয়েছে, না, বর্ধিত হয়েছে? রোমাঁ রোলাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফ্' উপন্যাসে জন ক্রিস্তোফার চরিত্রের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে পদে পদেই তো লেখকের কবিদৃষ্টি উপন্যাসের মধ্যে অনির্বচনীয় লাবণ্যের সৃষ্টি করেছে! ডিকেন্সের 'ডেভিড কপারফিল্ড' উপন্যাসের বহু বর্ণনা-অংশেও কি কাব্যগুণের অসদ্ভাব? টলস্টয়ের 'ওঅর অ্যান্ড পীস' কি এক হিসাবে গদ্যে রচিত মহাকাব্য নয়? কিংবা টমাস ম্যানের 'ম্যাজিক মাউনটেন', নুট হামসনের 'গ্রোথ অব দি সয়েল', তারাশঙ্করের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' বা 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'?

আবার বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা' তো কাব্যগুণেই রম্য এবং সুখপাঠ্য। পাঠক হয়তো বলবেন যেহেতু সেটি রোমান্স, সেইহেতু কাব্যগুণান্বিত। কিন্তু

'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'চন্দ্রশেখর', 'দেবীচৌধুরাণী', 'আনন্দমঠ', 'রাজসিংহ'? সেখানেও কি কাব্য নেই? নগেন্দ্রের নৌকাভ্রমণকালে জলের ঘাটের বর্ণনা, সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ, রোহিণীর বারুণী পুকুরে আত্মহত্যাকালের বর্ণনা, প্রতাপ-শৈবলিনীর চন্দ্রালোকিত গঙ্গাবক্ষে সাঁতার, চন্দ্রালোকিত তিস্তা-নদীবক্ষে বজরার উপর দেবীরাণীর বর্ণনা, 'আনন্দমঠে' সত্যানন্দের দেশজননী ও মাতৃমূর্তির অভিন্নতা বর্ণনা ও 'রাজসিংহে' মোগল হারেমের 'নরকে নন্দন'-তুল্য বর্ণনাসৌন্দর্য—এগুলি কি কাব্যরসবিরহিত? আবার এরা কি উপন্যাসের অপরিহার্য অঙ্গও নয়?

আমার তো মনে হয়, মহৎ উপন্যাসমাত্রেই কবিত্ব একটি মস্তবড়ো গুণ। তা অপরিহার্য এবং অপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্য। সুন্দরী-রমণীদেহের লাবণ্যের মতো সহজাত, সচ্ছন্দ, সুন্দর। কাজেই উপন্যাসে কাব্যগুণ থাকা দোষের নয়। ঔপন্যাসিক কবি হলেই বা আপত্তি কি? (রবীন্দ্রনাথ ও গ্যেটে বড়ো কবি হয়েও কি বড়ো ঔপন্যাসিক নন?) তবে মাত্রারক্ষা করা চাই। আতিশয্যই দোষের। আতিশয্য সহজেই চোখে পড়ে। 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের অনন্যদুর্লভ কাব্যদীপ্তি আতিশয্য-দোষে দুষ্ট। তাই বড়ো বেশি চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। আমাদের বুদ্ধি ও চেতনাকে বড়ো বেশি আচ্ছন্ন করে ফেলে। মণীন্দ্রলাল বসুর 'রমলা' উপন্যাস এককালে অসাধারণ জনপ্রিয় হয়েছিল এর কাব্যধর্মিতার জোরেই। কিন্তু এখানেও আতিশয্য চোখে পড়ে। নইলে কাব্য-গুণ দোষের নয়। কোন দুর্বল ঔপন্যাসিকের লেখায় আমরা তো কাব্যগুণের নামগন্ধও খুঁজে পাই না। উদাহরণতঃ বঙ্কিম-অনুসারী সে-যুগের অনেক ব্যর্থ ঔপন্যাসিকের নাম করা যায়। স্থানাভাবে সে চেষ্টা থেকে বিরত হওয়া গেল।

শরৎচন্দ্রের লেখার মস্ত বড়ো গুণ পূর্বকথিত মাত্রারক্ষা। তাঁর লেখায় কাব্যগুণের অভাব নেই, আবার আতিশয্যও নেই।

রবীন্দ্রনাথ একস্থলে বলেছেন যা অনির্বচনীয়ের আস্বাদ দেয়, তা গদ্যই হোক আর পদ্যই হোক, কাব্য। আমরাও বলব, গদ্য হোক, পদ্য হোক, উপন্যাস হোক, নাটক হোক, যা মানবজীবন ও প্রকৃতির গূঢ়তম রহস্যলোকের দ্বারে আমাদের পৌঁছে দেয়, যা মানবজীবন ও প্রকৃতির মধ্যে সুনিবিড় একাত্মতা গড়ে তোলে, তা-ই কাব্য। সেদিক থেকে দেখতে গেলে শরৎচন্দ্র কবি। মানুষের জীবনের এমন অনেক ভাবঘন মুহূর্ত আসে, যা কেবল ব্যবহারিক শব্দযোগে প্রকাশযোগ্য নয়, তাকে ইঙ্গিতে, ব্যঞ্জনায় কবিত্বমণ্ডিত করেই প্রকাশ করতে হয়। এছাড়া, উপন্যাসে মানবহৃদয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লীলাবৈচিত্র্য মনস্তত্ত্ব-সম্মত উপায়ে বিশ্লেষণ করা হয়। এক্ষেত্রেও কবিত্বের প্রয়োজন, চিকিৎসক-সুলভ সাইকোঅ্যানালিসিস শুধু নয়। মানবমনের গহন অন্তঃপুরে প্রবেশ

করবার শক্তি ও অধিকার একমাত্র কবি ছাড়া আর কার আছে? কবিই তো কল্পনার তীব্র আলোকসম্পাতে মানবমনের রহস্য উন্মোচন করেন। তাই পদ্যই লিখুন আর গদ্যই লিখুন, ঔপন্যাসিককে কবি হতেই হয়।

শরৎচন্দ্র মূলতঃ মুখ্যতঃ বাস্তববাদী সাহিত্যিকরূপেই খ্যাত। বর্ণনার যথাযথতা, পুঙ্খানুপুঙ্খতা, মনস্তত্ত্বজ্ঞান ও পর্যবেক্ষণশক্তির তীক্ষ্ণতা ও গভীরতা তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভার অন্যতম ধর্ম। কিন্তু বাস্তবতার সঙ্গে বা উল্লিখিত গুণগুলির সঙ্গে কবিত্বের তো বিরোধ নেই। ডক্টর সুবোধ সেনগুপ্ত যথার্থই বলেছেন, "শরৎচন্দ্রের রচনার বাস্তবতা সর্বজনবিদিত, কিন্তু বাস্তবপ্রিয়তার সঙ্গে যে কবিপ্রতিভা জড়িত আছে তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি পড়ে না।" (শরৎচন্দ্র/ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত/৫ম সং/পৃঃ ১৮১)

শরৎচন্দ্র অবশ্য শ্রীকান্ত-র মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, "ভগবান আমার মধ্যে কল্পনা-কবিত্বের বাষ্পটুকুও দেন নাই। গাছকে ঠিক গাছই দেখি,—পাহাড়-পর্বতকে পাহাড়-পর্বতই দেখি। জলের দিকে চাহিয়া জলকে জল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।...চাঁদের পানে চাহিয়া চাহিয়া চোখ ঠিকরাইয়া গিয়াছে, কিন্তু কাহারো মুখটুখ তো কখনো নজরে পড়ে নাই। এমন করিয়া ভগবান যাহাকে বিড়ম্বিত করিয়াছেন, তাহার দ্বারা কবিত্ব সৃষ্টি করা তো চলে না। চলে শুধু সত্য কথা সোজা করিয়া বলা।" (শ্রীকান্ত/১ম পর্ব/এক)

কিন্তু একথা শ্রীকান্ত ও শ্রীকান্তের স্রষ্টা—কারও সম্পর্কেই সত্য নয়। শ্রীকান্ত ও শরৎচন্দ্র উভয়েই অবশ্য সত্য কথা সোজা করেই বলেছেন, (শরৎচন্দ্রের রচনার মস্ত বড়ো গুণই তো সরলতা!) কিন্তু উভয়ের মধ্যেই কল্পনা-কবিত্বের বাষ্প যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। একথা শরৎসাহিত্যের পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন।

প্রথমেই দেখা যাক বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি শরৎচন্দ্রের কবিদৃষ্টির বিশেষত্ব কী? বিশ্বপ্রকৃতির অপার মহিমা ও অনন্ত রহস্যের প্রতি শরৎচন্দ্রের যে দৃষ্টি তার মধ্যে রবীন্দ্রদৃষ্টিসুলভ বিরাট বিস্তার হয়তো নেই, কিন্তু অসাধারণ তীক্ষ্ণতা আছে। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের অবিচ্ছেদ্য একাত্মতা তিনি বারবার লক্ষ্য করেছেন। প্রকৃতি তাঁর উপন্যাসে নেহাত পটভূমি বা 'আলম্বন-বিভাব' রূপে দেখা দেয়নি। মানবহৃদয়ের সম্পর্কবিরহিত প্রকৃতিবর্ণনা শরৎ-সাহিত্যে নেই বললেই চলে। তিমিরাবৃত রাত্রি ও পিয়ারী বাঈজীর মর্মতলে রাজলক্ষ্মীর যে বুকফাটা কান্না—তার সংক্ষিপ্ত, সংযত বর্ণনার সহজ কবিত্ব তো উপেক্ষণীয় নয়!—"মুখ তুলিয়া চাহিলাম। সমস্ত বাড়ীটা গভীর সুষুপ্তিতে আচ্ছন্ন—কোথাও কেহ জাগিয়া নাই। একবার শুধু মনে হইল, জানালার বাহিরে অন্ধকার রাত্রি তাহার কত উৎসবের প্রিয় সহচরী পিয়ারী

বাঈজীর বুকফাটা অভিনয় আজ যেন নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত দেখিতেছে।" (শ্রীকান্ত/২য় পর্ব/এক)

কিংবা দয়ালের বাড়ি থেকে প্রত্যাবর্তনকালে বিজয়ার তৎকালীন বেদনা-ভারাক্রান্ত নৈরাশ্যপীড়িত হৃদয়খানি চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতায় ও অনুপম ভাষাশিল্পগুণে।—"বিজয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, আকাশে মেঘের আভাস পর্যন্ত নাই—নবমীর চাঁদ ঠিক সুমুখেই স্থির হইয়া আছে। তাহার মনে হইতে লাগিল পদতলের তৃণরাজি হইতে আরম্ভ করিয়া, কাছে দূরে যাহা-কিছু দেখা যায়—আকাশ, প্রান্তর, গ্রামান্তরের বনরেখা, নদী, জল সমস্তই এই নিঃশব্দ জ্যোৎস্নায় দাঁড়াইয়া ঝিম ঝিম করিতেছে। কাহারও সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই,—পরিচয় নাই—কে যেন তাহাদের ঘুমের মধ্যে স্বতন্ত্র জগৎ হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া যেখানে সেখানে ফেলিয়া গেছে—এখন তন্দ্রা ভাঙিয়া তাহারা পরস্পরের অজানা মুখের প্রতি অবাক্ হইয়া তাকাইয়া আছে।" (দত্তা/চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ)

প্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের তুলনা অসাধারণ শব্দসম্পদে ও অতুলনীয় কাব্যসৌন্দর্যে প্রকাশ পেয়েছে 'চরিত্রহীন'-এ ক্ষুব্ধ সমুদ্রের বর্ণনায় এবং সেই-সঙ্গে দিবাকর ও কিরণময়ীর হৃদয়-উদ্ঘাটনে।—"বাহিরের মত্তরাত্রি তেমনি দাপাদাপি করিতে লাগিল, আকাশের বিদ্যুৎ তেমনি বারংবার অন্ধকার চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে লাগিল, উচ্ছৃঙ্খল ঝড় জল তেমনিভাবেই সমস্ত প্রকৃতি লণ্ডভণ্ড করিয়া দিতে লাগিল, কিন্তু এই দুইটি অভিশপ্ত নরনারীর অন্ধ হৃদয়তলে যে প্রলয় গর্জিয়া ফিরিতে লাগিল, তাহার কাছে এ সমস্ত একেবারে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর হইয়া বাহিরেই পড়িয়া রহিল।" (চরিত্রহীন)

কিংবা 'শ্রীকান্ত' ২য় পর্বে সমুদ্রযাত্রার অনন্যদুর্লভ কাব্য-ঋদ্ধ বর্ণনা, বিশেষতঃ "যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূরেই এই আলোকমালা, যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বালিয়া এই ভয়ঙ্কর সুন্দরের মুখ আমার চক্ষের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দিল।"—প্রভৃতি অংশের সৌন্দর্য অসাধারণ। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের মৃত্যুভয়াল উত্তাল তরঙ্গমালায় যিনি ভয়ঙ্কর-সুন্দরের মুখ দেখতে পান তিনি কবি নয়ত কি?

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে ইন্দ্রনাথের নিশীথ-অভিযান ও শ্রীকান্তের শ্মশান-ভ্রমণ অংশের অন্ধকার রাত্রির যে বর্ণনা তার কবিত্বও অনন্যসাধারণ।

"বায়ুলেশহীন, নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ নিশীথিনীর সে যেন এক বিরাট কালীমূর্তি। নিবিড় কালো চুলে দ্যুলোক ও ভূলোক আচ্ছন্ন হইয়া গেছে, এবং সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া করাল দংষ্ট্রারেখার ন্যায় দিগন্ত-বিস্তৃত এই তীব্র জলধারা হইতে কি এক প্রকারের অপরূপ স্তিমিত দ্যুতি

নিষ্ঠুর চাপাহাসির মতো বিচ্ছুরিত হইতেছে।" (শ্রীকান্ত/১ম পর্ব/২য় অধ্যায়)

"রাত্রির যে একটা রূপ আছে, তাহাকে পৃথিবীর গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, জলমাটি, বনজঙ্গল প্রভৃতি যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তু হইতে পৃথক করিয়া, একান্ত করিয়া দেখা যায়, ইহা যেন আজ এই প্রথম চোখে পড়িল। চাহিয়া দেখি, অন্তহীন কালো আকাশ-তলে পৃথিবী-জোড়া আসন করিয়া গভীর রাত্রি নিমীলিত-চোখে ধ্যানে বসিয়াছে, আর সমস্ত বিশ্বচরাচর মুখ বুজিয়া নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া সেই অটল শান্তি রক্ষা করিতেছে। হঠাৎ চোখের উপরে যেন সৌন্দর্যের তরঙ্গ খেলিয়া গেল। মনে হইল, কোন্ মিথ্যাবাদী প্রচার করিয়াছে—আলোই রূপ, আঁধারের রূপ নাই? এতবড় ফাঁকি মানুষে কেমন করিয়া নীরবে মানিয়া লইয়াছে! এই যে আকাশ-বাতাস স্বর্গ-মর্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া দৃষ্টির অন্তরে-বাহিরে আঁধারের প্লাবন বহিয়া যাইতেছে, মরি! মরি! এমন অপরূপ রূপের প্রস্রবণ আর কবে দেখিয়াছি!" (শ্রীকান্ত/১ম পর্ব/১০ম অধ্যায়)

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের এই সুগভীর ঐক্যের পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের যত্রতত্র, বিশেষতঃ তৃতীয় পর্বের নিম্নোধৃত অংশে। রাজলক্ষ্মীকর্তৃক উপেক্ষিত শ্রীকান্তের দিন আর কাটে না—"অদূরবর্তী কয়েকটা খর্বাকৃতি বাবলা গাছে বসিয়া ঘুঘু ডাকিত, এবং তাহারি সঙ্গে মিলিয়া মাঠের তপ্ত বাতাসে কাছাকাছি ডোমেদের কোন্ একটা বাঁশঝাড় এমনি একটা একটানা ব্যথাভরা দীর্ঘশ্বাসের মতো শব্দ করিতে থাকিত যে, মাঝে মাঝে ভুল হইত, সে বুঝিবা আমার নিজের বুকের ভিতর হইতেই উঠিতেছে।" (শ্রীকান্ত/তৃতীয় পর্ব/নয়)

আবার, 'গৃহদাহ' উপন্যাসের শেষাংশে অচলার মানসিক অবস্থার যে বর্ণনা শরৎচন্দ্র দিয়েছেন তার শিল্পসংহত বাণীমূর্তি যেমন অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির পরিচায়ক, তেমনি উপন্যাসের এক অপরিহার্য, অবিচ্ছেদ্য ও অতুলনীয় অংশ—"এ দৃষ্টি যেমন সোজা তেমনি স্বচ্ছ। ইহার ভিতর দিয়া তাহার বুকের অনেকখানি যেন বড় স্পষ্ট দেখা গেল। সেখানে ভয় নাই, ভাবনা নাই, কামনা নাই, কল্পনা নাই—যতদূর দেখা যায়, ভবিষ্যতের আকাশ ধূ ধূ করিতেছে। তাহার রঙ নাই, মূর্তি নাই, গতি নাই, প্রকৃতি নাই—একেবারে নির্বিকার, একেবারে একান্ত শূন্য।" (গৃহদাহ/৪৩শ পরিচ্ছেদ)

ইতস্ততঃ উদ্ধৃতি বাড়িয়ে লাভ নেই। শরৎ-উত্তর যুগের নব্য লেখকেরা বাঙলা গল্প-উপন্যাসের গদ্যসম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠলেন। বিশেষতঃ 'কল্লোল' যুগ থেকেই। বাঙলা বাক্যবিন্যাস বা সিনট্যাক্স-এর রীতিকে এঁরা পালটাবার চেষ্টা করলেন। নতুনভাবে সাজাবার চেষ্টা করলেন বাক্যাংশ।

জটিলতম পদ রচনা করলেন। অতিহ্রস্ব, সংক্ষিপ্ত, তির্যক অর্থগর্ভ, বুদ্ধিগ্রাহ্য পদ এবং অসম সাহসিকতার সঙ্গে অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ-প্রচলন, সংস্কৃত-ভাণ্ডার থেকে দুরূহ শব্দগ্রহণ, উপমা-উপমেয় সমাসোক্তি অলঙ্কারের ব্যবহারেও তাঁরা যত্নকৃত নতুনত্ব আনবার চেষ্টা করলেন।

শরৎচন্দ্রের ভাষায় এই চেষ্টাকৃত নতুনত্ব বা যত্নকৃত প্রচেষ্টার চিহ্ন নেই। তা সহজ, সচ্ছন্দ ও স্বতঃপ্রবাহী। আড়ম্বরহীন, তবে বিষয়োপযোগী। মাঝে মাঝে কবিতার প্রতিস্পর্ধী। তাঁর ভাষার অন্যতম প্রধান গুণই আন্তরিকতা, সরলতা, স্পষ্টতা এবং বিষয় ও বস্তু-উপযোগী শব্দ-ব্যবহার। সেইসঙ্গে আতিশয্যহীন মাত্রারক্ষা করবার দুর্লভ ক্ষমতা।

প্রসঙ্গতঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলা যায়। তাঁর গদ্যরচনাতেও এই আতিশয্যহীন মাত্রারক্ষার দুর্লভ শক্তি লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণতঃ তাঁর উপন্যাস থেকে একটু উদ্ধার করা যেতে পারে।

"পূর্বদিকে গ্রামের বাহিরে জেলেপাড়া। চারিদিকে ফাঁকা জায়গার অন্ত নাই, কিন্তু জেলেপাড়ার বাড়িগুলি গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসিকান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনদিন সাঙ্গ হয় না।...আসে রোগ, আসে শোক। টিকিয়া থাকার নির্মম অনমনীয় প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি কাড়াকাড়ি করিয়া তাহারা হয়রান হয়। জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, অবিষণ্ণ। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতায় আর দেশী মদে, —তালের রস গাঁজিয়া যে মদ হয়, ক্ষুধার অন্ন পচিয়া যে মদ হয়। ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।" (পদ্মানদীর মাঝি/মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

এই অংশে কাব্যের অবকাশ আছে, সেইসঙ্গে আছে আবেগকে চালনা করবার শক্তি ও সংযম। লক্ষ্য করবার মতো বাগ-বিন্যাসের রীতি ও শব্দব্যবহার। তথাপি এই অংশ কাব্য নয়। অমার্জিত গদ্যও নয়। সরল, অকৃত্রিম, অনাবেগ বাগ্‌ভঙ্গি; আতিশয্যহীন, অথচ কাব্যের প্রতিস্পর্ধী।

বাঙ্‌লা গদ্যে শরৎচন্দ্রের যোগ্য উত্তরসূরী যদি কেউ থাকেন, তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

# শরৎসাহিত্য-সমালোচনার মূলভিত্তি

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

শরৎসাহিত্যের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিল এই যে, যে বস্তুমূল্য নিয়ত পরিবর্তনশীল বাজারদরের মতোই ক্রমাগত ওঠানামা করে, যা একান্তভাবে তাৎক্ষণিক ও ব্যবহারিক, তাই দিয়ে জগৎ ও জীবনের সবকিছুকে ওজন করে দেখতেন শরৎচন্দ্র। অভিযোগ ছিল এই যে, সমাজ ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে একটু বেশি মাথা ঘামাতেন তিনি। অর্থাৎ কিনা, সংস্কারসর্বস্ব ব্রাহ্মণ্যধর্মশাসিত সমাজজীবনের দুঃসহ সমস্যাজালে লাঞ্ছিত ও প্রতিহত মানবাত্মার সমস্ত দুঃখকে শোষণ করে নিতে গিয়ে সমবেদনার এক সীমাহীন সমুদ্রের বিশাল স্রোতাবর্তে তাঁর সাহিত্যাদর্শের চিরায়ত ভিত্তিভূমিটিকে নিঃশেষে হারিয়ে ফেলেছিলেন শরৎচন্দ্র। তাঁর সমাজচেতনাজর্জর বাস্তব জীবনবোধের খণ্ডিত প্রেক্ষিত ভূমি ছেড়ে, ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে চিরন্তন মূল্যবোধের আরও উজ্জ্বল এক মহাকাশে উত্তীর্ণ হতে পারেনি তাঁর শিল্পাদর্শ। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, শরৎচন্দ্র ছিলেন ঔপন্যাসিক এবং উপন্যাস মূলতঃ, স্বরূপতঃ ও প্রধানতঃ সমাজচেতনানির্ভর জীবনধর্মী সাহিত্য। 'অন্তর হতে আহরি বচন' কবিরা আনন্দলোক বিরচন করেন; ঔপন্যাসিকদের আনন্দলোক বিরচন করতে হয় সমাজপরিবেশ হতে উপাদান সংগ্রহ করে। সুতরাং চলতি কালের চাঞ্চল্যক্লিন্ন যুগানুবর্তিতা হতে মুক্ত হয়ে চিরন্তন মূল্যবোধের আকাশে যদি বিচরণ করতে না পারেন ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র, তাহলে তাঁকে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না। তাছাড়া বিশেষ করে জীবনধর্মী সাহিত্যে যুগানুবর্তিতা এমন কিছু দোষের কথা নয়। এমারসন তাঁর 'এসে অন আর্ট' প্রবন্ধে বলেছেন, "নো ম্যান ক্যান ইমানসিপেট ফ্রম দি এজ ইন হু ইচ হি লিভস অ্যান্ড ব্রীদস।" সমসাময়িক যুগপ্রভাব হতে কোন মানুষেই বিচ্ছিন্ন করতে পারে না নিজেকে। তবে দেখতে হবে এই যুগানুবর্তিতার আবর্তে তার সমগ্র জীবনচেতনা বা শিল্পবোধ যেন নিঃশেষে তলিয়ে না যায়। পরিবার বা সমাজজীবনকেন্দ্রিক যুগানুবর্তিতা চিরায়ত সাহিত্যের ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত হলেও শুধু এই যুগানুবর্তিতার আবর্তে শোচনীয়ভাবে ঘুরপাক খেয়ে আর সমাজজীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি যথাযথভাবে চিত্রিত করেই কোন সাহিত্যই মহৎ সাহিত্যের গৌরব অর্জন করতে পারে না। সমকালীন খণ্ড জীবনবোধের পঙ্কিল জলাশয়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেও যে সাহিত্য সুর্বাভিমানিনী পদ্মের মতো তার সুবাসিত পাপড়িকে বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনাদর্শের এক উজ্জ্বল অভিসারে মেলে ধরতে পারে

একমাত্র সেই সাহিত্যই লাভ করবে মহৎ সাহিত্যের মর্যাদা। এই মহত্তর জীবনাদর্শকেই পাশ্চাত্যের সমালোচকরা বলেছেন, "দি ইলিউশন অব হাইয়ার রিয়ালিটি"। বাস্তব জীবনচেতনার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবাতীত বৃহত্তর এক জীবনসত্যের আভাসে সিঞ্চিত বা সমৃদ্ধ না হলে সাহিত্য হয়ে উঠবে নিছক সাংবাদিকতা, শিল্প হয়ে উঠবে ফটোগ্রাফি। 'পল্লীসমাজ', 'বামুনের মেয়ে' প্রভৃতি সামাজিক উপন্যাসগুলিকে যে বৃহত্তর জীবনসত্যের আভাসে আভাসিত করে তুলতে পারেননি শরৎচন্দ্র সে জীবনসত্যের আভাস এক উজ্জ্বল বোধায়ত রূপ পরিগ্রহ করেছে তাঁর 'মহেশ'-শীর্ষক ছোটগল্পটিতে। মহেশের মৃত্যুর পর কন্যা আমিনার হাত ধরে বেরিয়ে যাওয়া সর্বহারা গফুর নক্ষত্রখচিত অন্ধকার আকাশের পানে মুখ তুলে আল্লার কাছে যে আর্জি পেশ করেছে, তার যে বুকফাটা মর্মবেদনাকে সে রাত্রির মৃদুশিহরিত বাতাসের কানে কানে ব্যক্ত করেছে, তা প্রতিটি যুগের মানুষের মর্মকে স্পর্শ করবে। শোষিত সর্বহারা মানুষের আত্মকেন্দ্রিক এক মর্মবেদনাকে চিরন্তন শিল্পের মহৎ উপাদানে পরিণত করার এই দৃষ্টান্ত শুধু বাংলাসাহিত্যে নয়, সারা বিশ্বসাহিত্যেও বিরল। 'মহেশ' গল্পে শরৎচন্দ্র যা পেরেছেন, চিত্রা কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটিতে সর্বহারা উপেনের মর্মবেদনাকে এক সার্থক কবিতার প্রকাশকলায় চিত্রিত করতে গিয়ে তা পারেননি রবীন্দ্রনাথ। জমিদার উপেনের ভিটেমাটি সব কেড়ে নিয়ে তাকে গ্রামছাড়া করলে পর উপেন যখন বলেছে, ভগবান তাকে মোহগর্তে রাখবে না বলেই দু-বিঘার পরিবর্তে বিশ্বনিখিলটাই লিখে দিল, তখন বেশ বুঝতে পারি, একথা উপেনের নয়, একথা রবীন্দ্রনাথের। অদ্বৈতবাদী ও বিশ্বাত্মবাদী রবীন্দ্রনাথ অতিসূক্ষ্ম অপার্থিব এক আধ্যাত্মিক তৃপ্তির প্রলেপ দিয়ে উপেনের পার্থিব ক্ষয়ক্ষতির প্রচণ্ড জ্বালাযন্ত্রণাকে শান্ত করতে চেয়েছেন। এখানে উপেনের ব্যক্তিগত অনুভূতিটিকে শৈল্পিক ক্রমবিন্যাসের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে বিশ্বানুভূতির অতীন্দ্রিয় স্তরে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়নি। তার এই অনুভূতির মাঝখানে অকস্মাৎ এক কৃত্রিম বিশ্বানুভূতির প্রকাশ ঘটিয়ে শিল্পরসের হানি করা হয়েছে। একমাত্র অধ্যাত্মসাধনাসঞ্জাত মহাজীবনের এক গূঢ় নিটোল উপলব্ধি হতে বেরিয়ে আসে যে কথা, সে কথা উপেনের মত সাধারণ লোকের মুখে একেবারে বেমানান।

শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ যে অভিযোগ এনেছিলেন তার আর-একটা কারণ ছিল এই যে, রবীন্দ্রনাথ আশঙ্কা করেছিলেন যে প্রকৃতিবাদের দ্বারা তৎকালীন ইউরোপীয় ঔপন্যাসিকগণ প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন, বিশেষভাবে সেই প্রকৃতিবাদ শরৎচন্দ্রের সাহিত্যাদর্শকেও আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। প্রকৃতিবাদের অর্থ হলো জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এক বস্তুসাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী, বস্তুকে

তার যথার্থ স্বরূপে ও সেই স্বরূপকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলার এক মতবাদ। শরৎচন্দ্র তাঁর 'শ্রীকান্তে'র প্রথম পর্বে প্রথম অনুচ্ছেদে নিজেও একথা স্বীকার করেছেন যে, তিনি বহির্জগতের প্রতিটি বস্তুকে তার যথার্থ স্বরূপে দেখেন এবং তাঁর আত্মভাবের দ্বারা সেই স্বরূপকে কোনভাবে প্রভাবিত বা খর্ব করেন না। কিন্তু আমার মনে হয়, ইংলণ্ডের ডিকেন্স, গলসওয়ার্দি, জর্জ এলিয়ট ও ফ্রান্সের বালজাক, ফ্লবেয়ার, এমিল জোলা ও মপাসাঁ যে অর্থে প্রকৃতিবাদী ছিলেন, শরৎচন্দ্র কিন্তু সে অর্থে প্রকৃতিবাদী ছিলেন না। তাঁর প্রকৃতিবাদের সঙ্গে সংমিশ্রিত ছিল ইউরোপীয় উদারনীতিবাদ ও হিতবাদ। এইসব তত্ত্ব শরৎচন্দ্র সচেতনভাবে অনুসরণ না করলেও এগুলি তাঁর সাহিত্যাদর্শের মধ্যে এক-একটি সক্রিয় উপাদান হিসাবে কাজ করেছে। শুচি-শুভ্র যে দয়ার দুধে পরিপূর্ণ ছিল শরৎচন্দ্রের অন্তর, জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে যে-কোন মানুষের প্রতি যে দরদ এক অগাধ প্রাচুর্যে ও স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসে উত্তাল হয়ে উঠত সবসময় তাঁর মনে, সে দুধ সে দরদের মূলে ছিল উদার নীতিবাদ আর হিতবাদের অবদান। শরৎচন্দ্র নিজের মুখে স্বীকার করলেও এই দরদের নির্বিচার বিতরণ আর অমিত উচ্ছ্বাস বস্তুকে তার যথার্থ স্বরূপে দেখতে দেয়নি তাঁকে। কোন চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র এক অপরিসীম দরদ ও মমতায় এমন অহেতুক বিচলিত হয়ে উঠতেন যে সেই চরিত্র সম্পর্কে কোন নিষ্ঠুর সত্য ফুটিয়ে তুলতে পারতেন না তিনি। এইজন্য একমাত্র 'দত্তা' উপন্যাসের রাসবিহারী ছাড়া প্রকৃত খলচরিত্র পাওয়াই যায় না শরৎসাহিত্যে। তাঁর কোন পুরুষ বা নারীচরিত্র কোন অন্যায় বা পাপকর্ম করতে না করতেই শরৎচন্দ্র নিজেই তাঁর সেই শুচিশুভ্র দয়ার দুধ দিয়ে সে পাপ ধুয়ে মুছে দিতেন।

কেউ যদি বলেন শরৎচন্দ্রের সমাজচেতনা ছিল খণ্ডিত, তাহলে তাঁকে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না। কারণ তিনি তৎকালীন সমাজজীবনের সমস্যা বলতে বুঝেছিলেন কৌলীন্যপ্রথা আর অস্পৃশ্যতা। সেকালের সাম্রাজ্যবাদী শোষণভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় যে দারিদ্র্য ছিল অস্পৃশ্যতা হতেও ভয়াবহ, যা এক শ্রেণীর সমর্থ মানুষকে কেন্দ্রচ্যুত করে হতাশার অতল গর্ভে নিক্ষেপ করেছিল, সেই দারিদ্র্য বা অর্থনৈতিক সমস্যার কথা একমাত্র 'মহেশ' গল্পে গফুরের কণ্ঠে ছাড়া আর কোথাও সোচ্চার হয়ে ওঠেনি। 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পেও এর কুফল কিছু প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু কোন উপন্যাসের বৃহত্তর পটভূমিকায় এই সমস্যার একটি পূর্ণাঙ্গরূপে কোন শৈল্পিক বিকাশ দেখতে পাই না। আসলে কৌলীন্যপ্রথা, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি কুফলগুলি দরিদ্র জন-গণকেই ভোগ করতে হত, কারণ যাঁরা ছিলেন সামাজিক ন্যায়-অন্যায়ের বিচার-কর্তা, তাঁরা ছিলেন সুবিধা-ভোগকারী-শ্রেণীভুক্ত ধনী জমিদার-জোতদার দল।

তাছাড়া, কেউ যদি বলেন, কৌলীন্যপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি সামাজিক সমস্যাব্যাধিকে বিভিন্ন উপন্যাসে ফুটিয়ে তুললেও শরৎচন্দ্রের নির্জ্ঞান মনের স্তরে ব্রাহ্মণ্যধর্মশাসিত সমাজব্যবস্থার প্রতি এক প্রচ্ছন্ন দরদ ছিল তাহলে সেকথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কারণ তাঁর সৃষ্ট কোন চরিত্রতেই এইসব সমস্যার বিরুদ্ধে কখনো কোন আক্রমণাত্মক উদ্যম উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়তে দেখা যায়নি। ফলে সেই 'ইলিউশন অব হাইয়ার রিয়ালিটি' বা বৃহত্তর জীবনসত্যের আভাস হতে বঞ্চিত হয়েছে উপন্যাসগুলি।

শরৎচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাসকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে—পারিবারিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক। আমার মনে হয়, একমাত্র 'নিষ্কৃতি', 'মেজদিদি', 'বড়দিদি' প্রভৃতি পারিবারিক উপন্যাসগুলিতে সর্বাধিক সার্থকতা লাভ করেছেন শরৎচন্দ্র। এইসব উপন্যাসে নারীচরিত্রগুলিও সার্থক হয়ে উঠেছে সর্বাংশে। কিন্তু সমাজসমস্যাভিত্তিক বা মানবমনের সমস্যাভিত্তিক যেসব উপন্যাসে নারীরা তাদের পারিবারিক গণ্ডী ছেড়ে সামাজিক ঘূর্ণাবর্তে এসে পড়েছে কোন না কোন কারণে, সেখানে লেখকের ধর্মভিত্তিক এক গ্রাম্য নীতিচেতনার দ্বারা বারবার নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সেইসব নারীচরিত্র। অভাবের তাড়নায় লম্পট জমিদারের লালসার কাছে নিজেকে বলি দিতে গিয়েও তা পারেনি বিরাজবৌ। মেসের ঝি সাবিত্রী সতীশের সঙ্গে নির্জন আলাপে রত হয়েও অক্ষতযৌবনা। দিবাকর-কিরণময়ী স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করলেও অক্ষত রয়ে যায় তাঁদের দেহের শুচিতা। এক গোঁড়া নীতিচেতনার রহস্যময় কলকাঠি অলক্ষ্যে থেকে নিয়ন্ত্রিত করেছে এইসব চরিত্রকে। 'শেষ প্রশ্নে'র কমল এদের মধ্যে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হলেও এক তত্ত্বপ্রধান কৃত্রিমতায় কমলের সমস্ত সংলাপ কণ্টকিত হওয়ায় জীবনরসসিদ্ধ হয়ে উঠতে পারেনি চরিত্রটি। কিন্তু নীতিবাদীদের মনে রাখা উচিত, মানুষের অনেক ভালো কর্ম-প্রেষণা (মোটিভেশন) স্থূল নীতিচেতনার জালে ধরা পড়ে না। প্রসিদ্ধ সমালোচক আই, এ. রিচারডস তাই বলেছেন : যে শিল্পী নীতির খাতিরে মানবমনের অনেক উৎকৃষ্ট প্রেষণাকে এড়িয়ে যান তিনি শিল্পীর ধর্ম হতেই বিচ্যুত হয়ে পড়েন।

দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের 'উইল টু রিপ্রোডিউস' তত্ত্ব বা প্রজননভিত্তিক কামচেতনার দ্বারা 'চরিত্রহীনে'র কিরণময়ী কিছুটা প্রভাবিত হলেও প্রেমচেতনার দিক থেকে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথের মত ভাববাদী প্রেমাদর্শের সাধক। বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, মানুষকে দূরেও ঠেলে। দেহলালসা-বর্জিত স্বার্থসম্পর্কবিহীন মহৎ প্রেম এক দুর্ল্লম্বিত প্রত্যয়ের এক সুবাসিত পিপাসায় আর্ত হয়ে দূর হতে দূরে ছুটে চলে। ইংরেজ কবি শেলী যাকে বলেছেন 'ডিভোশন টু সামথিং অ্যাফার'। বড়দিদি-সুরেন, রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্ত

ও কিরণময়ী-উপেনের মধ্যে এই প্রেমচেতনা মূর্ত হয়ে উঠলেও এর পূর্ণ পরিণতি দেখা যায় 'শেষপ্রশ্নে' যেখানে ক্ষণিকত্ববাদী রবার্ট ব্রাউনিং-এর মত শরৎচন্দ্রও মুহূর্তের মর্ত্যপ্রেমের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন অনন্তত্বের স্বর্গীয় সুষমা।

# শরৎ-প্রশস্তি

সুধীর বেরা

জীবনের যেথা অলিগলি যত,
শরৎ, তোমার বিমল জ্যোতি
উজল করিছে, প্রকাশ করিছে
ধন্য করিয়া তুলিছে নিতি।
হেয় হয়ে যারা আছে চিরদিন,
সমাজশাসনে জীবনায়ু ক্ষীণ,
সম্মান কভু দেয় নাই কেহ
দেখায়েছে শুধু ভীতি।
বিদ্রোহী তুমি তাহাদের হয়ে
জলদমন্দ্রে দিলে কানে কয়ে
অভয়মন্ত্র ছন্দিত তব
মহামানবের প্রীতি।

জননীজাতির ন্যায়-অধিকার
মানিতে শেখেনি যারা
ঘৃণায় দলিছে যারা অনিবার
প্রাণের স্বাধীন ধারা।
অর্ধজাতিরে শাসনে বাঁধনে,
আচারে বিচারে বেঁধে গৃহকোণে
সমাজ কখনো মুক্তি লভেনি—
সত্য এ বাণী তব,
মহাসাম্যের এ মহাসাধনা—
যুগযুগান্তে করিবে রচনা
হাসি-অশ্রুতে মানবের বুকে
তব ঠাঁই অভিনব।

বিপ্লবী! তুমি সব বাধা ভেদি
টুটিয়া তিমিরবন্ধ,
মুক্তিমন্ত্রে মৌক্তিক তব
ধ্বনিলে মিলন ছন্দ।

দরদী! তোমার স্নেহ-আহ্বানে
আনিয়াছে আশা দলিতের প্রাণে
মরমী! তোমার মরমীয়া সুরে
জাগিছে পতিত যত।
নবজাগরণে তোমার যে দান,
নাহি তার সীমা নাহি পরিমাণ,
সাম্য উদার, শরৎ, তোমার
চরণেতে মাথা নত॥

# 'অরক্ষণীয়া'র জ্ঞানদা

**শর্মিষ্ঠা দত্ত**

শরৎচন্দ্রের বহু গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে 'অরক্ষণীয়া' একটি সার্থক গল্প। লেখকের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি জ্ঞানদার চরিত্র। কাহিনীটির নামকরণও সার্থক।

আমাদের শাস্ত্রীয় সংস্কারে আছে আট পেরোলেই অনূঢ়া বালিকা হল অরক্ষণীয়া। ঘরে রক্ষণীয়া মেয়ে থাকলে তার বাপ-মাকে অপরিসীম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। শহরে না হলেও গ্রামে এই অবস্থা সেদিনও ছিল।

এইরকম এক অরক্ষণীয়া মেয়ে জ্ঞানদা। তাকে কেন্দ্র করেই এ কাহিনীর গোড়াপত্তন। রূপ ও অর্থের অভাবে সে অবিবাহিতা, সকলের কাছে অবহেলিতা। কাহিনীটির মধ্যে এই পরমসহিষ্ণু, শান্ত, সরলা বালিকার চরিত্রটি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে যেন অসহায় নিপীড়িত পল্লী-সমাজেরই মূক প্রতীক।

পিতৃহীন জ্ঞানদার মত তার জ্যাঠাইমাও পরাশ্রিতা। জ্যাঠাইমা স্বর্ণমঞ্জরী যখন জ্ঞানদার মা দুর্গামণিকে যে-কোন উপায়ে যেমন তেমন পাত্রের সঙ্গে জ্ঞানদার বিবাহ দিয়ে কুল রক্ষা করার উপদেশ দেন, তখনই জ্ঞানদার মানসিক বেদনা আরও গভীরভাবে অনুভূত হয়।

বিধবা স্বর্ণমঞ্জরী কনিষ্ঠ দেবর অনাথনাথের আশ্রয়ে এসে তার পুত্রকন্যা-দেরই আপন বলে ভেবেছেন, তাদের সঙ্গে আন্তরিক স্নেহের সম্বন্ধ গড়ে তুলে-ছেন। কিন্তু স্বামীহারা দুর্গামণি ও পিতৃহারা জ্ঞানদাকে তিনি কখনও সহ্য করতে পারেননি। জ্ঞানদার প্রতি নিষ্ঠুর, নির্মম আচরণ করেছেন, দুর্গামণিকে প্রতি পদক্ষেপে অপমানিত করেছেন। স্বর্ণমঞ্জরী যখন বলেন, "তা সত্যি কথা বলব মেজবৌ—যেমন তোমার মেয়ের ছিরি, তেমনি গিয়ে হরিপালে পোড়ে হোড়ে থেবো যা হোক একটা চাষা ভূষো ধরে দাওগে—ন্যাটা চুকে যাক্। শুনেচি নাকি—সেখানকার লোক সুচ্ছিরি-কুচ্ছিরি দেখে না—মেয়ে হলেই হ'ল।" এই তীব্র, কটু মন্তব্যেরও কোনও প্রতিবাদ করেনি জ্ঞানদা বা তার মা দুর্গামণি। নিঃশব্দে সব অপমান, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করেছে। অনুশাসনের দিক থেকে বিচার করলে সামাজিক কোনও অরক্ষণীয়া বালিকার সংসারে রান্নার কাজ নিষিদ্ধ ছিল। সেক্ষেত্রেও জ্যাঠাইমা বহুতর কপট ছলনার সাহায্য নিয়েছেন। তখন আর সামাজিক অনুশাসনের কথা ওঠেনি। তিনি সংসারের যাবতীয় কাজ এমনকি রান্নার কাজও জ্ঞানদাকে দিয়েই সম্পন্ন করাতেন। কিন্তু সে বিষয়ে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলেই শত সহস্র মিথ্যার আশ্রয় নিতেন।

দুঃখী পিতামাতার কন্যা হলেও জ্ঞানদা তাঁদের একমাত্র সন্তান; তাঁদের

বড় আদরে যত্নে লালিত হয়েছিল। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই গুরুজনের নির্দেশ —ন্যায় অন্যায় যাই হোক, নির্বিচারে মাথা পেতে নিতে, সেবা করতে, দুঃখ বুঝে সহ্য করতে সংসারে বোধ হয় আর তার জুড়ি ছিল না।

মা দুর্গামণিকে জ্ঞানদা অত্যন্ত ভক্তিশ্রদ্ধা করত। তার হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার দীপ্তি যেন তার সমস্ত কুরূপ আবৃত করে বাহিরে ফুটে উঠত। জ্ঞানদার একটি অন্তরের চোখ ছিল।

পীড়িত অতুল জ্ঞানদারই সেবা ও যত্নে প্রাণ ফিরে পায়। সে সময়ে অতুল সমস্ত মনপ্রাণ দিয়েই এই স্নেহপরায়ণ বালিকাকে ভালবেসেছিল। কিন্তু যখন সে জ্ঞানদারই খুল্লতাত-ভগিনী মাধুরীকে বিবাহ করবে বলে স্বর্ণমঞ্জরীকে প্রতিশ্রুতি দেয়, তখনও জ্ঞানদা তার এই নিষ্ঠুর আচরণের কোনও প্রতিবাদ করেনি, একবারও অতুলকে দোষারোপ করেনি, নির্বিবাদে আপন অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিয়েছে।

বলা বাহুল্য, এই ধিক্কার সমাজের বুকেই ফিরে এসেছে। 'বামুনের মেয়ে'র জ্ঞানদা চরিত্রকেও এই সূত্রে যোগ করে নেওয়া যায়। 'পল্লীসমাজ' এবং অন্যান্য গ্রামকেন্দ্রিক উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচয় উৎকীর্ণ। এমন করে শতকরা আশীজন বাঙালীর বাসভূমি পল্লীবাংলাকে আর কেউ দেখেননি; 'গল্পগুচ্ছে'র লেখকও না। অবশ্য ১৯৩৮ সালে তাঁর মৃত্যুর পর নানা সংঘাতে দ্রুত বাংলার পল্লীসমাজে পটপরিবর্তন হয়েছে। সেই পরিবর্তনের এপারে দাঁড়িয়ে বিচার করলে শরৎচন্দ্রকে কিছুটা সেকেলে মনে হবে। যেন বড় বেশী 'টপিক্যাল ইন্টারেস্ট' কিন্তু সমকালের বাঙালীসমাজ-পল্লীবাংলার সামাজিক বিন্যাস এমন আর কোন ঔপন্যাসিকের লেখায় সশরীরে বিদ্যমান নেই।

এজন্যই শিল্পী শরৎচন্দ্র সব বিতর্কের ধূলিঝড় পার হয়ে গেছেন। তিনি সমাজসংস্কারক নন, সমাজপর্যবেক্ষক এবং জীবনশিল্পী। তিনি যে সেকালের গ্রামীণ সমাজের বেদনাদীর্ণ অবস্থার ছবি এঁকেছেন, জ্ঞানদা-কমল-অভয়া-সাবিত্রীর মত মেয়েদের হৃদয়ের দিকে ফিরে চাইবার মনোভাব তৈরি করে দিয়ে গেছেন, সেজন্যই পাঠকসমাজ তাঁর কাছে চিরঋণী। সমস্যার নিষ্ঠুরতা, পীড়িত শোষিত মানুষগুলির অসহায়তা দেখে সংবেদী শিল্পী দুঃখের অভিভবে সমবেদনায় থরথর করে কেঁপেছেন। তাই মনে হয়, শরৎচন্দ্র যতটা অশ্রুপ্রবণ, ততটা মনস্বী নন। কিন্তু অশ্রুর যে গভীর উৎসে জীবনের অনুভব সত্যরূপে শুদ্ধরূপে জ্বলে ওঠে, সেই উৎসের তীরে বসেই 'অরক্ষণীয়া' ও 'বামুনের মেয়ে'র জ্ঞানদাকে চেনা যায়।

# শরৎচন্দ্রের রবীন্দ্রবিরোধিতা ঃ স্বদেশ ও সমাজ-ভাবনা

মঞ্জুলা ভট্টাচার্য

বাংলা কথাসাহিত্যের দুর্গম পথের পথিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তিরোধানের প্রায় চল্লিশ বছর পরেও সমস্ত প্রতিকূল পর্যালোচনার কথা স্মরণ রেখেও একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায় যে, বাংলা সাহিত্যে তাঁর দান অকিঞ্চিৎকর নয়। উনিশ-বিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলায় একদা কালের রথচালনার ভার যে অভিজাত সমাজের ওপর ন্যস্ত ছিল, একদিন দেখা গেল অতি সাধারণের স্পর্শেই তা হয়ে উঠেছে গতিমুখর। শরৎসাহিত্যের চরিত্রগুলো প্রথম শ্রেণী-বৈষম্যের ভেদাভেদ মিটিয়ে দিয়ে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত নির্বিশেষে এক পংক্তিতে বসতে পেলো। (সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও দরদী মন নিয়ে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকেই দেখেছিলেন।) তাঁর পর্যটক-জীবনের বিপুল ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা উপলব্ধির উচ্চসীমায় পৌঁছে বলিষ্ঠ প্রকাশক্ষমতায় পাঠকহৃদয়ের উষ্ণ সান্নিধ্য লাভ করেছিল।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যসাধনার বিষয় ছিল মানবমনের গভীরতম রহস্য, তৎকালীন সামাজিক সমস্যায় প্রপীড়িত নর-নারী, পরাধীনতার গ্লানিতে স্বদেশের জন্য সংগ্রামমুখর, পরিশেষে হতাশ্বাস পদদলিত জীবনের কথা। তাঁর উপন্যাসে একদিকে যেমন আছে জমিদারী অত্যাচার, অন্যদিকে ক্ষমাশীল জমিদার-প্রভু, সাম্প্রদায়িক বিভেদ-মুক্ত 'মহেশ' গল্পের গফুর চরিত্রও পাঠক-মনকে উদ্বেলিত করে তোলে। শরৎচন্দ্রের সত্যদৃষ্টি, স্বদেশের প্রতি নিগূঢ় ভালোবাসাই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের উজ্জ্বলতার কারণ। (অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি একদা বলেছিলেন, "খুব ভালো করে দেখে নিয়েছি পল্লীগ্রাম ও পল্লীসমাজ। তাছাড়া আমার উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র এবং ঘটনা আমার স্বচক্ষে দেখা।" দেশীয় সংস্কার-কুসংস্কার, রাজনৈতিক সার্ব-ভৌমত্বের জন্য অহিংস ও বৈপ্লবিক আন্দোলন-আলোড়ন তাঁর ওপর সমান-ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। শরৎচন্দ্র কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদে দ্বিধাশূন্যভাবে আস্থাবান ছিলেন না। তিনি যাতে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাসী ছিলেন তা হল খাঁটি স্বদেশপ্রেম। স্বদেশের জন্য যে-কোনো আত্মত্যাগ, স্বদেশের নানাবিধ সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সাধারণ মানুষের শিক্ষার প্রতি তিনি অনন্যমনা ছিলেন। অকৃত্রিম স্বদেশপ্রাণতার জন্যই বিশ্বকবি জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্দয় ইংরেজ অত্যাচারের প্রতিবাদে 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করলে শরৎচন্দ্র ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি নির্বিরোধে বলেছিলেন, "...রবিবাবু যখন নাইটহুড নেন তখন নাকি সি, আর, দাশ, কেঁদে-

ছিলেন। এখন একবার তাঁর দেখা পেলে জিজ্ঞাসা করতাম, আজ আমাদের বুক দশহাত কিনা বলুন।” কবিগুরুর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার অন্যতম কারণ হিসেবে এই ঘটনার উল্লেখ অনেক বার করেছেন—যদিও পরবর্তীকালে (১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে) অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে, দেশীয় শিক্ষার বিষয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় গুরুদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কবিগুরুর সাথে তাঁর অন্তরের আত্মীয়তা থাকা সত্ত্বেও এই বিরোধের কারণও তাঁর স্বদেশপ্রাণতা। ব্যক্তিগত, অত্যন্ত পার্থিব স্বার্থের জন্য কবিগুরুর সঙ্গে মনোমালিন্য হয়তো সাময়িকভাবে হয়েছে—তবে তা খুবই সামান্য পরিমাণে, অচিরেই সেই বিরোধের মীমাংসা হয়েছে। ব্যক্তিবিশেষের প্রতি শরৎচন্দ্রর একান্ত শ্রদ্ধা-প্রীতিরও উর্ধ্বে ছিল তাঁর স্বদেশপ্রেম। দেশের বন্দী-মুক্তির জন্য তিনি তৎকালীন বিশিষ্ট রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের সাথে সংশিলষ্ট থাকলেও এই দলের প্রতি তাঁর শর্তহীন আস্থা ছিল না। সেইজন্য তিনি নিষ্ঠাবান কোন দলীয় রাজনীতির কর্মী ছিলেন না (যদিও দলের শৃঙ্খলা সর্বদা মেনে চলার চেষ্টা করতেন)—সদর্থেই পরম হৃদয়বান দেশপ্রেমিক ছিলেন। একদা তিনি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে কংগ্রেসদলের অন্তর্ভুক্ত কর্মী হিসেবে রাজনীতিকেই তাঁর একমাত্র কাজ হিসেবে বরণ করে নিয়েছিলেন এবং সাহিত্য-চর্চা প্রায় বর্জন করেছিলেন। পরে তিনি নিজে এবং অন্যান্য গুণিজনের উপদেশ বুঝতে পারলেন সাহিত্যসেবার মধ্য দিয়েই তাঁর পরমপ্রিয় দেশের সেবা করা সম্ভব। তাঁর দেশের মানুষের সমকালীন বিভিন্ন সমস্যা অপূর্ব অনাবিল অথচ শিল্পমহিমায় রূপায়িত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের সাথে তাঁর দরদী-হৃদয় একাত্মতা লাভ করেছিল। শরৎচন্দ্রের সমাজ-সংস্কারে স্বাদেশিক হৃদয়াবেগ থাকলেও তিনি সাহিত্যকে সমাজসংস্কারের এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রচারযন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন নি।

স্বদেশপ্রাণ শরৎচন্দ্র কোনো নির্দিষ্ট দলীয় রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। প্রথমত, তিনি মহাত্মাজী অনুষ্ঠিত অসহযোগ ও অহিংস আন্দোলনে সর্বান্তঃকরণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, এমনকি কংগ্রেসদলের হাওড়া জেলার সভাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, দেশবন্ধুর সাথে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল, মহাত্মাজী তাঁর পরমপূজ্য ব্যক্তি ছিলেন, পরন্তু সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্বে অভিভূত শরৎচন্দ্র তাঁর মতাদর্শে আস্থা জ্ঞাপন করেছিলেন। অসহ-যোগ আন্দোলনে তিনি যোগদান করলেও বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী নীতি যে দেশের জন্য আত্মোৎসর্গের পরমনিষ্ঠাবান আয়োজন, এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহমাত্র ছিল না। সেইজন্য তিনি বিপ্লববাদীদের প্রতিও সহানুভূতিশীল ছিলেন। মহাত্মাজী একদা সন্ত্রাসবাদীদের দেশের শত্রু বলে অভিহিত করলে, সেই অনন্যসাধারণ মহাত্মাজীর ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা সত্ত্বেও অভাবনীয় সাহসিকতার

সঙ্গে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, "রক্তের গঙ্গা বয়ে যাবে চারদিকে, সেই শোণিত-প্রবাহের মধ্যেই ত ফুটে উঠবে স্বাধীনতার রক্তকমল। এতে ক্ষোভ কিসের, দুঃখ কিসের? কিসের অনুতাপ? নন-ভায়োলেন্স খুব নোব্‌ল আইডিয়া কিন্তু অ্যাচিভমেণ্ট অব ফ্রীডম ইজ নোব্লার—হানড্রেড টাইমস নোব্লার।"

স্বদেশপ্রেমের জন্য শরৎচন্দ্রের কোনো নির্দিষ্ট নীতি ও আদর্শ অবলম্বনের গোঁড়ামি ছিল না। স্বদেশপ্রীতি প্রদর্শনের বাহ্যিক মত ও পথ বিভিন্ন হতে পারে, এবং এই বিভিন্ন হওয়াটা কোনো অপরাধ নয়। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকাও অবশ্যই উচিত। শরৎচন্দ্র তাঁর নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা, মতামত নির্দ্বিধায় প্রকাশ করতে সাহসী ছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাপরায়ণ হয়েও বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর অগ্রজ কবি রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যের গুরুপদে বরণ করে-ছিলেন, তবুও তাঁর মতের সঙ্গে অনৈক্য থাকলে, দেশের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে সেই মতানৈক্যকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার মধ্যে তিনি কোনো অসম্মানের হেতু দেখেননি। গুরু-শিষ্যের মধ্যে চিন্তাধারার পার্থক্য অস্বাভাবিক নয়, এবং তা প্রকাশ করাও অশ্রদ্ধার ব্যাপার বলে তিনি মনে করেননি। বিশেষ করে ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার চেয়েও দেশের মঙ্গলচিন্তাই যদি প্রধান হয়, তবে তাঁর কাছে নির্দ্বিধায় মতামত প্রকাশই অধিক বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়েছে। শরৎচন্দ্রের নিজের উক্তিতেও এই মনোভাবেরই পরিচয় দেয়:

"রবীন্দ্রনাথ আমার গুরুতুল্য পূজনীয়। সুতরাং মতভেদ থাকলেও প্রকাশ করা কঠিন। কেবলি ভয় হয় পাছে অজ্ঞাতসারে তাঁর সম্মানে কোথাও লেশমাত্র আঘাত করে বসি। কিন্তু এ তো কেবলমাত্র ব্যক্তিগত মতামতের আলোচনা নয়,—যা তাঁরও বহুপূজ্য—সেই দেশের সঙ্গে এ বিজড়িত।"

রবীন্দ্রনাথের কাছেই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যদীক্ষা—একথা তিনি গর্বের বিষয় বলে মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' তাঁর বহুপঠিত উপন্যাস। বস্তুত শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ নায়িকাচরিত্রই রবীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট চরিত্রের ছায়ায় চিত্রিত। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল। বিভিন্ন সময়ে তাঁর নিজের উক্তিতেই সেকথা স্পষ্ট:

(ক) 'আমার চেয়ে ভাল সমজদার এখনকার কালে রবিবাবু ছাড়া আর কেউ নেই।' (১৯১৩-এর ২২শে অগস্ট তারিখে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা পত্রাংশ)। (খ) 'একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কোনো সম্পাদকের কাছে আমার রচনা যাচাই করতে ইচ্ছুক নই।' (১৯১৩-এর ২৪শে এপ্রিল তারিখে লেখা বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে পত্রালাপের অংশ)। (গ) 'আপনার অনেক শিষ্যের মধ্যে আমিও একজন।' (১৩২৯ বঙ্গাব্দের ২৩শে বৈশাখ তারিখে বাজে শিবপুর থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখা পত্রাংশ)। (ঘ) 'কবির সম্বন্ধে আমি

এখানে-ওখানে কখনো কখনো মন্দ কথা বলেছি রাগের মাথায়, এ যেমন সত্যি —এও তেমনি সত্যি যে, আমার চাইতে তাঁর বড় ভক্ত কেউ নেই,—আমার চাইতে তাঁকে কেউ বেশি মানেনি গুরু বলে—আমার চাইতে কেউ বেশি মকশো করেনি তাঁর লেখা।' (১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২৮শে পৌষ তারিখে অমল হোমকে লেখা পত্রাংশ)।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি শরৎচন্দ্রের এহেন বিশ্বাস, নির্ভরতা ও আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিক্ষাবর্জনসম্পর্কিত বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে বিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্র ব্রিটিশ সরকারের স্কুল-কলেজের শিক্ষা বর্জন করে বেরিয়ে আসে। মহাত্মাজী ফরবীজ ম্যানসনে গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন নাম দিয়ে জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দেশবন্ধুর এই শিক্ষাবর্জন-কর্মসূচীর তীব্র বিরোধিতা করলেও এই স্বাদেশিক অসহযোগ আন্দোলনকে বাধা দিতে পারেননি। স্যার আশুতোষ শিক্ষাবর্জনের উত্তাল ভাবতরংগকে বাধা দিতে অসমর্থ হলে রবীন্দ্র-নাথ পর পর তিনখানি পত্র সংবাদপত্রে প্রকাশ করে ছাত্রদের স্কুল-কলেজ বর্জন করানোর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কবির মতবাদ ছিল, উপযুক্ত স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা না করে ছেলেদের এইভাবে সরকারী স্কুল-কলেজ ছাড়ানো ভারি অন্যায়। কবির এই প্রতিবাদপত্র ছাপানো হলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষাবর্জনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল।

শিক্ষাবর্জনসম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের মতবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশ হলে শরৎচন্দ্রও অন্তর্দ্বন্দ্বে আলোড়িত হলেন। একদিকে গুরুদেবের প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা, অপরদিকে মহাত্মাজী-দেশবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের ভাবধারা, আদর্শ তাঁর অন্তরে প্রবিষ্ট হয়েছিল। এমন আত্মসংঘর্ষের মধ্যেও তিনি স্বদেশের প্রতি কর্তব্যকেই বড় বলে মনে করলেন। এবং কবিগুরুর বিরুদ্ধে অনুজ শরৎচন্দ্র প্রথম সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হলেন।

রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের শিক্ষা-বর্জন কর্মসূচীর প্রতিবাদ করে বললেন, এর দ্বারা ভারত ও পাশ্চাত্যের মধ্যে চীনের প্রাচীরের মতো ব্যবধান রচনা করা হচ্ছে। "একথা মানতেই হবে যে, আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েছে। পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মতো দোহন করছে, তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল।...অধিকার ওরা কেন পেয়েছে? নিশ্চয়ই সে কোন একটা সত্যের জোরে।" শরৎচন্দ্র কবির এই বক্তব্যের পরি-প্রেক্ষিতে একটি প্রবন্ধ ১৩২৮ সালে গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনে পাঠ করেছিলেন। পরবর্তী কালে ঐ প্রবন্ধগুলি তাঁর 'স্বদেশ ও সাহিত্য' নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়। রবীন্দ্রনাথের মতবাদের প্রতিবাদ করে তিনি বলেছেন, "শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর বিলেত থেকে ফিরে এলেন এবং পূর্ব ও পশ্চিমের শিক্ষার মিলন সম্বন্ধে উপর্যুপরি কয়েকটি বক্তৃতায় তাঁর মতামত ব্যক্ত করলেন।...তাঁর কথা নিয়ে কয়েকটা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কাগজ একেবারে উল্লসিত হয়ে উঠেছে।" পাশ্চাত্যের সমৃদ্ধি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল যে, তারা সত্যের জোরে পৃথিবী জয় করছে। পৃথিবীর সমস্ত সম্পদই প্রায় তাদের আয়ত্তে আর আমরা ভারতবাসী উপবাসী হয়ে আছি। শরৎচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন, "আজকের দিনে একথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, পৃথিবীর বড় বড় ক্ষীরভাণ্ডেই সে মুখ জুবড়ে আছে—তার পেটভরে দুই কস বেয়ে দুধের ধারা নেমেছে—কিন্তু আমরা উপবাসী দাঁড়িয়ে আছি!" শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মতবাদের বিপক্ষে তাঁর নিজস্ব মত প্রতিষ্ঠা করে বলেছেন, "এ একটা ফ্যাক্ট: আজকের দিনে একে কিছুতেই 'না' বলবার জো নেই—আমরা উপবাসী রয়েছি যতই কিন্তু তাই বলেই কি এই কথা মানতেই হবে যে, এ অধিকার পেয়েছে তারা নিশ্চয়ই একটা সত্যের জোরে? এবং এই সত্য তাদের কাছ থেকে আমাদের শিখতেই হবে?" (স্বদেশ ও সাহিত্য, পৃঃ ২৩, ৩য় সংস্করণ)

এই বিষয়ে শরৎচন্দ্রের মন্তব্য এই যে, যা ফ্যাক্ট বা ঘটনা—তা চিরসত্য নয়, সময়কালে তার পরিবর্তন ঘটাও কিছু অসম্ভব নয়। প্রসঙ্গত তিনি বলেছেন, "লোহা মাটিতে পড়ে, জলে ডোবে, এ একটা ফ্যাক্ট, একেই যদি মানুষ চরম সত্য মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকত ত আজকের দিনে নীচে, জলের উপর এবং ঊর্ধ্বে আকাশের মধ্যে লোহার জাহাজ ছুটে বেড়াতে পারত না। উপস্থিত কালে যা ফ্যাক্ট তাই কেবল শেষ কথা নয়।" শরৎচন্দ্রের মতে, "সংসারে জয় করা বা পরের কেড়ে নেওয়ার বিদ্যাটাকেই একমাত্র সত্য ভেবে লুব্ধ হয়ে ওঠাই মানুষের বড় সার্থকতা নয়।" (স্বদেশ ও সাহিত্য, পৃঃ ২৪, ৩য় সংস্করণ)

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বাঁচবার বিদ্যা কিংবা মানুষ হবার বিদ্যা আছে কেবল শুক্রাচার্যের হাতে, আজ তার বাড়ি পশ্চিমে। সুতরাং মানুষ হতে যদি চাই তার আশ্রমে আজ আমাদের দৌড়তেই হবে, 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'।"

শরৎচন্দ্রের আপত্তি ছিল কবির এই মনোভাবের প্রতি। স্বদেশের বিদ্যার প্রতি যেন কবির পরোক্ষ কটাক্ষপাত লক্ষ্য করেছেন তিনি। স্বদেশপ্রাণ শরৎচন্দ্র নিজের দেশের প্রতি কবির এই আপাত অশ্রদ্ধার ভাবকে মেনে নিতে পারেননি। সেইজন্য শরৎচন্দ্র কবির এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নিজের বক্তব্যকেই ('গোরা' উপন্যাসে) উপস্থিত করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য যে কতখানি স্ব-বিরোধী তার ইংগিত দিয়েছেন--

"গোরা বলে বাঙ্গালা সাহিত্যে একখানি অতি সুপ্রসিদ্ধ বই আছে, কবি যদি একবার সেখানি পড়ে দেখেন ত দেখতে পাবেন, তাঁর একান্ত স্বদেশভক্ত গ্রন্থকার গোরার মুখ দিয়ে বলেছেন--'নিন্দা পাপ, মিথ্যা নিন্দা আরও পাপ

এবং স্বদেশের মিথ্যা নিন্দার মতো পাপ সংসারে অল্পই আছে।" (স্বদেশ ও সাহিত্য, পৃঃ ৩১) শরৎচন্দ্রের উপলব্ধি ছিল, ভারতবর্ষের সভ্যতা, জীবন-ধারণের মান, ধর্মাচরণ ইউরোপীয়দের থেকে বিভিন্ন এবং এই অসাম্যের জন্যই ভারতবর্ষীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে শিক্ষার সমন্বয় আনতে চেয়েছেন, শরৎচন্দ্র পাশ্চাত্ত্যের জীবনধর্ম বিশ্লেষণ করে বলতে চেয়েছেন ইউরোপীয়দের সাথে আমাদের সর্বক্ষেত্রে শিক্ষার বিরোধ হবে—সমন্বয় সুদূরপরাহত। "পশ্চিমের সভ্যতার একটা মস্ত মূলধন হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড অব লিভিং বড় করা।...ওদের সামাজিক ব্যবস্থা, ওদের সভ্যতা, ওদের ধর্মবিজ্ঞান—এর সংগে যার সামান্য পরিচয়ও আছে এ সত্য সে অস্বীকার করবে না। এ ধনী হওয়ার অর্থ ত কেবল সংগ্রহ করাই নয়! সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীকেও তেমনি ধনহীন করে' তোলাও এর অন্য উদ্দেশ্য। নইলে, শুধু নিজে ধনী হওয়ার কোনো মানেই থাকে না। সুতরাং কোন একটা সমস্ত মহাদেশ যদি কেবল ধনী হতেই চায় ত অন্যান্য দেশগুলোকে সে ঠিক সেই পরিমাণে দরিদ্র না করেই পারে না।...এই তার মেদ-মজ্জাগত সংস্কার, এই তার সমস্ত সভ্যতার ভিত্তি, এর 'পরেই তার বিরাট সৌধ অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে। এরই জন্যে তার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত সাধনা নিয়োজিত।" শরৎচন্দ্র ইউ-রোপীয়দের এবংবিধ মানসিকতার পরিচয় দিয়ে বলেছেন, "ইউরোপ ও ভারতের শিক্ষাবিরোধ আসলে এইখানে,—এরই মূলে। আমাদের ঋষিবাক্য যত ভালই হোক তারা নেবে না, কারণ তাতে তাদের প্রয়োজন নেই। সে তাদের সভ্যতার বিরোধী। আর তাদের শিক্ষা তারা আমাদের দেবে না—কথাটা শুনতে খারাপ কিন্তু সত্য। আর দিলেও তার যেটুকু ভিক্ষা সেটুকু না নেওয়াই ভাল। বাকিটুকু যদি আমাদের সভ্যতার অনুকূল না হয়, সে শুধু ব্যর্থ নয়, আবর্জনা।"

শরৎচন্দ্র স্বদেশের প্রতি নিগূঢ় বিশ্বাসের অনুবর্তী হয়েই চরকা ও খদ্দর আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি হাওড়া জেলার কংগ্রেসকর্মীদের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের কাছে অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থন ও চরকা-খদ্দর প্রচারের কথা নিবেদন করলেন। কবি কিন্তু শরৎচন্দ্রের প্রস্তাব সমর্থন করতে পারেননি। ওই সময় (১৯২১ খৃীষ্টাব্দে) শরৎচন্দ্র সাহিত্যসাধনা থেকে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত করে সর্বান্তঃকরণে দেশসেবায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল, কবি দীর্ঘদিন ইউরোপ-প্রবাসী হওয়ার জন্য দেশব্যাপী সাড়াজাগানো দেশবন্ধু-মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনেও কবির বিশ্বাসের অভাব এবং এই ধারণায় বদ্ধমূল হয়েই তিনি কারো কাছে কবির বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক কিছু বলেও ছিলেন। শরৎচন্দ্রের সেই নিন্দাসূচক মন্তব্য লোকপরম্পরায় কবির শ্রুতিগোচর হলে তিনি দিলীপ রায়কে লিখেছিলেন,

"শরতের এককালীন চরকাভক্তি নিয়ে আমি তোমাদের কাছে বারবার হেসেছি, কখনো হাসতুম না, গম্ভীর হয়ে নীরবে থাকতুম—যদি আমার মনের মধ্যে কাঁটার ক্ষত না থাকত। কারণ ব্যক্তিগত কারণে যার উপরে আমার বিমুখতা আছে তাকে নিন্দা করতে আমি ভারি লজ্জাবোধ করি।...আমি সর্বান্তঃকরণে তাঁর কল্যাণ কামনা করি। তিনি (শরৎচন্দ্র) চরকা ছেড়ে কলম ধরেছেন, তাতে আমি খুশি হয়েছি এই জন্যে যে, তাঁর কলম থেকে দেশোন্নতির যে সূত্রপাত হবে চরকা থেকে তা হবে না—কিন্তু খেয়ালের বশে যদি তিনি চক্রধর হয়েই থাকেন, তা হলেও তাঁর বিরুদ্ধে আমি কখনই চক্রান্ত করব না।"

একথা অবশ্য স্বীকার্য, শরৎচন্দ্র প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে একাধিকবার রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিরূপ আচরণ করলেও তিনি (রবীন্দ্রনাথ) কখনও তাঁর অগোচরে বা সম্মুখে চক্রান্ত করার ইচ্ছা পোষণ করেন নি। এই কারণেই বোধহয়, কবির অমায়িক ক্ষমাসুন্দর আচরণের কাছে শরৎচন্দ্র নিজেকে আরও ভালোভাবে বিশ্লেষণ করবার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর মতবাদের দৃঢ়তা আরও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের পরে পরিবর্তিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের এককালীন চরকা-প্রীতিও অন্তর্হিত হয়েছে। বর্তমান আলোচনায় এই প্রসঙ্গ যদিও অবান্তর,—একবার শরৎচন্দ্র শ্রীপরশুরাম ছদ্মনামে চরকা-আন্দোলন সম্পর্কে ব্যঙ্গ করে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, "বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের উক্তির নজির দিয়া প্রায়ই বলা হয়, অবসরকালে দুচারঘন্টা করিয়া চরকা কাটিলে মাসিক আট আনা দশ আনা বারো আনা আয় বাড়ে। গরীব দেশে এই ঢের।" তবুও শরৎচন্দ্র স্বদেশের ভালো-মন্দনির্বিশেষে গ্রহণের আদর্শে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন এবং খদ্দরের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের এক বিরাট শক্তি, চরকা-খদ্দর সংক্রান্ত অসহযোগ আন্দোলনের দৃষ্টিগ্রাহ্য দৃঢ় ব্যক্তিত্বের সমর্থন পাওয়ার জন্যই বোধহয় শরৎচন্দ্র তাঁর দ্বারস্থ হয়েছিলেন—চরকাকাটার অন্তঃসারশূন্যতার কথা জেনেও। ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে ভারতবর্ষীয়দের মুক্তি আন্দোলনের পথ যাতে হেয় প্রতিপন্ন না হয় উপরন্তু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন পেয়ে প্রকৃত মর্যাদা পায় সেই উদ্দেশ্যেও হয়তো শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে চরকা-খদ্দরের প্রচার প্রার্থনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চরকা-আন্দোলনের প্রতি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না এবং তাঁর অনাস্থাজ্ঞাপক মন্তব্য,—'The programme of the charka is so utterly childish that it makes one despair to see the whole country deluded by it'—শরৎচন্দ্র পরবর্তীকালে তাঁর এর প্রতি (চরকা-আন্দোলন) বিরূপ-মনোভাবের যুক্তি হিসেবে উদ্ধৃত করেছিলেন।

স্বদেশ ও সমাজ-ভাবনার অনুবর্তী হয়ে শরৎচন্দ্র সেই যুগের ভারতের

স্বাধীনতা-আন্দোলনে বিপ্লবীদের মহান আত্মত্যাগের সুমহান আদর্শে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁর শানিত লেখনীতে আন্তরিকতার সঙ্গে 'পথের দাবী' উপন্যাস রাজরোষকে তুচ্ছ করে ১৩৩৩ সালের ১৭ই ভাদ্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। 'পথের দাবী'র সমস্ত চরিত্র কাল্পনিক এবং উপন্যাসের রস থাকা না সত্ত্বেও ভারতের মুক্তিযুদ্ধে বৈপ্লবিক কার্যকলাপের প্রতি বাংলা-দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার শ্রদ্ধা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের সুদৃঢ় শাসন-ক্ষেত্রেও প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছিল। রাতারাতি 'পথের দাবী'র সহস্রাধিক কপি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল. এমনকি হাতেলেখা 'পথের দাবী'র নকল বিপ্লবীদের বীজমন্ত্রের মতো সাথে সাথে থাকত। 'পথের দাবী' ইংরেজরা বাজেয়াপ্ত করলে শরৎচন্দ্র ভারতের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ আশা করেছিলেন। শরৎচন্দ্র একখানি 'পথের দাবী' রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বইখানি পড়ে কোনো প্রতিবাদ না করে শরৎচন্দ্রকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। শরৎচন্দ্র সেই চিঠির কথা ভুলতে পারেন নি। তিনি হয়তো গুরুদেবের কাছে স্বদেশের সমস্যাবিজড়িত উপন্যাস সম্পর্কে আরও প্রবল সমর্থন কামনা করেছিলেন। সেই চিঠির সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র তখন উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন, "রবিবাবুর সে চিঠি আমি ভুলতে পারিনি। কোনোদিন ভুলতে পারবো বলেও ভরসা হয় না।" এমনকি প্রায় দশ বছর পরেও তিনি সেকথা ভুলতে পারেননি। 'পথের দাবী'র প্রসঙ্গ উঠলেই শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু শ্লেষ না করে ছাড়তেন না। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শরৎপরিচয়' গ্রন্থে এই বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। সুরেনবাবু লিখেছেন, "একদিন কে এক প্রেনটিস সাহেব শরৎচন্দ্রকে ডেকে বললেন, তুমি সরকারের পক্ষ থেকে 'পথের দাবী'র মতো একখানি বই লিখে দাও, ভালো টাকা পাবে। উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, আর চার অধ্যায় লেখার বয়স নেই। আমায় তুমি ক্ষমা করো।" প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে যে, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রতি কটাক্ষ করেই চার অধ্যায় রচিত। উপন্যাসটি পড়লে এ ধারণা অমূলক বলে মনে হয় না।

দেশবন্ধু-মহাত্মাজী-পরিকল্পিত অসহযোগ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ শরৎচন্দ্র একদা রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাপারে সমর্থন না পেয়ে বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এর কিছুদিন পরেই বিপ্লবীদের সশস্ত্র আন্দোলনে শরৎচন্দ্র বিশ্বাসী হয়ে পরম নিষ্ঠার সাথে 'পথের দাবী' উপন্যাস লিখেছিলেন এবং সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হলে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা ছিল তাঁর থেকে স্বতন্ত্র—তিনি অসহযোগ বা সশস্ত্র কোনো আন্দোলনেরই সমর্থন করতে পারেন নি। বিশেষত, মনে হয়, কবিগুরু শরৎচন্দ্রের মতো ভাবপ্রবণ বা আবেগতাড়িত তেমনভাবে ছিলেন না।

উভয়ের মানসিক গঠন, পরিবেশ-প্রকৃতির স্বতন্ত্রতার জন্যই মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। পরে শরৎচন্দ্রের বয়সের পরিণতিতে অভিজ্ঞতা পরিপুষ্ট হলে রবীন্দ্রনাথের সাথে মতবিরোধের কঠোরতা অনেক শিথিল হয়ে যায়। মত ও পথের পার্থক্যহেতু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পথের দাবী'র পরিপ্রেক্ষিতে চিঠির উত্তর শরৎচন্দ্রের কাছে খুব শাণিত বলেই মনে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সেই চিঠির কিছু অংশ উদ্ধৃতিযোগ্য,—"নিজের জোরে নয়, পরন্তু সেই পরের সহিষ্ণুতার জোরেই যদি আমরা বিদেশী রাজত্ব সম্বন্ধে যথেচ্ছ আচরণের সাহস দেখাতে চাই, তবে সেটা পৌরুষের বিড়ম্বনা মাত্র—তাতে ইংরেজরাজের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়, নিজের প্রতি নয়।...

"তুমি যদি কাগজে রাজবিরুদ্ধ কথা লিখতে, তাহলে তার প্রভাব স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী হত কিন্তু তোমার মতো লেখক গল্পচ্ছলে যে কথা লিখবে তার প্রভাব নিয়ত চলতেই থাকবে—দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই—অপরিণত বয়সের বালক-বালিকা থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধরা পর্যন্ত তার প্রভাবের অধীনে আসবে। এমন অবস্থায় ইংরেজরাজ যদি তোমার বই প্রচার বন্ধ করে না দিত, বোঝা যেত যে সাহিত্যে তোমার শক্তি ও দেশে তোমার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তার নিরতিশয় অবজ্ঞা বা অজ্ঞতা। শক্তিকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত সইবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, এই কারণেই সেই আঘাতের মূল্য—আঘাতের গুরুত্ব নিয়ে বিলাপ করলে, সেই আঘাতের মূল্য একেবারেই মাটি করে দেওয়া হয়।"

এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ 'পথের দাবী'র বাজেয়াপ্ত করার প্রতিবাদ করেননি। উপন্যাসটি লেখকের গুণে সুদৃঢ়ভাবে আপনার স্থান করে নেবে —এই আশা তিনি করতেন। শরৎচন্দ্র তখন আবেগাপ্লুত ও উত্তেজিত। রবীন্দ্রনাথের কাছে এই বইটির প্রতি অযথা অন্যায়ের প্রতিবাদ তিনি চেয়েছেন। প্রতিবাদ না পেয়ে তাঁর মনের বিক্ষোভ স্বাভাবিক। ভাবপ্রবণ মনে শরৎচন্দ্র ভেবেছেন, গুরুদেব তাঁর রচনার এবং স্ব-স্বভাবের দুর্বলতার প্রতি কটাক্ষ করেছেন। শরৎচন্দ্র উত্তেজিত হৃদয়ে একটি প্রত্যুত্তরও রবীন্দ্রনাথকে লিখে রেখেছিলেন কিন্তু সেই পত্র আর পাঠান নি তাঁকে। সেই পত্রের কিয়দংশ এই রকম : "আপনি লিখেছেন, ইংরেজরাজের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে, ওঠবারই কথা। কিন্তু এ যদি আমি অসত্য প্রচারের মধ্য দিয়ে করবার চেষ্টা করতাম, লেখক হিসেবে তাতে আমার লজ্জা ও অপরাধ দুই-ই ছিল। কিন্তু জ্ঞানতঃ তা আমি করিনি। করলে পলিটিশিয়ানদের প্রোপাগাণ্ডা হত, কিন্তু বই হত না। নানা কারণে বাঙ্গালা ভাষায় এ ধরণের বই কেউ লেখে না। আমি যখন লিখি এবং ছাপাই তার সমস্ত ফলাফল জেনেই করেছিলাম। সামান্য সামান্য অজুহাতে ভারতের সর্বত্রই যখন বিনা বিচারে—অবিচারে অথবা বিচারের ভান

করে কয়েদ· নির্বাসন প্রভৃতি লেগেই আছে, তখন আমিই যে অব্যাহতি পাবো, অর্থাৎ রাজপুরুষেরা আমাকে ক্ষমা করে চলবেন—এ দুরাশা আমার ছিল না।...আপনি লিখেছেন, আমাদের দেশের রাজারা এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অন্যান্য রাজশক্তির কারও ইংরেজ গভর্ণমেন্টের মতো সহিষ্ণুতা নেই। একথা অস্বীকার করবার অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিন্তু এ আমার প্রশ্নই নয়। আমার প্রশ্ন ইংরাজ রাজশক্তির এ-বই বাজেয়াপ্ত করবার জাস্টিফিকেশন যদি থাকে, পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে প্রোটেস্ট করার জাস্টিফিকেশনও তেমনি আছে।...আমার প্রতি আপনি এই অবিচার করেছেন যে, আমি যেন শাস্তি এড়াবার ভয়েই প্রতিবাদের ঝড় তুলতে চেয়েছি এবং সেই ফাঁকে নিজে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। দেশের লোক যদি প্রতিবাদ না করে আমাকে করতেই হবে। কিন্তু সে হৈ-চৈ করে নয়, আর এক-খানা বই লিখে।"

শরৎচন্দ্রের এই পত্রই তাঁর মনোভাবের স্মারক। তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ (ইংরেজরাজের বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে) না পেলেও উপন্যাসটির যে স্বীকৃতি পেয়েছেন সর্বসাধারণের কাছ থেকে—"তোমার মত লেখক গল্প-চ্ছলে যে কথা লিখবে তার প্রভাব নিয়ত চলতেই থাকবে,—দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই—অপরিণত বয়সের বালক-বালিকা থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধরা পর্যন্ত তার প্রভাবের অধীনে আসবে। এমন অবস্থায় ইংরেজরাজ যদি তোমার বই প্রচার বন্ধ করে না দিত, বোঝা যেত যে সাহিত্যে তার নিরতিশয় অবজ্ঞা বা অজ্ঞতা।" রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তিতে শরৎচন্দ্রের এই স্বীকৃতি শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য। গুরুদেবের কাছ থেকে শরৎচন্দ্রের প্রাপ্যের আশা ছিল আরও বেশী, তিনি নিজের উত্তেজনার মানদণ্ড দিয়ে আশা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথও ব্রিটিশরাজের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বেগে রুখে দাঁড়াবেন। তাঁর এই শান্ত-সৌম্য, সহনশীল মনোভাব শরৎচন্দ্রের উত্তেজিত হৃদয়ে তখনকার মতো মেনে নিতে কষ্ট হয়েছিল। তিনি তাই রবীন্দ্রনাথের উক্তি, "ইংরেজরাজের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে"—সহজভাবে গ্রহণ করেন নি, মনের মধ্যে অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে। একথা তো ঠিক 'ইংরেজরাজের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে' বলেই উপন্যাসটি থেকে বিপ্লবীরা প্রেরণা পেয়েছে· সাধারণ লোক বিক্ষুব্ধ হয়েছে। শরৎচন্দ্র হয়তো ভেবেছিলেন ইংরেজরাজের অপ্রসন্ন হওয়ার সাথে সাথে গুরুদেবের মনও অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছে। অথচ এমন আশঙ্কা অমূলক। তবু শরৎচন্দ্রের মনের যন্ত্রণা কমে নি।

শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী'র জন্য রবীন্দ্রনাথকে গান লিখে দিতে অনুরোধ করলে, তিনি সময়াভাবের জন্য অস্বীকৃত হলেও শরৎচন্দ্রের অভিমানী-হৃদয় তাঁর প্রতি বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। এই নাটক-সম্পর্কিত নিতান্ত ব্যক্তিগত

কারণেও শরৎচন্দ্রের সাথে কবির বিরোধিতা সৃষ্টি হয়েছিল এবং কবি দেশ-কাল ও লোকযাত্রার প্রসঙ্গ তুলে শরৎচন্দ্রকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিটি তাঁর সাহিত্যিক মূল্যায়নের যেমন সহায়ক তেমনি তাঁর স্বদেশ ও সমাজ সম্পর্কে বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিটিও কিছুটা ধরা যায়। "তোমার দেখবার দৃষ্টি আছে, ভাববার মন আছে, তার উপরে এদেশের লোকযাত্রা সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত। তুমি যদি উপস্থিতকালের দাবী ও ভিড়ের লোকের অভিরুচিকে না ভুলতে পারো তাহলে তোমার সেই শক্তি বাধা পাবে।"

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের চিঠি পেয়ে অভিমানক্ষুব্ধ মনে কবিকে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন, "সাধারণের কাছে সমাদর পাওয়া গেল প্রচুর। কিন্তু আপনার কাছে দাম আদায় হোল না।...পরিশেষে, আমার শক্তির উল্লেখ করে লিখেছেন, তুমি যদি উপস্থিত কালের দাবী ও ভিড়ের লোকের অভিরুচিকে না ভুলতে পারো, তাহলে তোমার এই শক্তি বাধা পাবে। আপনি নানা কাজে ব্যস্ত, কিন্তু আমার ভারি ইচ্ছে হয়, আপনার কাছে গিয়ে এই জিনিসটা ঠিকমত জেনে আসি। কারণ উপস্থিত কালটাও যে মস্ত ব্যাপার, তার দাবী মানবো না বললে, সেও যে শাস্তি দেয়।" স্বদেশানুরক্ত ও সমাজদরদী শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যকে সাধারণের আদরণীয় করে তুলতে গিয়ে সমকালীন সমস্যাকে তুচ্ছ করতে পারেন নি। উপস্থিত কালের দাবিটাই দৃষ্টিগ্রাহ্য এবং শরৎচন্দ্রের হৃদয়ানুভূতি ছিল সেই দৃষ্টিগ্রাহ্য সমস্যাসমূহের দিকে। মানুষের কতগুলো অনুভূতি চিরকালীন কিন্তু কতগুলো সমস্যা হয় সমকালীন পরিবেশ-সৃষ্ট। সমকালীন ও সমস্যাগুলো মানুষকে হয়তো মুক্তি দেয় কিন্তু চিরকালীন পার্থিব সর্বজনীন দুঃখ থেকে মুক্তির পথ কোথায় এবং কিভাবে —এই বীক্ষণ সাহিত্যকেও শাশ্বত করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ 'উপস্থিত কালের দাবী' ও 'ভিড়ের লোকের অভিরুচি'কে বাদ দিয়ে সাহিত্যে যে চিরকালের আবেদন আনতে চেয়েছেন তা হয়তো মানবজীবনের চিরকালের দুঃখ-সুখের অনুভূতি। শরৎচন্দ্র উপস্থিত কালটাকেও 'মস্তবড় ব্যাপার' বলে মনে করেছেন। তাঁর 'ষোড়শী'কে কেন্দ্র করে গুরুদেবের সাথে পত্র-বিনিময়ে উভয়ের আদর্শগত বৈষম্য বোঝা গেছে।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে 'ষোড়শী'-সংক্রান্ত ব্যাপারে অব্যবহিত পূর্বে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'সাহিত্যধর্ম' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালের তরুণ সাহিত্যিকদের সাহিত্যক্ষেত্রে আব্রুতা ও বে-আব্রুতার পরিমিতিবোধের ওপর আলোচনা করে কটাক্ষপাত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে কোন ব্যক্তিবিশেষের ওপর অভিযোগ ছিল না, তবুও শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত 'সাহিত্যধর্মের সীমানা' নাম দিয়ে রবীন্দ্রনাথের

উক্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদস্বরূপ প্রবন্ধ লেখেন। কারণ সাহিত্যধর্মে আব্রুতা-বে-আব্রুতার উপর নির্ভর করে অদ্যাবধি কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নির্দেশিত হয়নি। প্রবীণ এবং নবীনের মধ্যে নীতিগত বিরোধও সর্বকালের। 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের মতামত বলে এ বিষয়ে একটি লেখা প্রকাশিত হয়। তখন এর প্রতিবাদ হিসেবেই শরৎচন্দ্র একরূপ বাধ্য হয়েই 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ওই লেখাটি ১৩৩৪ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্রের সেই 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' প্রবন্ধ কবির প্রতি সরাসরি অভিযোগ করে লেখা। প্রসঙ্গত কিছুটা অংশ উদ্ধারযোগ্য ঃ—"...কবি তো থাকেন বারোমাসের মধ্যে তেরমাস বিলাতে। কি জানেন তিনি কে আছে তোমাদের খড়্গহস্তা শুচিধর্মী শৈলজা-প্রেমেন্দ্র-নজরুল-কল্লোল-কালিকলমের দল? কি করিয়া জানিবেন তিনি কবে কোন্ মহীয়সী জননী অতি আধুনিক-সাহিত্যিক দলন করিতে ভবিষ্যৎ মায়েদের সূতিকাগৃহেই সন্তানবধের সদুপদেশ দিয়া নৈতিক উচ্ছ্বাসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। আর কবে শৈলজানন্দ কুলি-মজুরের নৈতিক হীনতার গল্প লিখিয়া আভিজাত্য খোয়াইয়া বসিয়াছে? এসকল অধ্যয়ন করিবার মত সময়, ধৈর্য এবং প্রবৃত্তি কোনটাই কবির নাই, তাঁহার অনেক কাজ। দৈবাৎ এক-আধটা টুকরা টুকরা লেখা যাহা তাঁহার চোখে পড়িয়াছে, তাহা হইতেও তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে, আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যের আব্রুতা এবং আভিজাত্য দুই-ই গিয়াছে।...আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতি কবির এতবড় অবিচারে শুধু নরেশ-চন্দ্র নয়, আমারও বিস্ময় ও ব্যথার অবধি নাই।"

শরৎচন্দ্রের নবীন সাহিত্যিকদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতি ছিল। তিনি যৎপরোনাস্তি তাদের উৎসাহ দিতে চেষ্টা করতেন। তরুণ সাহিত্যসেবীদের প্রতি কবির অভিযোগকে শরৎচন্দ্র এইরকম নির্মমভাবে প্রতিবাদ করেন। কবির প্রতি তাঁর বিরূপতা প্রদর্শিত হয়, তবুও দেশীয় সাহিত্যিকদের মর্যাদা রক্ষার জন্য শরৎচন্দ্র এইরকম অপ্রিয় কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন।

যদিও শরৎচন্দ্রের তরুণ সাহিত্যিকদের প্রতি ধারণার আমূল পরিবর্তন হয়েছিল মাত্র এক বৎসর তাদের সাথে মেলামেশার অভিজ্ঞতার পর। তাদের সাহিত্য মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করে দেখলেন, "আমি যাকে রস বলে বুঝি, তাদের ভিতর তার বড্ড অভাব। চোখ মেলে চাইলে অভাবই দেখতে পাওয়া যায়। একটা মানুষের হৃদয়বৃত্তির যত ভাগ আছে, তার একটা ভাগ যেন তাঁরা অনবরত পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছেন, সে যেন আর থামে না। ...শরৎচন্দ্র লক্ষ্য করেছিলেন, তরুণ সাহিত্যিকরা, অধিকাংশ জনসাহিত্যের নামে প্রচণ্ড-রকমভাবে অ-সাহিত্যিক কাজ করছেন, তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে নর-নারীর হৃদয়-বৃত্তির একটি বিশেষ দিকের অনাবৃত আলোচনায় নিরত হয়েছেন। স্বদেশের

প্রতি দায়িত্বশীল হয়েই শরৎচন্দ্র যেমন তাঁর গুরুদেবের তরুণ-সাহিত্যিকদের অভিযুক্ত করে নিরুৎসাহ করার প্রতিবাদ করেছিলেন। তেমনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে যখন জানলেন, তরুণদের হাতে বাংলা সাহিত্য কলুষিত হচ্ছে তখন তিনি নিজের ভুল বিনয়নম্রভাবে সর্বসমক্ষে স্বীকার করলেন।

এ থেকেই প্রমাণিত হয়, রবীন্দ্রনাথকে একাধিকবার আক্রমণ করলেও শরৎচন্দ্র কবির প্রতি কতখানি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। অবশ্য কবির মনোভাবও ছিল প্রীতিস্নিগ্ধ এবং উদার, বয়স্ক-অভিভাবকের মতো স্নেহশীল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে 'সুমন্দ-ভবনে'র জনৈক শ্রীমতী...সেন শরৎচন্দ্রকে একটি চিঠিতে লেখেন 'শেষ প্রশ্ন' নিয়ে লেখককে আক্রমণ করে শালীনতাবর্জিত ভাষায় যিনি সমালোচনা করেছেন সেই সমালোচককে তিনি চেনেন এবং লেখক তাকে ইচ্ছে করলে পদাঘাত করতে পারেন! তখন শরৎচন্দ্র সেই ভদ্রমহিলার চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথের মূল্যবান উপদেশ জানিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র লিখেছেন :

"তাঁর কাছে অনেক কিছু শিখেছি—কিন্তু সবচেয়ে বড় এ দুটি আর ভুলিনি।...কবি শান্তকণ্ঠে বলেছিলেন, 'যে অস্ত্র দিয়ে ওরা লড়াই করে, সে অস্ত্র স্পর্শ করাও যে আমার চলে না'।" আর একদিন এমনিই কি একটা কথায় উত্তরে বলেছিলেন—"যাকে সুখ্যাতি করতে পারিনে, তার নিন্দে করতেও আমার লজ্জাবোধ হয়।" গুরুদেবের এই উপদেশ তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে-ছিলেন। সেইজন্যই গুরুদেবের প্রতি তাঁর যেমন প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল তেমনি দাবিও ছিল। কবির তাঁর প্রতি সামান্যতম অবজ্ঞা বা অবহেলাকে তিনি সাধারণভাবে মেনে নিতে পারতেন না। রবীন্দ্রনাথ 'কালের যাত্রা' নামক একটি নাটিকা শরৎচন্দ্রের জন্মদিনে উৎসর্গ করেছিলেন। কবি লিখেছিলেন, ..."কালের রথযাত্রার বাধা দূর করবার মহামন্ত্র তোমার প্রবল লেখনীর মুখে সার্থক হোক এই আশীর্বাদসহ তোমার দীর্ঘজীবন কামনা করি।" কবি আরও বলেছিলেন, "আশা করি এ দান তোমার অযোগ্য হয়নি।"

কবির 'কালের যাত্রা' শরৎচন্দ্রকে উৎসর্গ করবার পেছনে একটি বিরাট অর্থ ছিল, তাঁর পূর্বোক্ত পত্রের ভাষাটিই তার প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের শত-বিরোধিতাতে এবং রাজনৈতিক উত্তেজনাতে কখনও আলোড়িত হননি। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর উক্তিই শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ মূল্যায়ন :—"শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙ্গালীর হৃদয়রহস্যে।...অন্য লেখকেরা অনেক প্রশংসা পেয়েছে, কিন্তু সর্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায়নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন, তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন।"

# শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য'

ডঃ প্রদ্যোত সেনগুপ্ত

আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ উপলক্ষে কেন্দ্রীয় তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ থেকে কিছুকাল আগে প্রকাশিত একটি সম্পাদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে—গ্রন্থখানিতে অন্তর্ভুক্ত তথ্যনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধাবলীর সংকলন একটি সামগ্রিক তাৎপর্যের মূল্যাবধারণায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। এই তাৎপর্য হল ভারতীয় নারীসমাজের যথার্থ অন্তঃস্বরূপের বস্তুনিষ্ঠ উপস্থাপনা এবং বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক, নৃতাত্ত্বিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে তার যথোচিত স্বরূপ বিশ্লেষণ। গ্রন্থটির সম্পাদিত 'ভূমিকা'য় বিষয়টির মূল্যমান নির্ণয়ের যে পন্থা উল্লিখিত হয়েছে—তা-ও অতিসাম্প্রতিক দৃক্‌কোণের বিচারে আধুনিক—"This volume, at least, shows that there is need for an ideology even in discussing women's role in India. Without such an exercise in thought, a careful weighing of alternative paths, alternative visions of the future—change can efface the past, but lead only to a contingent future, unoriginal and imitative of other cultures." সমাজ-পরিবার-অর্থনীতি ও নীতিতত্ত্বের পটভূমিতে বিশ্লেষিত ভারতীয় নারীত্বের স্বরূপ গ্রন্থখানিকে অভিনব ঔজ্জ্বল্য দিয়েছে। এই গ্রন্থে নারী-প্রগতিবিষয়ক চিন্তা-চর্চাকে অতিসাম্প্রতিক মূল্যায়নের প্রতিরূপ বলে ধরে নিয়ে তারই পটভূমিতে শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য' (১৯২৩) গ্রন্থটিকে বিচার করতে চাই। বিচারে একথাই অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হবে যে, এ গ্রন্থে শরৎ-মানস জীবনঘনিষ্ঠ এবং বাস্তববাদী। এ গ্রন্থে তিনি তাঁর ভাববাদী মনোভঙ্গীকে প্রশ্রয় দিলেও শাশ্বত ও চিরন্তন রূপের সন্ধানেই প্রাগ্রসর। বস্তুবাদী সমাজবিজ্ঞানীসুলভ দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র 'নারীর মূল্য' গ্রন্থখানিতে দেশ-কাল-পাত্রের পারস্পরিক সম্বন্ধের পটভূমিতে নারীত্বের সত্য উচ্চারণ করেছেন। এই গ্রন্থে উচ্চারিত 'নারীত্বের নির্বিশেষ সত্য' উপস্থাপনায় শরৎ-প্রতিভা নির্মোহ বিশ্লেষণক্ষমতা, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং দার্শনিক চেতনার সংগে হৃদয়ের আবেগ, করুণা ও সহানুভূতিকে অবিরোধে মিশিয়ে দিয়েছেন। শরৎ-চেতনায় নারীর মূল্য নির্ধারণে গ্রন্থখানির ভূমিকা অপরিসীম। শরৎচন্দ্র গ্রন্থখানির সমাপ্তিতে স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে নিজের বক্তব্য অভ্রান্ত-সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত করেছেন : "যাহা সত্য বলিয়া অকপটে বিশ্বাস করিয়াছি, নারীর মূল্য কেন হ্রাস পাইয়াছে এবং বাস্তবিক পাইয়াছে কিনা, এবং মূল্য হ্রাস পাইলে সমাজে কি অমঙ্গল প্রবেশ করে, এবং নারীর উপর পুরুষের কাল্পনিক অধিকারের মাত্রা বাড়াইয়া তুলিলে কি অনিষ্ট

ঘটে, তাহা নিজের কথায় ও পরের কথায় বলিবার চেষ্টা করিয়াছি—এইমাত্র। তাহাতে শাস্ত্রের অসম্মান করা হইয়াছে কি হয় নাই, দেশাচারের উপর কটাক্ষপাত করা হইয়াছে কি হয় নাই—এ কথা মনে করিয়া কোথাও থামিয়া যাইতে পারি নাই।" দীর্ঘকাল পূর্বে শরৎচন্দ্র এইভাবে নারীর সামাজিক সমস্যার তাৎপর্যবহ প্রসঙ্গের অবতারণা ও বিশ্লেষণ করেছিলেন 'নারীর মূল্য' গ্রন্থখানিতে। এ-কালের নারী-মূল্যাবধারণার পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি প্রয়োগ করে দেখানো যায়—শরৎ-মানসে এ-জাতীয় চিন্তাচেতনা বহু অগ্রগামী। 'Indian Women' গ্রন্থের Andre Betrille লিখিত 'The Position of Women in Indian Society' প্রবন্ধটিতে উল্লেখিত হয়েছে (পৃঃ ৬১) : "There is no dearth of discussion on what may be called the women's question in India. But, in the absence of systematic studies, this discussion often leads to opposite conclusions, and indeed, it often starts from opposite assumptions about the position of women in society...there are equally sharp differences of opinion about the changes taking place in the position of women in India. Some regard these changes as profound and pervasive, they point to the increasing participation of women in public life and to the changes introduced in their legal status. Others maintain that the position of women has changed very little and that Indian society continues by and large to be a male-dominated society." সামাজিক কারণে নারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অবস্থার অবনয়ন ঘটেছে, এবং এই কারণগুলি সৃষ্টি করেছে পুরুষশাসিত সমাজ। শরৎচন্দ্রের এই ভাবনাই বা ভাবনা-সূত্রই এ-কালেরও নিয়ামক : "..No proper solution can be found unless we view these questions in their proper sociological perspective. ..The position of women can change in a significant way only when this structure itself undergoes change." বাঙালী নারীর দুর্গতি অত্যন্ত আবেগ ও উৎসাহের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন বলেই সমাজ ও ইতিহাসের বাস্তব প্রেক্ষাপটে নারীর স্থান আলোচনায় শরৎচন্দ্র 'নারী মূল্যে' উৎসাহী। শরৎচন্দ্রের এ-জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সাধর্মের পরিচয় এ-কালীনই বটে : "..the sociological perspective requires us to pay attention to the position of women not merely as it is supposed to be in principle, but especially as it actually is in practice." উনিশ শতকের য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের প্রণীত সমাজবিজ্ঞান এবং নৃবিজ্ঞানের আলোকে শরৎচন্দ্র 'নারীর

মূল্য' গ্রন্থে মোটামুটিভাবে একথাই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন যে, এ-কালেই নয়, সর্ব যুগে এবং সর্ব দেশে অধিকতর শক্তিশালী পুরুষ অপেক্ষাকৃত দুর্বল নারীকে কোনদিনই স্বাতন্ত্র্য দিতে রাজী ছিলেন না। অর্থনৈতিক কারণ থেকে আগত সামাজিক অধিকারবোধের সূক্ষ্ম পার্থক্য, কালানুগত কুলাচারের শ্রেণী-বৈচিত্র্য ইত্যাদি আধুনিক সমাজবিকাশধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত নানা রূপের বস্তুগত সত্যকে শরৎচন্দ্র 'নারীর মূল্যে' হয়তো সম্পূর্ণরূপে বিধৃত করতে পারেন নি। এই জাতীয় বস্তুগত সত্যমূল্যগুলিকে সাম্প্রতিককালে নিম্নরূপে বিচার করা হয়ে থাকে—

ক "Those who write on the women's question generally come from a particular stratum of society, and are likely to be guided consciously or unconsciously, by the moral code of that stratum. We must remember that there is nothing final or absolute about this code. We cannot talk reasonably about the position of women in a particular section of society unless we view it in relation to its own moral code."

খ "An analysis of any important aspect of Indian social life will have to start with a consideration of regional differences. . . ." Corresponding to these factors, there are differences between them in material and non-material culture.

শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য' তাই একদিকে যেমন একালীন মূল্যায়নের সঠিক অগ্রবর্তীর ভূমিকা নিয়েছে—তেমনি কোন কোন দিক দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই এ-কালীন বিশ্লেষণ ও বস্তুধারণার স্বারূপ্য থেকে কিছুটা দূরবর্তী। কিন্তু 'নিকট' আর 'দূরের' মধ্যবর্তী সীমারেখায় এ গ্রন্থে আমরা সেই আবেগতপ্ত ও অশ্রু-পরিস্নাত শরৎচন্দ্রকে পাই—যিনি বাংলাদেশের পরিবারে ও সমাজে নারী-হিতৈষণায় চিন্তিত একজন চিন্তানায়ক।

বাংলা কথাসাহিত্যের জন্মলগ্ন থেকে একাল পর্যন্ত নারীচরিত্র ও নারীশক্তি একটি বিশিষ্ট চেতনা হিসেবেই পরিগণিত হয়েছে। পুরুষশক্তি আপাতদৃষ্টিতে কাহিনীর নিয়ামক হলেও নারীশক্তির প্রভাব ও পথ নির্দেশনা থেকে উত্তীর্ণ হতে তাঁরা পারেন নি। চর্যাপদে সাধকেরা নৈরাত্মাবধূতিকা রূপী নারীর প্রতি আসঙ্গ লিপ্সায় নির্বাণের মহাস্বাদ গ্রহণ করেছেন। ধর্মীয় কৃত্য ও মননের অচিন্ত্য ও অপ্রাকৃত স্বরূপ-পীঠ থেকে যখন সরে আসি—তখন স্বাভাবিক রস ভোগের দৃষ্টিতে শ্রীরাধিকা প্রেম ও সৌন্দর্যের আধারে নারী রূপেই ধরা দিয়েছেন। এই নারীশক্তির মধ্য দিয়েই রোমান্টিক আবেগ ও কল্পনা যেমনি তৃপ্ত হয়েছে—তেমনি প্রেমতত্ত্বের সহজ মানবিক

প্রতীতির উপলব্ধি ঘটেছে। আবার শাক্ত সাধনতন্ত্রেও সেই নারীশক্তিকেই আমরা কখনও বরাভয় দাত্রী ভীমা-ভয়ঙ্করী রূপে আবার কখনও 'মাতৃ রূপেন সংস্থিতা' হিসেবে দেখেছি। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারের চিন্তায় বাঙালী নারী-শক্তির অগ্রাধিকার ও তৎসম্বন্ধে তাঁদের আত্মিক ধ্যান-ধারণার প্রসংগ নতুন করে স্মরণ করবার হয়তো প্রয়োজন নেই। সাহিত্য ও সামাজিক আন্দোলনে নারীর ভূমিকা বিশেষভাবে স্বীকৃত হল। নারী চেতনার ক্ষেত্রে বাংলাকাব্যে নতুন ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করলেন মধুসূদন। বঙ্কিমচন্দ্রের অভিজাত শৈল্পিক মননের ক্ষেত্রেও নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবেই চিহ্নিত। রবীন্দ্র-শিল্প ধারণায় নারীমুক্তি একটি পরমতম পাঠ। নারীর অন্তর্নিহিত শক্তিরূপা ও সৌন্দর্যলীনা শক্তিকে মংগল-বিভাসিত ঔজ্জ্বল্যে তিনি সার্বকালীন রসতাৎপর্য দিয়েছেন। সেকালের কলকাতার সামাজিক মনোজীবনেও নারী চেতনার অনুকূলে কিছু আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল। সনাতন হিন্দু সমাজের সংগে ব্রাহ্মসমাজের মানস-বৈপরীত্যের পশ্চাৎপটে স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, বিধবা-বিবাহ বা অসমবিবাহের প্রশ্নগুলি অনস্বীকার্য ছিল না। কলকাতার নাগরিক সমাজ নারীমুক্তিজনিত এই আন্দোলনে একেবারে উদাসীনের ভূমিকা পালন না করলেও গ্রাম-বাংলায় সেদিন সেই মুহূর্তে তার কোন ধ্বনি-প্রতিধ্বনি শোনা যায়নি। আবার শতাব্দী-কাল প্রচলিত নারীর নৈতিক ও নৈষ্ঠিক স্বীকৃত নিরাপদ মানদণ্ডের মধ্যেও বড় রকমের কোন মৌলিক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনও সূচিত হয়নি। সামান্য অধিকারের প্রশ্ন সাব্যস্ত হয়েছে মাত্র। শরৎচন্দ্র নাগরিক জীবন ও গ্রাম-বাংলা উভয় ক্ষেত্রের নারীর দিকেই তাকালেন। শরৎচন্দ্রের নাগরিক বিবেক এটুকু অভ্রান্তরূপে উপলব্ধি করল যে, প্রকৃত প্রস্তাবে নারীসমাজ বলে কোন স্বয়ংস্বতন্ত্র সমাজরূপ তখনও গড়ে ওঠেনি। নারীর ক্ষেত্রে শতাব্দী প্রচলিত নীতি-নিয়ম ও অনুশাসনেরই ধারা বহমান। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কৃচ্ছ্রতার জটিলতায় বরং নারীসমাজের কল্যাণ-অকল্যাণের ধারণা আরও কিছুটা সংশয়ে অস্বচ্ছ হয়ে পড়েছে।

নারীর অন্তশ্চারিণী নির্বাক ভাবমূর্তি ছাড়াও আলোকিত পৃথিবীর সামনে আর একটি বিশেষ ব্যক্তিত্বের স্বরূপ আছে। সেখানে সে গতানুগতিকতার সামনে প্রশ্নমনস্কা, জড়ত্ব-বিরোধী। শরৎ-মানসে বিশেষ স্থান-কালের প্রভাবে নারীর এই রূপের উপলব্ধি সম্ভবপর হয়েছিল ব্রহ্মপ্রবাস কালে। সেখানকার নারীসমাজের সংগে বাংলাদেশের নারীমূর্তির লক্ষণীয় পার্থক্য হয়তো যৌবনের সেই প্রারম্ভকালেই তাঁর চেতনাকে আন্দোলিত করেছিল। শরৎচন্দ্রের শিল্পীস্বভাবেও সেই অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ মুদ্রাঙ্কণ হয়ে গিয়েছিল। নারীর সামাজিক অধিকারবোধের যৌক্তিকতার সংগে অপার

সহানুভূতি ও আবেগের বাঞ্ছিত রসসমন্বয় ঘটেছিল। শরৎচন্দ্রের নারী সম্পর্কিত আবেগ ও বেদনা বিচারের চেয়েও উপলব্ধির দিকেই আমাদের টেনেছে বেশী। আবেগের সহমর্মিতা দিয়ে যে নারীচেতনার নির্বিশেষ রূপের তিনি নির্মাতা—সেখানে প্রাদেশিক ভিন্নভাষী মানুষের আত্মিক উপলব্ধিকেও শরৎচন্দ্র স্পর্শ করেছেন। এই আবেগধর্মী মনোভূমিতেই নারীর নিগৃহীত জীবনের কারুণ্যকে লালন করেছেন এবং কথাসাহিত্যে তার শিল্পরূপকে পরিস্ফুট করেছেন। কাহিনীগুলির পরিকল্পনায় তাই নেপথ্য পরিবেষ্টনী-রূপে সমাজ-ইতিহাস এবং নীতিগত প্রসঙ্গ এসেছে। এইসব প্রসঙ্গের বাস্তব অনিবার্যতার ভিত্তিতে তাঁর চেতনায় বিশ্লেষিত হয়েছিল বলেই তিনি বলতে পেরেছিলেনঃ "পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়, এই কথাটা একদিন আমি বলেছিলাম। সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়। পূর্বেও ছিল না—পরেও হয়তো একদিন থাকবে না। একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, এ কথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায় ত এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়?" অভয়া, কিরণময়ী ও কমলের মধ্য দিয়ে যে বিপ্লবাত্মক নারীচেতনার মতবাদ ব্যক্ত তা শরৎ-মানসের এই ঐতিহ্য থেকেই আগত। শুষ্ক মনের তাত্ত্বিকতার চেয়ে খোলা চোখে দেখা ও আবেগ-আপ্লুত রসময়তার মধ্য দিয়ে তার ভাবপ্রতিমা আঁকতে চেয়েছেন বলেই শরৎ-মানসে সেই নারী বিভিন্না ও বিচিত্ররূপিণী। কন্যা-প্রেয়সী-জননী-ভর্তৃহীনা-স্বাধীনভর্তৃকা—সকল নারীই তাঁর সহানুভূতির পাত্রী। শরৎচন্দ্র নারীচেতনার রূপায়ণে তাই দুই বিপরীত মেরুকে আপন শিল্পীসত্তার নির্দিষ্ট মানদণ্ডে বেঁধেছেন। বিদ্রোহের অগ্নিবাণী ও সনাতনী আদর্শের অনুসরণে তাঁর নারী চরিত্রগুলি ঐশ্বর্যে প্রাণময়ী হয়ে উঠেছে। সংসারের সীমানার মধ্যে সুখে-দুঃখে ও সহজ দেনা-পাওনায় বিবর্তিত হয়ে তাঁর চেতনায় একশ্রেণীর নারী সনাতনী আদর্শে নিবেদিতা। অন্নদাদিদির চরিত্র এই মহিমায় প্রদীপ্ত। জ্বলন্ত অগ্নিশিখারূপিণী কিরণময়ীর পাশে সুরবালা চিরস্বীকৃত নীতিতে আত্মতৃপ্তা। একান্নবর্তী পারিবারিক জীবনের স্নেহবাৎসল্যে মধুরা নারী নারায়ণী, বিন্দু, হেমাঙ্গিনী। নাগরিক সমাজের ব্যক্তিত্বময়ী ও স্বাতন্ত্র্যবাদিনী নারীকে তিনি দেখেছেন ললিতা-বিজয়া-সরোজিনী ইত্যাদি চরিত্রে। চরিত্রগুলি স্বাতন্ত্রিকতা-চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও বাঙালী নারীর লজ্জা-অভিমান এবং আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত নয়। কতকগুলি নারী-চরিত্র কল্পিত হয়েছে সমাজ-নিষিদ্ধ প্রেমের বেদনা ও অভিশপ্ত রূপের পটভূমিতে। সমাজের হৃদয়হীন অবিচারের বিরুদ্ধেও সেই নারীপ্রেম হেয় নয়। রমা-রাজলক্ষ্মী-সাবিত্রী এ ক্ষেত্রে স্মরণীয়া। আবার কোন কোন নারী প্রেমের দুর্জয় আত্ম-ঘোষণায় মুখরা। প্রেম ও বিবাহের অন্তর্নিহিত অসংগতির বিরুদ্ধে এ

নারীরা বিদ্রোহিণী। এই শ্রেণীর নারীর প্রতিরূপ হিসেবে আমরা স্মরণ করবো অভয়া-কিরণময়ী ও কমলকে। নারী-জীবন ও তার প্রকাশরূপের নানা স্পন্দন শরৎচন্দ্রকে উদ্দীপ্ত ও কৌতূহলী করেছিল বলেই নারী-জীবন সম্বন্ধীয় নানা পীড়িত প্রশ্ন ও ক্ষুদ্র জিজ্ঞাসা শরৎমানসকে অধিকার করেছে এবং কথাসাহিত্যে তার রসতাৎপর্য দান করেছেন তিনি। আবার কোথাও শরৎচন্দ্র এই নারীস্বরূপ উদ্ঘাটনায় শিল্পীসত্তার চেয়েও তাত্ত্বিকের ভূমিকায় অধিকতর সার্থকতা পেয়েছেন।

( ৩ )

শরৎচন্দ্রের নারীচেতনার এই মৌলিকতা তত্ত্বে-ভাষ্যে ও ঐতিহাসিকের নির্মোহ দৃষ্টিতে উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধ গ্রন্থখানির মধ্যে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর নিয়ন্ত্রণ ও বস্তুমুখীন চিন্তা-চেতনা গ্রন্থখানির মধ্যে বিশেষভাবে বিধৃত। নারী-সম্বন্ধীয় শরৎচেতনার নেপথ্য প্রকৃতি-স্বরূপ হিসেবেও গ্রন্থখানির অনন্য মর্যাদা আছে। 'নারীর মূল্য' গ্রন্থে তাই বিশ্লেষণের কলম হাতে নিয়েও শরৎচন্দ্র প্রাণের আকূতিতে ভরপুর। গ্রন্থটির বক্তব্যের মধ্যে ক্ষোভ-ক্রোধ, দুঃসহ জ্বালা ও ঘৃণা মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া রূপেই শরৎচন্দ্রের মৌল চিন্তা-বৃত্তের সংগে লালিত হয়েছে। নারী-চরিত্রের পরিণামের যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ের অভিপ্রায়ে এ গ্রন্থে চিন্তানায়ক শরৎচন্দ্র বিপুল অধ্যয়নের বহু পরিচয় দিয়েছেন। বিষয়ানুসারী তথ্যসংগ্রহ ও সিদ্ধান্তের অনুকূলে যে-ভাবে সেই চিন্তা-সমৃদ্ধিকে তিনি প্রয়োগ করেছেন—তা সত্যিই বিস্ময়বহ। সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, নীতিবাদ ও মনস্তত্ত্বের পারম্পর্যের মধ্য দিয়ে বিশ্লেষিত হয়ে বিষয়টির গাম্ভীর্য আমাদের প্রচণ্ড মনঃসংযোগ দাবী করে। কাহিনী-কল্পনায় নিগৃহীত নারী-জীবনের বেদনার প্রতিরূপ পরিস্ফুটনে তিনি যে দরদী সিদ্ধ শিল্পী ছিলেন—এ-কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু এর পশ্চাতে এক বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর নিয়ত-অনুশীলন ছিল। কথিত আছে, রেঙ্গুনে বাসকালীন সময়ে নারী-জীবনের বিশেষতঃ পতিতাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক দিকগুলির পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে সরেজমিনে তদন্তে নেমেছিলেন শরৎচন্দ্র। সমাজের অনালোকিত নানা স্থান থেকে এই কুলত্যাগিনীদের ভ্রষ্ট জীবনের কারণ সন্ধানে বা ইতিহাসসংগ্রহে রত হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গৃহদাহে সংগৃহীত তথ্যের পাণ্ডুলিপি ভস্মীভূত হয়। 'নারীর মূল্য' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গেরই স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে: "বাস্তবিক, যাচাই না করিয়া শুদ্ধ একটা কাল্পনিক উত্তর দিবার চেষ্টা করিলে তর্কই চলিতে থাকিবে। কিন্তু যাচাই

করিয়া দেখিলে কি জবাব পাওয়া যায়, তাহাই দেখাইতেছি। বারো-তেরো বৎসর পূর্বে জনৈক ভদ্রলোক এই বাঙলাদেশে কুলত্যাগিনী বঙ্গরমণীর ইতিহাস সংগ্রহ করিতেছিলেন। তাহাতে বিভিন্ন জেলার বহু সহস্র হতভাগিনীর নাম, ধাম, বয়স, জাতি, পরিচয় ও কুলত্যাগের সংক্ষিপ্ত কৈফিয়ত লিপিবদ্ধ ছিল। বইখানি গৃহদাহে ভস্মীভূত হইয়াছে—বোধকরি, ভালই হইয়াছে। সুতরাং কেহ সঠিক প্রমাণ চাহিলে দিতে পারিব না সত্য, কিন্তু ইহার আগাগোড়া কাহিনীই আমার মনে আছে। আমি হিসাব করিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম যে, এই হতভাগিনীদের শতকরা সত্তর জন সধবা। বাকী ত্রিশটি মাত্র বিধবা।"

'নারীর মূল্যে' গ্রন্থখানিতে শরৎচন্দ্র সমাজদৃষ্টিরর মর্মের সন্ধান দিতে সমর্থ হয়েছেন। তাই সমস্যার কেন্দ্রেও উপনীত হতে পেরেছেন অতিসহজেই। ভারতীয় সামাজিক প্যাটার্নে পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থাই প্রকারান্তরে শরৎচন্দ্র বহু তথ্যের সন্নিবেশে ও যুক্তি পারম্পর্যের গ্রন্থনায় ব্যাখ্যা করেছেন। ভারতীয় সামাজিক প্যাটানে' পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থাই প্রকারান্তরে নারীর অবমূল্যায়নের জন্য দায়ী। পুরুষের স্থূল স্বার্থপরতা ও ভোগস্পৃহা ভারতীয় সমাজে নারী-নির্যাতনের মূল কারণ। পুরুষের এই আত্যন্তিক স্বার্থপরতাই নারীকে কখনও বা দেবীত্বের পর্যায়ে উন্নীত করে দিয়েছে। 'পূজার্হা নারীর এই পূজার ব্যবস্থা'র অন্তর্লীন কার্যকারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'চার পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বেকার লুপ্ত আইন-কানুনের একটা ধারায় সামাজিক ব্যবস্থা' যেভাবে উল্লিখিত আছে তার ব্যাখ্যা যেমন করেছেন—তেমনি প্রাচীন বেবিলন, য়ুরোপে প্রচলিত রীতির ও লোকাচারের পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষ-নারীর তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছেন। এ-ক্ষেত্রে পুরুষকে উদ্দেশ্য করে শরৎচন্দ্রের খানিকটা ব্যঙ্গাত্মক মনোভংগীও প্রকাশিত হয়েছেঃ "তবে কোথাও বা বাহিরের চাকচিক্য আছে স্বীকার করি, এবং কোথাও বা ভিতর হইতে সংশোধনের চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু সে সংশোধনের ভার লইয়াছে নারী। পুরুষ উপযাচক হইয়া কোনদিন ভালো করিতে আসে নাই, কোনদিন আসিবেও না। যিনি বড় ভাল, তিনি দয়া করিয়া বই লিখিয়া গিয়াছেন।" শরৎচন্দ্রের মতে যদি কোন দেশে রমণী যথার্থ সম্মানে শ্রদ্ধালাভে সমর্থ হয়ে থাকেন—তবে তা তাঁদের নিজেদের চেষ্টাতেই সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রসঙ্গেও 'নারীর মূল্য' গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের অকুণ্ঠ বক্তব্যের পরিচয় পাইঃ "আমাদের এ-দেশেও একদিন এ চেষ্টা হইয়াছিল, যখন নারী বেদ রচনা করিবারও স্পর্ধা রাখিত। এখন তাহা স্পর্শ করিবার অধিকার পর্যন্ত তাহার নাই। যখন নারী পুরুষের মুখের দেবী সম্বোধন শুনিয়া গলিয়া পড়িত না, সে মুখের কথা কাজে পরিণত করিতে বাধ্য করিত, তখন ছিল নারীর মূল্য।" শরৎচন্দ্র যথার্থ

সমাজবিজ্ঞানী ও নৃতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতেই নারীর যথার্থ মূল্যায়নপ্রসঙ্গে সাধারণীকরণ করেছেনঃ "প্রায় কোন দেশেই পুরুষ নারীর যথার্থ মূল্য দেয় নাই এবং তাহাকে নির্যাতন করিয়াই আসিতেছে।" নারীকে ভোগের বাস্তব উপকরণ হিসেবে ও সখের উপাদান হিসেবে সেই আদিম যুগে ব্যবহার করত। শরৎচন্দ্রের ভাষায়—'তাহার সখের কাছে, তাহার স্ত্রী লাভের প্রয়োজনের কাছে সে কিছুই বিচার করিত না, কোন সম্বন্ধই তাহাকে বাধা দিতে পারিত না।' অতি-সভ্য সমাজের বিচিত্র ও বীভৎস জীবনাচরণের অবিশ্বাস্য তথ্য এ প্রসঙ্গে তুলে ধরেছেন শরৎচন্দ্র তাঁর 'নারীর মূল্য' গ্রন্থে—"অসভ্য ছিপিওয়েনর জননীকে বিবাহ করে। অর্ধসভ্য আফ্রিকার গেবুন (Gaboon) প্রদেশের রাণী কিছু দিন পূর্বে স্বামীর মৃত্যুর পর রাজ্য হারাইবার আশংকায় নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিবাহ করিয়া সিংহাসনের দাবী বজায় রাখিয়াছিলেন। পারস্যের সম্রাট আর্টজারাক্সস্ নিজের রূপবতী দুই কন্যারই পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুসভ্য প্রাচীন মিশরের ফারাওরা সহোদরাকে বিবাহ করিতেন। সভ্য পেরু প্রদেশের রোক্কা ইঙ্কার বংশধর ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম ইঙ্কা আভিজাত্য বজায় রাখিবার জন্য দ্বিতীয় পুত্রের সহিত কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিয়া সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। বশিষ্ঠ ঋষিও তাঁহার ভগিনী অরুন্ধতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। লঙ্কা দ্বীপের অসভ্য ভেদ্দারা ছোট বোনকে বিবাহ করা সবচেয়ে গৌরবের ব্যাপার বলিয়া মনে করে।" নারীকে নিয়ে ঘরে-বাইরে এই টানাটানির এই যে পুতুলখেলা—এটা পরিষ্কার করে বোঝাতে চেয়েই শরৎচন্দ্র উপেক্ষিতা নারীর নানা দেশের বিড়ম্বনার চিত্র তুলে ধরেছেন। বর্ণনার উপস্থাপনা নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক—কিন্তু কৌতূহল-উদ্দীপনামাত্রই শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্য নয়। পুরুষের এই উচ্ছৃংখলতা ও উন্মত্ততা শুধুমাত্র নারীকেই অবদমিত ও অবনমিত করেনি—সেসঙ্গে গোটা সমাজকে ও মাতৃভূমিকেও সে টেনে নামিয়েছে। নারীদরদী শরৎচন্দ্র জাতির ও জীবনের নারীরূপা ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে স্পষ্টতই উচ্চারণ করেছেনঃ "নারী যেখানে উপেক্ষার পদার্থ, জাতির মেরুদন্ড স্বরূপ শিশুরাও সেখানে উপেক্ষা অবহেলার জিনিস। এ কথার সত্যতা উদাহরণ দিয়া প্রমাণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।" সমাজে নারীর ভূমিকা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র দাম্পত্য সম্বন্ধের উপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কেননা-"জীবমাত্রেরই সমস্ত সম্বন্ধ হইতে ইহার আকর্ষণও যেমন দৃঢ়তর, স্পৃহা ও মোহও তেমনি দীর্ঘকালব্যাপী। আমাদের দেশের বিজ্ঞজনেরাও বলিয়াছেন, ছয়টা রসের মধ্যে মধুররসটাই শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠ রসের উৎপত্তি মানবের যৌন বন্ধন হইতে।" বিধিনিষেধের সমস্ত শৃংখল নারীদেহে পরিয়ে পুরুষ সমাজ যদি আপন সুখ্যাতির স্বয়ংসিদ্ধ প্রচারকেই একমাত্র সত্য বলে দাবি করে, তবে তাতে সুফল ফলবে বলে শরৎচন্দ্র মনে করেন না। সমাজে নারী ও পুরুষ

উভয়ের নির্দিষ্ট কর্তব্য পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে, সহমর্মী সচেতন বোধের মধ্য দিয়ে পালন করলেই সর্বাঙ্গ সুন্দরের সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

শরৎচন্দ্র সামাজিক প্রশ্নের গুরুত্বকে Ethics-এর মানদন্ডে বিচার করেছেন এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে নারীর মূল্যকে তৌল করেছেন। বিসদৃশ হেতু না থাকলে মানুষ তার স্বাধীনতাকে ততদূর টেনে নিয়ে যেতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা অপরের তুল্য স্বাধীনতায় আঘাত হানে। মানুষের সমস্ত কার্যাবলী যদি এই মূল্যায়নের মানদন্ডে নির্ণীত হয়—তবে যে-কোন সামাজিক প্রশ্নের স্থান সংকুলান তার মধ্যে সার্থক। যে সমাজ এই নির্দেশকে যত অস্বীকার করে, সেই সমাজ নারীশক্তিকে ততখানি নত করে।

( ৪ )

ইতিহাস ও সমাজবিবর্তনের দৃষ্টিকোণে নারীর সামাজিক ও ব্যক্তিগত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যুক্তির গুরুত্ব স্বীকার করেও 'নারীর মূল্য' গ্রন্থে শরৎচন্দ্র হৃদয়াবেগের ব্যাকুলতায় উৎকণ্ঠিত। হৃদয়-সংরাগ ও মর্মের অনুভূতি যে গ্রন্থ-খানির রচনারীতির নিয়ন্ত্রণ করেছে—এ-কথা অস্বীকার করা চলে না। সুনির্দিষ্ট ও অর্থব্যাপ্তিতে প্রসারিত তাৎপর্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েই শরৎচন্দ্র আলোচ্য গ্রন্থে চিন্তানুক্রমকে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন—পুরাতন পৃথিবীর ইতিহাসের সংকেত ও তারই পটভূমিকায় সমাজব্যবস্থার উপস্থাপনা, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় য়ুরোপের সমাজে নারীর ভূমিকা এবং সর্বশেষে প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় নারীর পারিবারিক ও সামাজিক অধিষ্ঠানের স্বরূপ। মধ্যযুগে নারীর অবস্থা সর্বাপেক্ষা মর্মন্তুদ—তখন সে পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পদমাত্র। অসম বহুবিবাহ, সহমরণ, বৈধব্য ও পতিতা-বৃত্তি—নারী-জীবনের দুর্গতিকে লোকাচারের এই জাতীয় বহু অসঙ্গতির মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র বিশ্লেষণ করেছেন। নারীর সতীত্বের চরম পরিচয় দাঁড়িয়েছিল 'সহমরণে'। স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সদ্যবিধবাকে কিভাবে 'সিদ্ধি ও ধুতুরা পান' করিয়ে মাতাল করে দিয়ে সহমৃতা করা হত—তার বেদনাতুর চিত্র এঁকেছেন শরৎচন্দ্র: "শ্মশানের পথে কখন-বা সে হাসিত, কখন কাঁদিত, কখন-বা পথের মধ্যেই ঢুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িতে চাহিত।......এই তার সহমৃতা হইতে যাওয়া!" অত্যন্ত ব্যঙ্গবিদ্ধ কন্ঠেই শরৎচন্দ্র উচ্চারণ করেছেন, যে দেশে টোল প্রতিষ্ঠা করে মহামহোপাধ্যায়েরা সাংখ্যবেদান্ত পড়ান, যে দেশে জন্মান্তরবাদ প্রচলিত, কর্মফলে জীবন-পরিণাম যেখানে নির্ধারিত হয়, দেবযান ও পিতৃযানে যে দেশ জীবনপথ নির্দেশনা লাভ করে—সে-দেশে প্রচলিত সহমরণ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের বিস্ময়াবহ জিজ্ঞাসা স্বাভাবিকভাবেই উত্থিত হয়েছে: "পৃথিবীতে কর্মফল যাহার যাহা হোক, দুইটা প্রাণীকে

একসঙ্গে বাঁধিয়া পোড়াইলেই পরলোকে একসঙ্গে বাস করে—এ-কথা স্বীকার করা আমার পক্ষে কঠিন।" এই আলোচনারই জের টেনে শরৎচন্দ্র দীর্ঘশ্বাস মোচন করেছেন—'যাহাই হোক, নারীর জন্য সতীত্ব, পুরুষের জন্য নয়।' নারীজাতির অশেষ দুঃখার্তি প্রসঙ্গেই শরৎচন্দ্র যে ভাষ্যপাঠ করেছেন—তার বাইরে রঙ্গের প্রলেপ, কিন্তু ভিতরে ব্যঙ্গের প্রবাহ : "এক স্ত্রী জীবিত থাকিতেও পুরুষ ঘরের মধ্যে আরও একশত স্ত্রী আনিয়া উপস্থিত করিতে পারে, কিন্তু দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা বিধবা হইলেও তাহাকে দেবী হইতেই হইবে, এই ব্যবস্থা এদেশের সমস্ত নারীজাতিকে যে কত হীন, কত অগৌরবের স্থানে টানিয়া আনিয়াছে, সে কথা লিখিয়া শেষ করা যায় না।" পুরুষের আত্মনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছাকে নারী এদেশে ইচ্ছা বলে ভুল করে, এবং ভুল করে সুখী হয়। শরৎচন্দ্রের মতে এতে নারীর গৌরব বাড়লেও পুরুষের অগৌরব অপ্রমাণিত থাকে না। শাস্ত্রের চেয়েও নূতন পন্থাবলম্বনে নারীর মূল্যায়নের কথাই শরৎচন্দ্রের সিদ্ধান্ত। 'দেশের কথা তুলতে সাহস হয় না বলেই', 'বিদেশের কথা' তুলে শরৎচন্দ্র নারীত্বের আর একটি অশ্রুক্ষরা পরিণতি প্রসঙ্গে 'নারীর মূল্য' গ্রন্থে বলেছেন—"বিলাতের একজন বড় দার্শনিক বলিয়াছিলেন—দাসব্যবসায় যেমন 'sum of all villainy', বেশ্যাবৃত্তিও তেমনি 'sum of all degradation'; শরৎচন্দ্র ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে, শতকরা সত্তরজন হতভাগিনী গ্রাসাচ্ছাদনের অভাবে, আত্মীয়-স্বজনের উপেক্ষা ও অবজ্ঞার তাপে গৃহত্যাগিনী হন এবং তাঁদের মধ্যে বিধবা অপেক্ষা সধবার সংখ্যাই অধিক। দারিদ্র্য এবং উৎপীড়নে গৃহাভ্যন্তরে নারীর শুভবুদ্ধিকে বিকৃতির পীড়নে অতিষ্ঠ করে ও অন্যদিকে তাকে আপাতমধুর সুখের প্রলোভনে প্রতাড়িত করে ঘরের বাইরে নিয়ে আসে। শক্তিশালী পুরুষ দুর্বল নারীকে কোনদিনই স্বাতন্ত্র্য দিতে চাননি। সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের সহযোগে মানবজাতির বিকাশধারার বিশ্লেষণরীতি তখনও শৈশব অতিক্রম করেনি, সম্পূর্ণ স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যে উপনীত হয়নি। অর্থনৈতিক কারণ, শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী, অধিকার চেতনা ইত্যাদি বস্তুগত পূর্বসূত্রের আয়তনে 'নারীর মূল্য' আজকের দিনের সামাজিক সমস্যা নির্ধারণে হয়তো প্রশ্নাতীত নয়। শরৎচন্দ্রের মন এখানে বস্তুগত হয়েও ব্যথা-বেদনার কারুণ্যে সিক্ত—অন্তরপরিচয়ের প্রবলতায় বাঙ্ময়। ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ পর্যায়ের উপস্থাপনা আছে—কিন্তু ইতিহাসের ধারাবাহিক অন্তঃসংগতির সঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টির গূঢ়ৈষণা তাঁর চিন্তাশক্তিকে শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করেনি। নিয়ন্ত্রণ করেছে অন্তঃশীল হৃদয়ের অতলান্ত সহানুভূতি।

অতিথিসৎকারে স্ত্রী-কে বিলিয়ে দেওয়া এ-দেশের একপ্রকার উচ্চপর্যায়ের ধর্ম বলে স্বীকৃতি পেয়েছিল। শরৎচন্দ্র তুলনাক্রমে আফ্রিকা ও আমেরিকার

অসভ্য জাতির মধ্যে প্রচলিত এরূপ রীতির উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র 'বিল্বমঙ্গল' নাটকখানির নামোল্লেখ করেছেন: "বহুদিন হইতে ইহা প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতেছে। বাঙালী আপত্তি করে না, কারণ ইহাতে ধর্মের কথা আছে। সহস্র লোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বণিক লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দিয়া নিজের সহধর্মিণীকে লম্পট অতিথির শয্যায় প্রেরণ করে।...স্ত্রী তোমার সম্পত্তি, তুমি স্বামী বলিয়া ইচ্ছা করিলে এবং প্রয়োজন বোধ করিলে তাহার নারীধর্মের উপরও অত্যাচার করিতে পার, তাহাকে রাখিতেও পার, মারিতে পার, বিলাইয়া দিতেও পার,—তোমার এই অনধিকার, এই স্বেচ্ছাচার তোমাকে এবং তোমার পুরুষজাতিকে হীন করিয়াছে, এবং তোমার সতী স্ত্রীকে এবং সেইসঙ্গে সমস্ত নারীজাতিকে অপমান করিয়াছে।"

খ্রীষ্টধর্মেও হিন্দুধর্মের মতোই স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনকে চিরকালীন বলে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু ধর্মীয় বিধান ও কৃত্য লঙ্ঘন করে সেখানেও ডিভোর্স-রীতি প্রচলিত হল। ডিভোর্স-এর মধ্য দিয়ে নারীর যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য তাকে সর্বতোভাবে শরৎচন্দ্র মেনে নেননি। তথাপি শৃঙ্খলমোচনের এই পথটি বিষয়েও তিনি সেই কালে এবং সেই যুগেও কতোখানি ভাবিত ছিলেন 'নারীর মূল্যে' সে পরিচয় আছে। মধ্যযুগের অকথ্য হীনতার মধ্যে পড়ে পাশ্চাত্ত্য দেশে নারীচৈতন্যে এই শৃঙ্খলমোচনের প্রশ্ন অনিবার্য হয়েই দেখা দিয়েছিল। এ বিষয়ে নিজের চিন্তা ও ভারতীয় নারীর ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ বিষয়ে শরৎচন্দ্র বলেছেন: "কিন্তু তাই বলিয়া আমাকে যেন এমন ভুল বুঝা না হয় যে, আমি ডিভোর্স বস্তুটাকেই ভালো বলিতেছি...কিন্তু স্ত্রী-ত্যাগ বলিয়া একটা ব্যাপার যখন আমাদের মধ্যে আছে, তখন উভয় পক্ষেই ও জিনিসটা কেন থাকা উচিত নয়, তাহা বলিতে পারি না।"

'নারীর মূল্যে' গ্রন্থে এইভাবেই বাঙালী নারী তথা ভারতীয় নারীর সম্পূর্ণ সমাজচিত্র উদাহৃত হয়েছে। তা যেমন মৌন সহানুভূতির রসে আর্দ্র—তেমনি প্রগতি-ভাবনায় ব্যঙ্গে-কটাক্ষে পূর্ণ, প্রয়োজনে তীক্ষ্ণ-তির্যক মন্তব্যের শাণিত বক্তব্যে সংগঠনশীল চিন্তায় তিনি ভাবিত। শরৎ-সাহিত্যের নারীচরিত্রের স্বরূপ ও তার বিশ্লেষণের আকর গ্রন্থ হিসেবে 'নারীর মূল্য' গ্রন্থখানি গৃহীত হতে পারে। নারীদরদী শরৎচন্দ্রের আপন হৃদয়-রূপের দ্বিতীয় দর্পণ হিসেবেও গ্রন্থখানির মূল্যায়ন সম্ভবপর। এই গ্রন্থে ব্যক্ত চিন্তাধারাকে একালের নারীপ্রগতি এবং চিন্তাসূত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মেলাবার অসমীচীন প্রত্যাশা আমরা করবো না। আবার মেলাতে গিয়ে আমাদের আশ্চর্যান্বিত সত্তা শরৎ-বিশ্লেষিত এমন কোন ইঙ্গিত বা সূত্রের সন্ধান পেতে পারে যা একালেও সমসূত্রেই প্রযোজ্য। চিন্তানায়ক শরৎচন্দ্রের দূরদৃষ্টিও 'নারীর মূল্য' গ্রন্থখানির আর একটি লক্ষণীয় ও আস্বাদ্য দিক।

# শরৎচন্দ্রের 'বিপ্রদাস'

### অচ্যুত গোস্বামী

মহৎ লেখকের অসার্থক সৃষ্টির প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। যাঁকে ভালবাসি তার চরিত্রের কোন একটি দুর্বলতাকে যেমন আমরা দেখেও দেখতে চাই না, অসার্থক রচনাতেও লেখকের রচনারীতির প্রিয় বিশেষত্বগুলি মনকে আকৃষ্ট করে: চরিত্রচিত্রণে পরিচিত বক্রতাগুলি মনে প্রত্যাশা জাগ্রত করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন সেই প্রত্যাশার পূরণ হয় না, কাহিনী যখন কোন পরিপূর্ণ রসমূর্তি ধারণ না করেই পরিসমাপ্তি লাভ করে, তখন মনে এক ধরনের নৈরাশ্যের ব্যথা অনুভব না করে পারা যায় না। এমন কি অনেকখানি মূল্যবান প্রয়াসের অপব্যয় করা হয়েছে বলে প্রিয় লেখকের বিরুদ্ধে মনে খানিকটা ক্ষোভও জন্মাতে পারে। কিন্তু সেই ক্ষোভকে আমরা বাইরে প্রকাশ করতে চাই না বলেই অসার্থক রচনার প্রসংগ যথাসাধ্য এড়িয়ে চলি। এই ক্ষোভ কিন্তু অযৌক্তিক। জানতে পারলে প্রিয় লেখক অনায়াসে বলতে পারেন, আমার সব লেখাই প্রথম শ্রেণীর সার্থক রচনা হবে, এমন কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে কি আমি সাহিত্যরচনা শুরু করেছিলাম? আমার কি পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার থাকতে পারে না? আমার কি মানসিক ক্লান্তিবশত অমনোযোগ আসতে পারে না? মেশিনে তৈরি সব পুতুলই একরকম হয়। হাতে তৈরি পুতুলের মধ্যে দুটো-একটা ট্যাঁড়া-বাঁকা হওয়া কি স্বাভাবিক নয়?

কথাগুলো মনে আসছিল শরৎচন্দ্রের শেষ জীবনের রচনাগুলির কথা ভাবতে গিয়ে। তাঁর শেষ জীবনে রচিত উপন্যাস তিনখানি—শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব, বিপ্রদাস এবং শেষের পরিচয় (অসম্পূর্ণ)। এই বই তিনখানি নিয়ে পাঠক এবং সমালোচক মহল বহুধা-বিভক্ত। যাঁরা শরৎচন্দ্রের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার বিশেষ অনুরক্ত তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে, ১৯১৭-তে প্রকাশিত চরিত্রহীন উপন্যাস প্রকাশ থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্র একের পর এক উপন্যাসে আমাদের রক্ষণশীল, অসাম্য- ও অবিচার -পূর্ণ সমাজব্যবস্থার এবং নীতিবোধের বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করেছেন। কিন্তু শেষপ্রশ্ন প্রকাশের পর প্রায় একই সময়ে রচিত বিপ্রদাসের প্রকাশ যেন এক মূর্তিমান ছন্দপতন। এই বইতে এক রক্ষণশীল আচার-বিচারের সংস্কারাচ্ছাদিত পরিবারকে উচ্চমূল্য দেওয়া হয়েছে। শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্বেও পূজা-আচ্চা-বৈষ্ণবপ্রীতির প্রাধান্য। শেষের পরিচয়ের শরৎচন্দ্র-লিখিত কয়েকটি পরিচ্ছেদ সমাজবিরোধী মানবিক সম্পর্কের চিত্রায়ণ থাকলেও ধর্মভাব প্রবল। সুতরাং পরিবর্তনের পক্ষপাতী সমালোচক ভাবলেন—তরুণ বয়সে শরৎচন্দ্র পরিবেশ থেকে যে ধর্মপ্রাণ রক্ষণশীল মনটি আয়ত্ত করেছিলেন,

শেষ বয়সে সেই মনটি তাঁর উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে। তখন ভাবলাম, শেষের বইগুলো তেমন শিল্পোত্তীর্ণ হলে এই সমালোচকদের সমালোচনায় হয়তো এত ধার থাকত না।

শরৎচন্দ্রের দু-একজন নামকরা সমালোচকের মতামত জানতে বাসনা হল। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা উপন্যাসের ধারা' বইখানার পাতা উল্টিয়ে দেখলাম, তিনি লিখেছেন, "বিপ্রদাস (মাঘ, ১৩৪১) উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের পূর্ব-গৌরবের অনেকটা পুনরুদ্ধার হইয়াছে।...মোটের উপর শরৎচন্দ্রের এই শেষ উপন্যাসটিতে (শেষের পরিচয়) তাঁহার পূর্বতন শক্তির আংশিক পুনরুদ্ধার লক্ষিত হয়।" শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব সম্পর্কে শ্রীকুমারবাবু বলেন : "তৃতীয় ভাগে যে দুর্বলতার সূচনা দেখা দিয়াছিল চতুর্থ ভাগে তাহা নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।" সুতরাং, শ্রীকুমারবাবুর মতে, শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব এবং শেষ প্রশ্নের পর বিপ্রদাস এবং শেষের পরিচয়ে শরৎ-প্রতিভার আংশিক পুনরুজ্জীবন ঘটেছে।

হাতের কাছে আর-একজন সমালোচকের একটি অভিমত পাচ্ছি। ডঃ অজিতকুমার ঘোষ বলেন, "সুতরাং মনে হয়, শরৎচন্দ্রের যে বিদ্রোহী মন হইতে 'দেনা পাওনা', 'পথের দাবী', 'শেষপ্রশ্ন' প্রভৃতি বাহির হইয়াছিল, সেই মনের দীপ্তি ও জ্বালা দুই-ই নিভিয়া শান্ত হইয়া গিয়াছিল। 'শ্রীকান্ত' (৪র্থ পর্বে) আমরা ইহা দেখিয়াছিলাম, 'বিপ্রদাসে' পুনরায় ইহা দেখিতে পাইলাম। সমসাময়িক জীবনের বহির্বিক্ষোভ হইতে নিজেকে সরাইয়া লইয়া তিনি যেন যাহা ধ্রুব, যাহা সনাতন এবং যাহা চিরমঙ্গলময় তাহার দিকেই প্রশান্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিলেন।"

অথচ ডঃ ঘোষই অন্যত্র উল্লেখ করেছেন যে, শেষপ্রশ্নের রচনাকাল ১৩৩৪-৩৮। এবং বিপ্রদাসের রচনাকাল ১৩৩৬-৪১। অর্থাৎ ১৩৩৬-৩৮ সালে একই সময়ে তিনি দুখানি উপন্যাস লিখছিলেন। তাহলে "সেই মনের দীপ্তি ও জ্বালা দুই-ই নিভিয়া শান্ত হইয়া গিয়াছিল" কখন? আমাদের কি ধরে নিতে হবে যে, সকালে যখন শরৎচন্দ্র শেষপ্রশ্ন লিখছিলেন তখন তাঁর মনের দীপ্তি ও জ্বালা দাউ দাউ করে জ্বলছিল, আর যখন তিনি বিপ্রদাস লিখছিলেন তখন তাঁর মনের দীপ্তি ও জ্বালা কোন অদৃশ্য হস্তের শীতল জলনিক্ষেপে শান্ত হয়ে যাচ্ছিল? মোটের উপর, ডঃ ঘোষের বিবৃতি থেকে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে আমাদের কোন নতুন জ্ঞান লাভ হয় কিনা বলা শক্ত, তবে তাঁর মন্তব্য থেকে আমরা এটুকু জানতে পারি যে, তাঁর বিবেচনায় আচারপরায়ণতা এবং ছোঁয়া-ছুঁয়ির বাতিকই সেই জিনিস "যাহা ধ্রুব, যাহা সনাতন এবং যাহা চিরমঙ্গলময়।"

ডঃ ঘোষের দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনায় ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গী অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট এবং সহজবোধ্য। তিনি উপন্যাসগুলিকে তত্ত্বচিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন

করে শিল্পকর্ম হিসাবে বিবেচনা করেছেন। শিল্পকর্ম হিসাবে শেষপ্রশ্ন থেকে বিপ্রদাস এবং শেষের পরিচয়কে শ্রেয়তর বলে গণ্য করেছেন। এই বিচার হয়তো নির্ভুল; কিন্তু ঘটনা এই যে, শেষপ্রশ্ন তার ব্যর্থতা নিয়ে বাঙালী চিত্তকে যতখানি আলোড়িত করেছে বিপ্রদাস তার অপেক্ষাকৃত সার্থকতা নিয়ে তা করতে পারেনি। তা দেখে মনে হয় শেষপ্রশ্ন কোন এক জায়গায় এমন কিছু সার্থকতা অর্জন করেছে যেখানে বিপ্রদাস পৌঁছতে পারে নি।

মোটের উপর বিভিন্ন পাঠকের এবং সমালোচকের অভিমতের সঙ্গে আমার যেটুকু পরিচয় আছে, তা থেকে আমার ধারণা হয়েছে যে, শরৎবাবুর শেষ রচনাগুলি সম্পর্কে আমরা কোন পরিচ্ছন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি নি। সেইজন্যই সমালোচকদের এই বইগুলির আলোচনায় কেমন একটা দায়সারা ভাব দেখা যায়। আমার ইচ্ছা অন্তত একটা বইয়ের ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব কিনা চেষ্টা করে দেখা।

## দুই

শরৎচন্দ্রের বড় উপন্যাসগুলিতে একটা বিশেষত্ব চোখে পড়ে—সংলাপের প্রাধান্য। এবং এই সংলাপ অনেক সময়েই তত্ত্বাশ্রয়ী। একমাত্র গৃহদাহ উপন্যাসটিতে সংলাপ কাহিনীকে গ্রাস করেনি। সেখানে চরিত্রগুলির আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্ব কাহিনীকে গতি দান করেছে; এবং সংলাপ সেই-দ্বন্দ্বেরই প্রকাশ। চরিত্রহীন উপন্যাসে কাহিনী থাকলেও, এবং কাহিনী নিজস্ব গতিতে গতিমান হলেও, অনেক সময় দীর্ঘ দীর্ঘ সংলাপ টিউমারের মতো কাহিনীর পৃষ্ঠে লেগে রয়েছে। শেষপ্রশ্নে কাহিনী প্রায় অনুপস্থিত; যেটুকু আছে তাও যেন সংলাপের প্রতিপাদ্য তত্ত্বকে প্রতিপন্ন করার জন্য।

বিপ্রদাস অপেক্ষাকৃত কম দীর্ঘ হলেও সংলাপপ্রধান। সমস্ত সংলাপের পিছনে পশ্চাৎপট হিসাবে রয়েছে সনাতন রক্ষণশীল জীবনযাপনের আদর্শের সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্ত্যমুখী উচ্চবিত্ত জীবনযাপনের আদর্শের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের একদিকে রয়েছে রক্ষণশীল বনেদী জমিদার মুখুজ্জে পরিবার এবং অপরদিকে রয়েছে পাশ্চাত্ত্যমুখী উচ্চবিত্ত সমাজের একমাত্র প্রতিনিধি বন্দনা। দুটি আদর্শের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুধু বাগ্‌যুদ্ধের মধ্যেই প্রতিফলিত নয়, তা ঘটনার মধ্যে ঘাতপ্রতিঘাত এবং চরিত্রের মধ্যেও ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। কিন্তু নাটকে যেমন দেখা যায়, ঘটনা এবং চরিত্রের দ্বন্দ্বও প্রধানত সংলাপের আকারেই পরিবেশিত হয়েছে। বিপ্রদাস উপন্যাসে যেন কতকগুলি নাট্য-দৃশ্যকে উপন্যাসের আকারে সাজানো হয়েছে। বিভিন্ন চরিত্রের ভাবভঙ্গীর যেটুকু বর্ণনা আছে সেটুকুকে মঞ্চনির্দেশনা বলে গণ্য করা যায়।

উপন্যাস রচনার তিন রকম উপাদান প্রয়োজন—বর্ণনা, ঘটনা-সংক্ষেপ এবং

পূর্ণাঙ্গ দৃশ্য। বর্ণনা নানারকম হতে পারে—স্থানের, কালের, দৈহিক সৌন্দর্যের, মানস অবস্থার। অলংকারাদির সংযোগে ভাষারীতিতে নাটকীয়তা সৃষ্টি করে বর্ণনাকে চিত্তাকর্ষক করে তোলা যায়, তবু, সাধারণভাবে বর্ণনা উপন্যাসের সবচেয়ে নীরস অংশ, কারণ বর্ণনার সময় কাহিনীর গতি সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে থাকে। তথাপি বর্ণনা অপরিহার্য। বর্ণনার উদ্দেশ্য তথ্য সরবরাহ, যে তথ্যগুলি না পেলে কাহিনীকে মনে মনে চিত্ররূপে কল্পনা করা শক্ত হয়ে পড়ে।

গুরুত্বপূর্ণ এবং কাহিনীর গতিনিয়ামক ঘটনাগুলির সাধারণত পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হয়। এগুলির নাম দৃশ্য। দৃশ্যে কাহিনী-উক্ত বিভিন্ন চরিত্রের কথা ও কাজ, তাদের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হয়। উপন্যাসের মধ্যে দৃশ্য পাঠকের কাছে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক, কারণ এখানে পাঠক এবং চরিত্রগুলির মধ্যে কোন বর্ণনাকারীর ব্যবধান নেই, লেখক খেলার ধারা-বিবরণীর মতো শুধু পরপর যা ঘটছে তাই বলে যাচ্ছেন, তাঁর উপস্থিতি অনুভব করা যায় না। তাছাড়া কাহিনীর মধ্যে যে নাটকীয়তা আছে তা দৃশ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি করে প্রতিভাত হয়। এইরূপ দুটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের দৃশ্যের মাঝখানে অনেক ঘটনা ঘটে যেগুলির পূর্ণাঙ্গ উপস্থাপনা অনাবশ্যক। কিন্তু পরবর্তী দৃশ্যটির রস পুরোপুরি আস্বাদন করতে হলে অন্তর্বর্তী-কালীন ঘটনাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানা দরকার। ঘটনাসংক্ষেপের দ্বারা লেখক এই প্রয়োজন মেটান। ঘটনাসংক্ষেপে কাহিনীর গতি দ্রুততম: কিন্তু লেখক নিজের মতো বিবরণ দিচ্ছেন বলে তার নাটকীয়তা কম।

পাঠকের মনোযোগ এবং কৌতূহলকে ধরে রাখার জন্য দৃশ্যের গুরুত্বের কথা শরৎচন্দ্র খুব ভাল করে জানতেন। কিন্তু তাঁর ছোট উপন্যাসগুলিতে স্বাভাবিক কারণেই দৃশ্যগুলি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের নয়, দৃশ্যের মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ এবং নাটকীয় অংশগুলো পরিবেশিত হয়েছে, এবং তাতে কাহিনীর রস ক্ষুণ্ণ হয়নি। কিন্তু ছোট উপন্যাসগুলিতে বর্ণনা এবং ঘটনাসংক্ষেপেরও যথোচিত স্থান আছে। বড় উপন্যাসগুলির মধ্যে বিশেষ করে শেষপ্রশ্নে শুধুই দৃশ্যের ভিড় ; বর্ণনা এবং ঘটনাসংক্ষেপের জন্য জায়গা দিতে লেখক একান্ত-ভাবে অনিচ্ছুক। বিপ্রদাস উপন্যাসেও এই রীতি অনুসৃত হয়েছে, এবং তা থেকে বোঝা যায় দুখানি উপন্যাস প্রায় একই সময়ে রচিত। অবশ্য বিপ্রদাসে উপস্থাপিত দৃশ্যগুলি একই স্থানে সংঘটিত, অবিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। একই বাড়ির বিভিন্ন অংশে সংঘটিত কাটা-কাটা খণ্ড দৃশ্যের সমন্বয়। খণ্ডদৃশ্য-গুলির মধ্যে সময়ের ব্যবধান খুবই কম, কিন্তু সময় অবিচ্ছিন্ন নয়। অর্থাৎ দৃশ্যগুলি মঞ্চের দৃশ্যের অনুরূপ নয়; বরং সিনেমার দৃশ্যের সঙ্গে এগুলির মিল আছে।

বিপ্রদাসকে পাঁচ অঙ্কে সম্পূর্ণ নাটক বলে কল্পনা করা যায়। প্রথম অঙ্কে রক্ষণশীল মুখুজ্জে পরিবারে পশ্চিমী ধরনের জীবনযাপনে অভ্যস্ত বন্দনা এবং তার পিতার আকস্মিক আগমন এবং নাটকীয়ভাবে বিদায়গ্রহণ।

দ্বিতীয় অঙ্কে ট্রেনে কলকাতা আগমন, বন্দনার সঙ্গে পিতা ব্যারিস্টার সাহেব এবং বিপ্রদাস, বৌবাজারে দ্বিজুর বাড়িতে বন্দনার অবস্থিতি ; সেখানে দ্বিজু, সতী ও দয়াময়ীর আগমন ; বন্দনার প্রতি দয়াময়ীর অনুরাগ এবং সে সুধীর নামক ভিন্ন জাতের ছেলের বাগ্‌দত্তা জেনে বিরাগ। তৃতীয় অঙ্কে বন্দনার মাসীর বাড়ি থেকে পুনরায় দ্বিজুর বাড়িতে প্রত্যাবর্তন ; বিপ্রদাসের কাছে প্রেম নিবেদন। চতুর্থ অঙ্কে বিপ্রদাস এবং দয়াময়ীর মধ্যে বিচ্ছেদ। বিপ্রদাসের গৃহত্যাগের সংকল্প। পঞ্চম অঙ্কে বন্দনা-দ্বিজদাসের মধ্যে বিবাহ ; বিপ্রদাসের সংসারত্যাগ।

কিন্তু নাটক হিসাবে গণ্য করলে বিপ্রদাসকে সার্থক নাটক বলে গণ্য করা যায় কিনা সন্দেহ। কারণ, প্রথম তিনটি অঙ্কে, বন্দনা-সুধীর ও বন্দনা-অশোকের দুটি নেপথ্য ঘটনাকে বাদ দিলে, কাহিনী গড়িয়ে চলেছে দ্বিজদাস-বন্দনা-বিপ্রদাসের টানা-পোড়েনের মধ্যে দিয়ে। চতুর্থ অঙ্কে এই ত্রিভুজ দ্বন্দ্বের সমাধান পাওয়া গেল একটি আকস্মিক ঘটনার মধ্য দিয়ে। চতুর্থ অঙ্কে দয়াময়ীর ব্রত-উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিপ্রদাসদের দেশের বাড়ি বলরামপুরে বিরাট উৎসব। ঘটনাকে জটিল করার জন্য বন্দনার সঙ্গে জুটেছে অশোক, আবার দ্বিজদাসকে বিবাহের টোপ গেলানোর জন্য এসেছে এক সনাতনপন্থী পরিবারের গুণবতী মেয়ে মৈত্রেয়ী। বিপ্রদাসের মতিগতি দুর্নিরীক্ষ্য, কিন্তু বন্দনার কক্ষ-পথের বাইরে। এমন সময় অভাবনীয় ক্ষেত্রে একটি দ্বন্দ্ব দেখা দিল। অসৎ জামাতা শশধরকে বিপ্রদাস ঘরে স্থান দিতে অসম্মত ; দয়াময়ী তাকে আশ্রয় দিলেন। সুতরাং নিজের মেয়ের স্বার্থরক্ষার জন্য দয়াময়ী সৎছেলে হলেও তাঁর প্রিয়তম ছেলে বিপ্রদাসকে বর্জন করলেন। এই আকস্মিক ঘটনার পিঠোপিঠি আর-একটি ঘটনা ঘটল—বিপ্রদাসের স্ত্রী সতীর মৃত্যু, যার উপর দ্বিজদাসের নির্ভরতা ছিল খুবই বেশি। সুতরাং বোঝা বইতে পারে এমন একজন স্ত্রীর দরকার হলো দ্বিজদাসের। একমাত্র বন্দনাই তেমন স্ত্রী হতে পারে।

অবশ্য লঘু কমেডিতে অনেক সময় সমাধানের জন্য এরকম আকস্মিক ঘটনা দরকার হয়। সেখানে দ্বন্দ্বের নিজস্ব বেগ এবং তীব্রতা এত বেশি নয় যে দ্বন্দ্ব নিজের গতিতেই সমাধানে পৌঁছবে। কিন্তু বিপ্রদাসকে লঘু কমেডিই বা বলা যায় কী করে? কাহিনীর শেষে একজনের মৃত্যু এবং একজনের গৃহত্যাগ কাহিনীটিকে প্রায় ট্র্যাজেডির পর্যায়ে এনে ফেলেছে।

কিন্তু নাটক হিসাবে বিপ্রদাস সার্থক না হোক, উপন্যাস হিসাবে সার্থক হতে বাধা কি ?

আমি আগেই বলেছি, উপন্যাসের তিনটি উপাদানের মধ্যে শরৎচন্দ্র দুটি উপাদান—বর্ণনা এবং ঘটনা-সংক্ষেপকে সামান্যই ব্যবহার করেছেন। এই আপাত নীরস অংশগুলো বাদ পড়ায় পাঠকের কাছে কাহিনীর আকর্ষণ হয়তো বেড়েছে। কিন্তু উপন্যাসে আমরা বাস্তবের যে অন্তরঙ্গ ভরাট আনুপূর্বিক বিবরণ সহ চিত্র প্রত্যাশা করি, লেখকের কৌশলের ফলে তা থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। আমরা জেনেছি যে মুখুজ্জে পরিবার অত্যন্ত রক্ষণশীল এবং আচারনিষ্ঠ, কিন্তু কর্ত্রী দয়াময়ী এবং তাঁর প্রধান প্রতিনিধি সৎছেলে বিপ্রদাসের বদান্যতা, মহানুভবতা এবং ন্যায়পরায়ণতার ফলে পারিবারিক জীবনে বা জমিদারির মধ্যে কোন অসন্তোষ বা অশান্তি নেই। দয়াময়ী এবং বিপ্রদাসকে ঘিরে রয়েছে এক রহস্যময় ব্যক্তিত্ব যার ফলে কেউ তাঁদের আদেশ অমান্য করার কথা ভাবতেও পারে না। এমন কি বিপ্রদাসের স্ত্রী সতীর আদেশ দ্বিজদাসের কাছে অলঙ্ঘনীয়। কিন্তু এ সব আমরা জানতে পারি আপ্তবাক্য হিসাবে, কোন কোন চরিত্রের উক্তি থেকে। সংক্ষিপ্ত বিবরণের সাহায্যে এঁদের জীবনের কিছু কিছু ঘটনা উল্লেখ করলে আপ্তবাক্যগুলির সত্যতা কাহিনীতে প্রতিপন্ন হতে পারত।

ঘটনাসংক্ষেপের কৌশলের সুযোগ নিলে লেখক অনায়াসে আমাদের সঙ্গে বন্দনার মানসগতির পরিচয় করিয়ে দিতে পারতেন। তা হলে বন্দনার বিভিন্ন কাজ আমাদের কাছে এত অসংগত বলে বোধ হতো না। আত্মমর্যাদার হানি হয়েছে বলে বন্দনা বলরামপুরের বাড়িতে জলগ্রহণ না করে পিতার সঙ্গে বোম্বাই যাওয়ার সংকল্প গ্রহণ করল। অথচ বিপ্রদাসের সঙ্গে ট্রেনে কিছুক্ষণ আলাপের পর তার মনের এতখানি পরিবর্তন হল যে সে অনায়াসে বিপ্রদাসের কলকাতার বাড়িতে কিছুদিনের জন্য থেকে গেল। ঘটনাটিকে প্রত্যয়গ্রাহ্য করতে হলে বন্দনার মানসভাবনার কিছু পরিচয় এবং তার পূর্বজীবনের কিছু আভাস দেওয়া দরকার ছিল। আমরা যতদূর অনুমান করতে পারি তাতে মনে হয় বন্দনা পূর্বজীবনে পাঠাভ্যাসের সময়টুকু ছাড়া বাকি সময়টা পার্টি পিকনিক মার্কেটিং প্রভৃতি করে বেড়াত। কাজেই মুখুজ্জে বাড়িতে সে রান্নাবান্না, রোগীর সেবায় যে দক্ষতা দেখিয়েছে তা আমাদের বিস্মিত করে।

বন্দনা বিপ্রদাস উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। ঘটনাসংক্ষেপের কৌশলের সদ্ব্যবহার করে লেখক অনায়াসে তার কাজগুলোর পিছনে যে মানস লজিক কাজ করেছে তা উদ্‌ঘাটন করতে পারতেন। তা না করার ফলে তার কাজগুলো আমাদের কাছে খাপছাড়া লাগে। তার পূর্বজীবনের অভ্যাস এবং ধ্যানধারণারও কোন স্পষ্ট আভাস লেখক দেননি। দিলে হয়তো তার মনের দ্রুত

পটপরিবর্তনের আমরা খানিকটা হদিস পেতে পারতাম। কয়েকদিনের ব্যবধানে বন্দনা বিপ্রদাস এবং দ্বিজদাসের কাছে পর্যায়ক্রমে প্রেম নিবেদন করছে। এবং সেই সময়ে সে আমাদের কাছে অপরিচিত সুধীরের বাগ্‌দত্তা। প্রেমের ব্যাপারে বন্দনার এই অব্যবস্থিতচিত্ততা বন্দনার মনের লজিক জানতে পারলে হয়তো আমাদের কাছে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য হত। বন্দনার প্রেম-লীলা আর-একবার আমাদের কাছে শেষপ্রশ্ন এবং বিপ্রদাসের নিকট আত্মীয়তা প্রতিপন্ন করে। প্রেমের ব্যাপারে বার বার পাত্র বা পাত্রী পরিবর্তন মানসিক সজীবতার লক্ষণ, জীবনের গতিধর্মিতার প্রমাণ,—কমলের এই বক্তব্য বন্দনার আচরণে প্রতিফলিত হয়েছে।

দয়াময়ীর চরিত্র এবং দয়াময়ী সম্পর্কে বিপ্রদাস এবং অন্যান্যের উক্তির মধ্যে অসামঞ্জস্য আছে। এই অসামঞ্জস্য হয়তো থাকত না যদি লেখক ঘটনা-সংক্ষেপের মারফত তাঁর পূর্বজীবনের কিছু পরিচয় আমাদের উপহার দিতেন। তা হলে হয়তো আমরা সহজে বুঝতে পারতাম দয়াময়ীর আসল চরিত্র এবং লোকের মনে তাঁর সম্পর্কে ইমেজ এক জিনিস নয়। 'বিপ্রদাস' উপন্যাসে দয়াময়ী একমাত্র সার্থক বাস্তব চিত্র। তাঁর আচারনিষ্ঠা, ব্রত-পার্বণ, তাঁর প্রতি ছেলেদের অগাধ ভক্তি লোকের মনে এই ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করেছে যে তিনি খুব নীতি- এবং আদর্শনিষ্ঠ। আসলে তাঁর ধর্মচর্চা প্রচলিত সংস্কারের অনু-বর্তন ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর ব্যবহারে দয়া মায়া দাক্ষিণ্য, অনুরাগ বিরাগ—সবই আছে; কিন্তু এ সবের পিছনে একটি সূক্ষ্ম স্বার্থবুদ্ধি কাজ করে। বন্দনার অনেক সংস্কারবিরোধী আচরণ তিনি ক্ষমা করতে রাজী, যতক্ষণ তিনি জানেন তার সঙ্গে দ্বিজদাসের বিবাহ সম্ভবপর। যখন জানলেন সে বাগ্‌দত্তা, তখন রাতারাতি সে তাঁর চক্ষুশূল হয়ে উঠল। সৎছেলে বিপ্র-দাসের উপর তাঁর আস্থা বেশী; কিন্তু নিজের ছেলে দ্বিজদাসের স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি তার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করতে পশ্চাৎপদ নন। ধনীঘরের বর্ষীয়সী মেয়েদের চরিত্রের সুন্দর প্রতিফলন ঘটেছে দয়াময়ীর চরিত্রে।

সুতরাং উপন্যাস হিসাবে বিপ্রদাসের যে কিছু অপূর্ণতা আছে এ-কথা অস্বীকার করা মুশকিল।

## তিন

উপন্যাসে নাটকের মতো উপস্থাপনা, দ্বন্দ্ব বা সমস্যা, দ্বন্দ্বের বিকাশ প্রভৃতি পর্যায়গুলি বিদ্যমান থাকে। তবে নাটকের সাধারণতঃ একটিমাত্র চরম সংঘাত এবং পরবর্তী পটপরিবর্তনের সুযোগ আছে; কিন্তু উপন্যাসের অপেক্ষাকৃত শিথিল বিন্যাসের মধ্যে একাধিক চরম সংঘাত এবং পটপরিবর্তনের উপস্থিতি অস্বাভাবিক নয়। বিপ্রদাস উপন্যাসে বন্দনা মুখুজ্জে পরিবার থেকে দূরে

সরে গিয়েছে, আবার কাছে এসেছে। আবার দূরে সরে গিয়েছে এবং কাছে এসেছে। কিন্তু উপন্যাসের (এবং নাটকেরও) কাহিনীতে একটা আলোকপ্রাপ্তির মুহূর্ত প্রত্যাশিত। অর্থাৎ একটা সময় নায়কচরিত্র পাঠক কাহিনীতে উপস্থাপিত বাস্তব সম্পর্কে একটা গভীর সত্য উপলব্ধি করেন। সাধারণত আলোকপ্রাপ্তির মুহূর্ত চরম সংঘাত এবং উপসংহারের অন্তর্বর্তী কোন সময়ে উপস্থিত হয়।

'বিপ্রদাস' উপন্যাসের আলোকপ্রাপ্তির মুহূর্ত কোন্‌টি? এ প্রসঙ্গে আমি বন্দনার দুটি উক্তি উল্লেখ করছি। বিপ্রদাস মায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার পর মুখুজ্জেবাড়ি থেকে বিদায় নিলেন। বন্দনারও বিদায় নেওয়ার সময় উপস্থিত হয়েছিল। বিদায় নেওয়ার আগে মুখুজ্জেবাড়ির বর্তমান অধীশ্বর দ্বিজদাসকে কিছু উপদেশ দানের প্রসঙ্গে বিবাহ করার পরামর্শ দিল। দ্বিজদাস জানাল ভাল না বেসে সে বিবাহ করবে কিরূপে। উত্তরে বন্দনা বলল: "বিয়ের আগে নয়ন-মন-রঞ্জন পূর্বরাগের খেলা দেখলুম অনেক। আমি বলি ও ফাঁদে পা দিয়ে কাজ নেই দ্বিজুবাবু, সোনার মায়া-মৃগ যে বনে চরে বেড়াচ্ছে বেড়াক, এ বাড়িতে সমাদরে আহ্বান করে এনে কাজ নেই।"

ঠিক তার পরের দৃশ্যে বন্দনাদের বোম্বাইয়ের বাড়িতে কোলকাতার মাসীমা এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি বন্দনার পিতার কাছে বন্দনার সঙ্গে অশোকের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। ব্যারিস্টার সাহেব কন্যার মতামত জানতে চাইলে বন্দনা বলল: "আমার সতীদিদির বিয়ে হয়েছিল তাঁর ন বছর বয়সে। বাপমা যাঁর হাতে তাঁকে সমর্পণ করলেন মেজদি তাঁকেই নিলেন, নিজের বুদ্ধিতে বেছে নেন নি। তবু ভাগ্যে যাকে পেলেন, সে স্বামী তবু দুর্লভ। আমি সেই ভাগ্যকে বিশ্বাস করব বাবা।...তুমি আমাকে যা আদেশ করবে আমি তাই পালন করবো। মনের মধ্যে কোন সংশয়, কোন ভয় রাখব না।"

প্রথম উক্তিটিতে যে উপলব্ধি আংশিক ব্যক্ত হয়েছে দ্বিতীয় উক্তিটিতে তা পূর্ণ প্রকাশিত। এক কথায় বন্দনার উপলব্ধি হল পাশ্চাত্যমুখী পরিবারে ছেলে-মেয়েরা প্রাপ্তবয়স্ক হলে যে স্বাধীনতা ভোগ করে নানাবিধ ভ্রান্তিতে পতিত হয় তার চেয়ে অনুশাসনপ্রধান সনাতন পরিবার ভাল। তার এই উপলব্ধির হেতু দিদি সতীর জীবনের উদাহরণ। সতী পিতার নির্দেশ অনুসারে বিবাহিত হয়ে সনাতনপন্থী মুখুজ্জেপরিবারে স্থানলাভ করেছিল। যেখানে অপরের অনুশাসনে স্বাধীনতাবর্জিত জীবনযাপন করলেও দান ধ্যান, অতিথিসেবা, পরিজন-প্রতিপালন প্রভৃতি অর্থপূর্ণ কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করার সুযোগ পেয়েছে।

কিন্তু যে সময়ে যে ঘটনার পরে বন্দনা এই উপলব্ধিতে এসেছে তা মোটেই

যুক্তিসমর্থিত নয়। মুখুজ্জেপরিবার যে একটি অসাধারণ পরিবার এবং সতীর মতো ভাগ্য যে খুব কম মেয়ের জীবনেই ঘটতে পারে,—এ কথা যে বন্দনার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ের মনে উদয় হয়নি, এ প্রশ্নও না হয় ছেড়ে দিলাম। কিন্তু বন্দনার এই সিদ্ধান্তে আসার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সে নিজের চোখে দেখতে পেয়েছে এমন একটি আদর্শ পরিবারও স্বার্থের স্পর্শে ভেঙে যাচ্ছে। দয়াময়ীর মেয়ে কল্যাণীর অপদার্থ স্বামী শশধরকে বিপ্রদাস ঘর থেকে বের করে দেন। তাকে আশ্রয় দিলে গৃহত্যাগ করবেন, বিপ্রদাস এ প্রতিজ্ঞা করা সত্ত্বেও দয়াময়ী নিজের কন্যা-জামাতাকে আশ্রয় দিলেন। আরও জানা গেল, শশধরকে ভরাডুবি থেকে বাঁচানোর জন্য বিপ্রদাস তার জমিদারির অধিকাংশ শশধরের কোম্পানিকে দিয়েছিলেন; সেই কোম্পানি দেউলে হয়ে যাওয়ায় বিপ্রদাস আজ সর্বস্বান্ত। স্ত্রীপুত্রের হাত ধরে তিনি অকূলের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করলেন। এই ঘটনার পিছনে দয়াময়ীর হিসাবী বুদ্ধি কাজ করেছেঃ নিজের মেয়ের স্বামীকে বাঁচানোর জন্য নিজের ছেলে দ্বিজদাসের অংশ নয়, সৎছেলে বিপ্রদাসের অংশকে দায়বদ্ধ করেছিলেন। এই ঘটনা চোখে দেখার পরও বুদ্ধিমতী বন্দনা যে অনুশাসনপ্রধান পরিবার ও সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা বুঝতে পারল না, এটা স্বাভাবিক নয়! এবং বুঝতে পারার পর তার পক্ষে নিশ্চয়ই অনুশাসনপ্রধান সমাজের সপক্ষে সিদ্ধান্তে আসা যুক্তিসংগত নয়।

সুতরাং আলোকপ্রাপ্তির মুহূর্তটি বিপ্রদাস উপন্যাসে পূর্ববর্তী ঘটনার যুক্তিসংগত অপরিহার্য পরিণতি নয়। দ্বিজদাস দাদার প্রতি শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়ে কপালে বারবার যুক্ত কর ঠেকিয়ে অনায়াসে দাদার গৃহত্যাগ মেনে নিয়ে জমিদারির মসনদে জাঁকিয়ে বসছে। তার এই অসহ্য ন্যাকামির পরেও বন্দনার সিদ্ধান্ত বিস্ময়কর। আমি আগে বলেছি, বন্দনার ঘন ঘন প্রেমের পাত্র পরিবর্তনের বিদ্যাটা সে কমলের কাছ থেকে ধার করেছে। কিন্তু তার উপলব্ধি কমলের উপলব্ধির বিপরীত। কমলের বিশ্বাস, জীবনের ধর্ম গতিশীলতা; সুতরাং তার মধ্যে অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা, পরিবর্তনশীলতা স্বাভাবিক। আর বন্দনার উপলব্ধি হল, অনিশ্চয়তা অস্থিরতাপূর্ণ স্বাধীন সমাজে মানুষের জীবন ফলপ্রসূভাবে ব্যয়িত হয় না। চাই এমন সমাজ যেখানে জানা নিয়ম-কানুন আছে বটে, কিন্তু স্থায়ী মানবিক মূল্যবোধগুলি অপরিম্যান। হায়! স্বার্থের সংঘাত যখন বাধল, তখন সেই মূল্যবোধগুলি কোথায় গেল?

আসল কথা, এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং কাহিনীর প্রয়োজনে তিনি (বন্দনার মারফত) যে উপলব্ধিতে পৌঁছুতে চেয়েছেন,—এ দুয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে। তিনি অভিজ্ঞতা থেকে জানতেন যে আপাতদৃষ্টিতে আদর্শ জমিদার পরিবারগুলি দেখতে খুব ভাল ছিল; মহানুভব জমিদারের ছোঁয়াছুঁয়ির সংস্কারের সঙ্গে উদারতা এবং দানশীলতার ঐতিহ্য

মিশে ছিল। কিন্তু কুটিল স্বার্থের অনুপ্রেরণার ফলে বেশিরভাগ জমিদার পরিবারই দু-তিন পুরুষের মধ্যে ভেঙে গিয়েছে। অথচ এই উপন্যাসে তিনি পরিবর্তনশীল সমাজের বিরুদ্ধে অপরিবর্তনশীল ভারতীয় ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

বিপ্রদাস উপন্যাসের অন্যান্য পর্যায়গুলি পাঠকের কাছে সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে বলে আমি সেগুলির বিস্তৃত আলোচনা এড়িয়ে যাচ্ছি। কিন্তু উপসংহার সম্পর্কে একটি কথা বলা প্রয়োজন। বিপ্রদাসের গৃহত্যাগ কি তাঁর জীবনের 'লজিক'-এর স্বাভাবিক পরিণতি? লেখক অবশ্য বার বার বিভিন্ন চরিত্রের উক্তিতে একথা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে তিনি পৃথিবীতে সম্পূর্ণ নিঃসংগ, অনাসক্ত। প্রকৃতপক্ষে তাঁর কোন বন্ধু নেই, কোন মানুষের সংগে গভীর স্নেহের সম্পর্ক নেই। তথাপি তাঁর যেসব কর্মের বিবরণ আমরা জানতে পারি তাতে বোঝা যায় তিনি কর্মযোগী, নিষ্কাম কর্মই তাঁর সাধনার অবলম্বন। কিন্তু সন্ন্যাসগ্রহণের পথ হল কর্মত্যাগ। কর্মযোগী হঠাৎ তাঁর সাধনার পথ পরিবর্তন করবেন, এটা স্বাভাবিক নয়। পারিবারিক প্রশ্ন তাঁকে বাধ্য করেছে। আদর্শনিষ্ঠ মুখুজ্জেপরিবার প্রমাণ করেছে যে তার মধ্যে প্রকৃত আদর্শবাদীর স্থান নেই। সুতরাং বিপ্রদাস উপন্যাস একটি ট্র্যাজেডি। দ্বিজদাসের ন্যাকামি এবং ভনিতা সত্ত্বেও যে বন্দনা তাকে বিবাহ করল তাতে এই ট্র্যাজেডির প্রকৃতি ক্ষুণ্ণ হয়নি, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

### চার

ইংরেজ সমালোচক স্কট জেমস বলেছেন সাহিত্যকর্মের মূল বিষয়কে বিমূর্ত ভাষায় অনধিক দশটি শব্দের মধ্যে প্রকাশ করতে পারা উচিত, আমেরিকান সাহিত্যতত্ত্ববিদ্ আর, পি, ব্লাকমুইর যে সাহিত্যকর্মকে টেক্সচার এবং স্ট্রাক্চার-এ ভাগ করেছেন, তার মধ্যে টেক্সচার বা কেন্দ্রীয় ভাবনা বলতে তিনি মোটামুটি ভাবে থীমকেই বুঝিয়েছেন। এই থীমই বহু শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত বৃহৎ উপন্যাসের অন্তর্নিহিত ঐক্যকে ধরে রাখে। মহৎ লেখকের সাহিত্যকর্মের বিশেষত্ব এই যে তাতে সন্নিবেশিত কোন সামান্য ঘটনা বা চরিত্র বা উক্তিও নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নয়।

'বিপ্রদাস' উপন্যাসের থীম কী? পাশ্চাত্ত্যমুখী সমাজের তুলনায় সনাতনপন্থী সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা? কাহিনীতে আমরা দেখতে পাই বন্দনা নামক এক পাশ্চাত্ত্যমুখী সমাজের প্রতিনিধি ঘটনাচক্রে সনাতনপন্থী সমাজের সংস্পর্শে এসে তার মধ্যে অধিকতর স্থিতিশীলতা এবং মহা মূল্যবোধের প্রকাশ দেখে আকৃষ্ট হল। কিন্তু কাহিনীতে পাশ্চাত্ত্যমুখী সভ্যতার তেমন কোন চিত্র উপস্থাপিত হয় নি। কেবল বন্দনার দু-একটি উক্তিতে এই সমাজের

অন্তঃসারশূন্যতার কথা প্রকাশ পেয়েছে। অথচ সাহিত্যকর্মে কোন বক্তব্য ঘটনা দ্বারা প্রতিপন্ন হওয়া দরকার। কোন চরিত্রের বিবৃতি তেমন মূল্যবান নয় এইজন্য যে তা পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে। সনাতনপন্থী সমাজের শ্রেষ্ঠত্বও লেখক প্রধানত বিভিন্ন চরিত্রের উক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন। তবে বিভিন্ন চরিত্রের উক্তি পরস্পরকে সমর্থন করার এই চিত্র কতকটা নির্ভরযোগ্য; কিন্তু সনাতনপন্থী সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব কাহিনীতে শেষ পর্যন্ত প্রতিপন্ন হয়নি। কাহিনীর চরম সংঘাত—যাকে কেন্দ্র করে সমগ্র কাহিনীটি এবং তার পরিণতি দাঁড়িয়ে রয়েছে—দুটি শ্রেষ্ঠ চরিত্রের মুখেই চুনকাম দিয়েছে। দয়াময়ী নিজের কন্যার স্বার্থে জামাতাকে আশ্রয় দিলেন ; বিপ্রদাস এই জামাতার দ্বারা এত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন যে সেই আক্রোশে উৎসবের দিনেও তাকে ঘরে স্থান দিতে রাজী নন। এই ঘটনায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে অনুশাসনপ্রধান সনাতন সমাজের স্থায়ী মূল্যবোধগুলি স্বার্থের আঘাতকে প্রতিরোধ করার শক্তি রাখে না। মনে হয় কাহিনীতে যে সনাতনপন্থী সমাজের এই সীমাবদ্ধতা প্রতিপন্ন হচ্ছে এ-সম্পর্কে লেখক নিজেও খুব সচেতন ছিলেন না। কারণ আমরা দেখেছি বন্দনার শেষ উপলব্ধিতে এ সত্য স্বীকৃত বা উল্লিখিত হয়নি।

যদি বলি কাহিনীর থীম বিপ্রদাস চরিত্রের মধ্যে ভারতীয় আদর্শসংগত চারিত্রিক মহত্ত্বকে প্রদর্শন করা? কাহিনীর মধ্যে বিপ্রদাস চরিত্র প্রতিপন্ন করে যে কোন সমাজ যত আদর্শনিষ্ঠই হোক প্রকৃত আদর্শবাদীকে কখনো বরদাস্ত করতে পারে না। সমাজের একজন হতে হলে কিছু নীচতা, স্বার্থবুদ্ধি, পক্ষপাতিত্ব অপরিহার্য। প্রকৃত সমদর্শী, স্বার্থজ্ঞানশূন্য, আদর্শানুসারী কর্মে রত মানুষকে কোন সমাজ বরদাস্ত করে না। কিন্তু বিপ্রদাস কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র নয়; তাঁর স্থান কাহিনীর উপান্তে। বন্দনার আলোকপ্রাপ্তির মুহূর্তের উপর বিপ্রদাসের চরিত্রের কোন রেখাপাত ঘটেনি।

যদি বলি, কাহিনীর থীম হল বন্দনা নামক একটি মেয়ের উদাহরণ থেকে প্রতিপন্ন করা যে প্রেমজ বিবাহ অপেক্ষা অভিভাবকদের অনুশাসনাধীন বিবাহ শ্রেয়তর? বন্দনার 'পয়েন্ট অব ইলুমিনেশন'-এ এই উপলব্ধির কথা ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু কাহিনীতে বন্দনার উপলব্ধি নিছক চিন্তাতত্ত্ব হিসাবে থেকে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত সে বিবাহ করেছে তার অন্যতম প্রণয়ী দ্বিজদাসকে। মুখুজ্জেপরিবারে তার আর-একজন প্রণয়ীর সাক্ষাৎ পাই বটে, কিন্তু দ্বিজদাসের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল সবচেয়ে বেশী।

উপরে 'বিপ্রদাস' উপন্যাসের যে কয়টি সম্ভাব্য থীমের আলোচনা করলাম তার সবগুলিই প্রাসঙ্গিক; কিন্তু কোনটিই কাহিনীর সঙ্গে খাঁজে খাঁজে মিলে যাচ্ছে না। থীমগত অনিশ্চয়তাই এই উপন্যাসের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। মনে হয় কাহিনী রচনার সময় শরৎচন্দ্রের মন অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত ছিল না।

তখন যে থীমই তাঁর মাথায় থেকে থাক, তার সঙ্গে তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার বিরোধ থাকার ফলে থীমটি নিখুঁত শিল্পমূর্তি লাভ করতে পারেনি।

## পাঁচ

'বিপ্রদাস' উপন্যাসের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্যে অনেক প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গকে বাদ দিতে হয়েছে। মোটামুটিভাবে আমি এই উপন্যাসের অপূর্ণতা কোথায় এবং কেন তার কিছু ইঙ্গিত দিতে চেয়েছি; উপন্যাস হিসাবে বইটির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আমার লক্ষ্য ছিল না। এই বইয়ের অপূর্ণতার আলোচনা মহৎ লেখক শরৎচন্দ্রের উপর কোন আলোকপাত করে কিনা দেখা যেতে পারে।

শিল্পীদের দু-জাতে ভাগ করা যায়—জীবনশিল্পী এবং বিশুদ্ধ শিল্পী। (শরৎচন্দ্রের প্রসঙ্গে জীবনশিল্পী কথাটা বহুলব্যবহৃত। কিন্তু হাতের কাছে আর কোন ভাল শব্দ না পেয়ে এই শব্দটিই ব্যবহার করছি।) জীবনশিল্পী হচ্ছেন তিনি, যিনি জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কোন আবিষ্কার বা উপলব্ধিকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তাকে শিল্পরূপ দেন। আর বিশুদ্ধ শিল্পীর কাজ হল তত্ত্বচিন্তাকে শিল্পরূপ দেওয়া। কারণ শিল্পীর কাছে এক্সপিরিয়েন্সটা বড়; বিশুদ্ধ শিল্পীর কাছে কন্‌টেমপ্লেশনটা বড়ো। ইউরোপে বিশুদ্ধ শিল্পীর অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়—যেমন অস্কার ওয়াইল্ড বা টমাস মান। এ দু-জাতের শিল্পীর মধ্যে কাউকে বড় বলা যায় কি না বা বড় বলা উচিত কিনা জানি না। তবে বিশুদ্ধ শিল্পীদের শিল্পকর্মে যেমন নিটোল পরিপূর্ণতা দেখা যায়, জীবনশিল্পীদের ক্ষেত্রে তা অনেক সময় দেখা যায় না।

অন্যান্য সমালোচকের মতো আমিও স্বীকার করি যে শরৎচন্দ্র জীবনশিল্পী ছিলেন। জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা তাঁকে সাহিত্যরচনায় প্রবৃত্ত করেছে। বাস্তবের অনেক চরিত্র এবং সমস্যা তাঁর রচনায় প্রতিভাত হয়েছে। সাহিত্যের মারফত তিনি সমাজের দোষ ত্রুটি দুর্বলতা, অনেক গোপন অবজ্ঞাত উৎপীড়ন-অবিচারের কাহিনী লোকসমক্ষে অনাবৃত করতে চেয়েছেন. কিন্তু সেইসঙ্গে তাকে শিক্ষার বাহনও করতে চেয়েছেন।

কিন্তু সমাজ যখন দ্রুত পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে যায়, তখন নানা আভ্যন্তরিক শক্তিদ্বন্দ্ব তাকে গতিহীন করে। সেইসঙ্গে অনেক বহিরাগত তত্ত্বচিন্তাও সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করে। শরৎচন্দ্র যাকে পণ্ডিতলোক বলে তা ছিলেন না। কিন্তু লেখার ফাঁকে ফাঁকে তিনি যথেষ্ট পড়াশুনা করেছিলেন। কাজেই অনেক বৈদেশিক তত্ত্বচিন্তার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। গতিশীল জীবনে নরনারীর যৌন-জীবন গতানুগতিক নৈতিক সংস্কারমুক্ত হবে, এই চিন্তা নানা কারণে শরৎচন্দ্রের মনকে খুব নাড়া দিয়েছিল। তিনি জানতেন যে সমাজে সতীত্বকে খুব বেশি মূল্য দেওয়া হয় সে সমাজে

নারীর স্বাধীনতা নেই, তার চরিত্রে উদারতা সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণের অভাব ঘটে। এই অভিজ্ঞতাপুষ্ট তত্ত্বচিন্তা থেকে শেষপ্রশ্নের জন্ম। শেষপ্রশ্নে তিনি তত্ত্বচিন্তাকে শিল্পরূপ দিতে চেয়েছেন, কিন্তু এ প্রয়াসে তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। বইখানি কতকগুলি আকাডেমিক বিতর্কের সংকলনে পর্যবসিত হয়েছে। শেষপ্রশ্নের ব্যর্থতার আরও একটি কারণ—স্থির লক্ষ্যহীন বা আদর্শহীন অবাধ গতিশীলতার আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা সমর্থিত নয়। তিনি রক্ষণশীল ভারতীয় সমাজের অসাম্য অবিচার অনেক দেখেছেন এবং তার সমালোচনা করেছেন। কিন্তু এই সমাজ যেখানে সার্থক রূপ লাভ করেছে, সেখানে দেখেছেন একটি স্থির আধ্যাত্মিক আদর্শ জীবনকে সৌন্দর্যদান করে, অনেক মানবিক মূল্যবোধকে স্থায়িত্ব দেয়। তিনি এই অভিজ্ঞতাকে একটি তত্ত্বচিন্তায় পরিণত করে—লক্ষ্যসম্পন্ন অনুশাসন-প্রধান সমাজই শ্রেষ্ঠ—এই চিন্তাকে 'বিপ্রদাস' উপন্যাসে শিল্পরূপ দিতে চেয়েছেন।

কমলের তত্ত্বচিন্তার মূর্তিমান প্রতিবাদ কমল নিজে। তার জীবনচর্চায় ভোগবাদ বা ভোগসর্বস্বতার বিন্দুবিসর্গও উপস্থিত নেই; সে অবাধ যৌন-সম্পর্কের পক্ষপাতী, কিন্তু আহারে বিহারে সে অত্যন্ত সংযত, প্রায় ব্রহ্ম-চারিণী। কারণ, রমণীর এই রূপই শরৎচন্দ্রের প্রিয়; তাঁর তত্ত্বচিন্তার প্রতিনিধি কমল ভিন্নরূপের হবে এ তিনি ভাবতে পারেন নি।

বিপ্রদাস-এ তিনি একটি আদর্শসম্মত চরিত্র ও পরিবারকে রূপ দিয়েছেন। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে তিনি তো জানতেন আপাতসুন্দর আদর্শ জীবনের অন্তরালে কত স্বার্থের ক্লেদ থাকে। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা আদর্শের সুন্দর রূপটিকে ভেঙে দিয়েছে।

শরৎচন্দ্র কোন একটি আদর্শকে ধরতে চেয়েছেন, কিন্তু তিনি সত্যের পূজারী, জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর উপজীব্য আদর্শকে বার বার ভেঙে দিয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রায় একই সময়ে দুটি প্রায় বিপরীত চিন্তাকে শরৎচন্দ্র কী করে সাহিত্যে রূপ দিলেন? শেষপ্রশ্ন এবং বিপ্রদাসের মধ্যে যথেষ্ট আভ্যন্তরিক মিল আছে; দুটি বইয়ের মধ্যে ভাষারীতির মিলও উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু দুটি বইয়ের উপজীব্য চিন্তা যে প্রায় পরস্পরের বিপরীত একথা অস্বীকার করা যায় না। একটি বইতে তিনি জীবনের গতিশীলতার অংশকে প্রধান করে ব্রাহ্মণশাসিত সমাজের স্থিতিশীলতার আদর্শকে কশাঘাত করেছেন: অপর বইতে সেই আদর্শকেই পূজা করেছেন। এ বৈপরীত্য কী করে সম্ভব হল? খুব সম্ভব এ প্রশ্নের উত্তর এ নয় যে শরৎচন্দ্র ছিলেন মূলত শিল্পের পূজারী: প্রায় একই সঙ্গে দুই বিপরীত চিন্তাকে সাহিত্যে

রূপে দিয়ে তিনি প্রতিপন্ন করলেন যে তাঁর কাছে তত্ত্বটা বড় নয়, শিল্পসুন্দর রূপটাই বড়। জীবনশিল্পী সাধারণত এ-ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন না।

আমার মনে হয়, দুটি বিপরীত চিন্তাই শরৎচন্দ্রের সংস্কারমুক্ত মনকে পীড়া দিয়েছে, কিন্তু কোনোটাই তাঁকে পুরোপুরি অধিকার করতে পারে নি। আর সেই জন্যই তাঁর মনে দুটি চিন্তার পাশাপাশি দ্বন্দ্বমূলক অবস্থান সম্ভবপর হয়েছিল। কোন একটি তত্ত্বকেই তিনি শেষ চূড়ান্ত স্বীকৃতি জানান নি।

# প্রসঙ্গ : শরৎচন্দ্র ও শ্রীকান্ত

দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' গ্রন্থটির আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা'য় বলেছেন, 'ইহাকে ঠিক উপন্যাস বলা চলে কিনা তাহা একটু বিবেচনার বিষয়।' তাই এই গ্রন্থটি বিষয়ে কৌতূহলী পাঠক-সমাজ প্রশ্ন তুলতে পারেন, শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' যদি উপন্যাস না হয়, তবে এটি কোন জাতীয় রচনা? এবং সত্যই শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে এই গ্রন্থটিকে নিয়ে পাঠকমহলে এই ধরনের সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। এর সমাধান করতে গিয়ে সমালোচকদের কেউ কেউ 'শ্রীকান্ত' গ্রন্থটির সাহিত্যগত প্রকৃতিবিচারে একে ভ্রমণকাহিনী বলে চিহ্নিত করেছেন। আবার কেউবা গ্রন্থটিকে লেখকের আত্মজীবনী বলেছেন।

কিন্তু 'শ্রীকান্ত' ভ্রমণমূলক কাহিনীই হোক অথবা লেখকের আত্ম-জীবনই হোক, দুটি ক্ষেত্রেই আমরা গ্রন্থটির মধ্যে বেশি-কম উপন্যাসের গুণ বর্তমান দেখি। শরৎচন্দ্র স্বয়ং কিন্তু শ্রীকান্তকে নিছক উপন্যাস বলেই অভিহিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি পত্রে জানিয়েছেন. "রাজলক্ষ্মীকে কোথায় পাবে? ও-সব বানানো মিছে গল্প। শ্রীকান্ত একটি উপন্যাস বই ত নয়। ও-সব মিছে জনরবে কান দিতে নেই।" কিন্তু তবুও পাঠকসমাজ লেখকের এই মতামতকে স্বীকার করে গ্রন্থবিচারে প্রবৃত্ত হন নি। কিন্তু কেন?

প্রথমতঃ শ্রীকান্তকে সাধারণের ভ্রমণকাহিনী বলে মনে করার কতকগুলি যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। প্রথম যখন বাংলা ১৯ সালের সংখ্যা থেকে এই রচনাটি ক্রমিকভাবে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশ পেতে থাকে তখন এর নাম ছিল 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ'। পাঠক তখন বর্তমান 'শ্রীকান্ত' গ্রন্থের (১ম ও ২য় পর্বের) প্রথমাংশ পড়ে এর মধ্যে ভ্রমণকাহিনীর কিছু কিছু লক্ষণ দেখেছিলেন। কিন্তু কাহিনী যতই অগ্রসর হতে আরম্ভ করল ততই রচনাটি উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত হয়ে পড়ে। হয়ত লেখক নিজেই একদা এই কথা উপলব্ধি করে থাকবেন; তাই গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে তিনি গ্রন্থটির 'শ্রীকান্ত' এই নামকরণ করেন। এ ভিন্ন যাঁরা এই রচনাটিকে উপন্যাস না বলে ভ্রমণমূলক কাহিনী বলার পক্ষপাতী. তাঁরা লক্ষ্য করেছেন রচনাটির বিশাল বৈচিত্র্যময় কাহিনীর দিকে: এই কাহিনীর মধ্যে বহু পাত্র-পাত্রীর আগমন ঘটেছে, এবং এইসকল পাত্র-পাত্রীর কাহিনীতে প্রবেশ ও প্রস্থানের মধ্যে সকল সময়ে লেখক কোনরূপ প্রত্যক্ষ কারণ দেখান নি। তাই 'শ্রীকান্ত' কাহিনীর দিক দিয়ে যেমন বৈচিত্র্যময়,

অপরদিকে তেমনি বিচ্ছিন্নতাধর্মী। মূলত 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্বটি) খানিকটা লেখকের রোজনামচার আকারে লিখিত। অর্থাৎ লেখক বিশেষ বিশেষ সময়ে যেসকল পাত্র-পাত্রী অথবা ঘটনার সংস্পর্শে এসেছেন তাদের বৃত্তান্তকে আত্ম-নিরপেক্ষভাবে কাহিনীমধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। এটি ভ্রমণকাহিনীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু 'শ্রীকান্ত'কে যে পুরোপুরি ভাবে ভ্রমণকাহিনী বলা চলে না, তার কারণ ভ্রমণকাহিনীর মূল ধর্ম যে গতিশীলতা সেটি শ্রীকান্তের সর্বত্র অনুসৃত হয়নি। শ্রীকান্তের প্রথম পর্বের কাহিনী যদিও খানিকটা গতিলাভ করেছে কিন্তু বাকী তিন পর্ব উপন্যাসের অলসমন্থর কাহিনীবিস্তারে ভ্রমণবৃত্তের লক্ষণ নেই। এ ভিন্ন নায়ক শ্রীকান্তের বিচিত্র অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেওয়া হলেও গ্রন্থের অল্প কিছু অংশ ছাড়া—স্থানিক রূপ. নিসর্গ প্রকৃতি বিশিষ্টতা লাভ করেনি। এবং আমরা জানি কারো ভবঘুরে জীবনের কাহিনী মাত্রই ভ্রমণকাহিনী নয়। শ্রীকান্তের কাহিনীর মধ্যে যতই বিচ্ছিন্নতা আপাতভাবে লক্ষ্য করা যাক না কেন. শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর প্রেম সমগ্র কাহিনীটিকে একটি কেন্দ্রীয় সংহতি অদৃশ্যভাবে দান করেছে। গ্রন্থটির প্রথম পর্বে অন্নদাদিদির আখ্যান. দ্বিতীয় পর্বে অভয়ার আখ্যান, তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বে যথাক্রমে সুনন্দা ও কমললতার ঘটনা স্বতন্ত্রভাবে আপনা আপনি বিকশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় ঘটনা. শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর প্রেমকে পরোক্ষভাবে পুষ্টি দান করেছে। রাজলক্ষ্মী অন্নদাদিকে না চিনলেও শ্রীকান্তের মুখে তাঁর কাহিনী শোনার পর থেকে মন্ত্রপড়া স্বামীর প্রতি যে নিষ্ঠা তাঁর ছিল তা আরো প্রবল হয়েছে। অভয়ার বিদ্রোহ একদিকে যেমন রাজলক্ষ্মীকে আঘাত দিয়েছে. অপরদিকে তেমনি সুনন্দা তাকে যুগিয়েছে ধর্মনিষ্ঠার আগ্রহ। এই ভাবে বঙ্কু প্রভৃতির চরিত্র প্রত্যক্ষ সম্পর্কের অভাবে মিথ্যে হয়ে যায় নি। বঙ্কু কাহিনীর মধ্যে এসেছিল রাজলক্ষ্মীর অতৃপ্ত মাতৃত্বের মূর্ত তৃপ্তিরূপে। কিন্তু রাজলক্ষ্মী যেদিন বুঝল. এই মিথ্যা মাতৃত্বের ছেলেভুলানো খেলায় আর তার চলে না, সেদিনই বঙ্কু তার কাছে গৌণ হয়ে গেল। এবং কাহিনীতেও তার ভূমিকা ফুরলো। শ্রীকান্ত উত্তরজীবনে তার পথ চলার মনটি অর্জন করেছিল প্রথম পর্বের দুই বিপরীতগামী চরিত্র অন্নদাদিদি ও ইন্দ্রনাথের মধ্যে থেকে। এইভাবে আমরা সমগ্র 'শ্রীকান্ত' গ্রন্থটি বিচার করলে দেখতে পাব এই গ্রন্থের প্রতিটি চরিত্র আপন আপন মাধুর্য দিয়ে কাহিনীটিকে নিটোল রসজ্ঞতা দান করেছে। আধুনিক কালে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে এই ধরনের উপন্যাস লেখার রীতি প্রচলিত হয়েছে। এবং এই দীর্ঘ বিস্তৃতির দিক দিয়ে 'শ্রীকান্ত'কে পাশ্চাত্ত্য কথাসাহিত্যিক রোমাঁ রল্যাঁর ('জন ক্রীস্টোফার') অথবা টমাস্ মানের ('ম্যাজিক মাউণ্টেন')-এর সঙ্গে তুলনা করা চলে।

কিন্তু যেসকল ব্যক্তি শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'কে আত্মজীবনী বলে অভিহিত করতে চান তাঁরাও লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের বহু ঘটনার সঙ্গে বা স্থান-কাল-পাত্রের সঙ্গে 'শ্রীকান্ত'-এর স্থান-কাল-পাত্রগত মিল দেখেছেন। 'শরৎ-সাহিত্যে পতিতা' বইটির লেখক মাখনলাল রায়চৌধুরীর মতে—শরৎচন্দ্র তাঁর 'শ্রীকান্ত'-এ অন্নদাদিদি নামক যে চরিত্রটির উল্লেখ করেছেন দেবানন্দপুরে সেই-রূপ চরিত্রের দূর সম্পর্কের এক ভগ্নী নাকি লেখকের ছিল। এবং ছেলে-বেলায় এই সাধ্বী রমণীর আদর্শবোধ শরৎচন্দ্রকে বিশেষভাবে বিস্মিত করে-ছিল। এবং পরবর্তী জীবনে 'শ্রীকান্ত' রচনাকালে এই চরিত্রটিকে অমর করে রাখবার জন্য ইন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্নদাদিদি নাম দিয়ে তাকে ভাগলপুরের পটভূমিকায় স্থাপিত করেছেন। 'শ্রীকান্ত'-এ ইন্দ্রনাথ চরিত্রটি সম্পর্কেও আমরা জানতে পারি ইন্দ্রনাথ নাকি লেখকের মামার বাড়ির প্রতিবেশী সাহিত্যিক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের ছোট ভাই রাজেন্দ্র ওরফে রাজু। এ ভিন্ন 'শ্রীকান্ত'এ নায়ক শ্রীকান্তের বর্মায় চলে যাওয়ার যে উল্লেখ আছে তাও শরৎচন্দ্রের নিজ জীবনেরই ঘটনা।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে 'শ্রীকান্ত'কে নিছক লেখকের আত্মজীবনী না বলে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলেই উল্লেখ করেছেন। ইংরাজীতে যাকে আমরা অটোবায়োগ্রাফিকাল নভেল বলে থাকি। এবং মোহিতলালের মতে "এই কাহিনীতে দুইটি ভাগ বা ধারা আছে, একটি লেখকের আত্মজীবনী বা আত্মচরিত, আর একটি সেই জীবন সম্বন্ধে চিন্তা বা তাহার সমালোচনা।" আমার মনে হয় লেখকের এই আত্মসমালোচনার অংশটিই উপন্যাস হয়ে উঠেছে। এই গ্রন্থটি লেখকের আত্মজীবনী বলে একদিকে লেখক শরৎচন্দ্র যেমন এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আত্মপ্রকাশ করেছেন, অপর দিকে তেমনি এই গ্রন্থে সবচেয়ে বেশি আত্মগোপনও করেছেন। সম্পূর্ণ নিরাসক্তভাবে আপন ব্যক্তিসত্তাকে প্রচ্ছন্ন রেখে তিনি কখন কখন কাল্পনিক পটভূমিতে দাঁড়িয়ে, কাল্পনিক চরিত্রের মাধ্যমে আত্ম-সমালোচনা করেছেন। উপন্যাসের ধর্মানুসারে তাই এ কাহিনীতে সত্যের সঙ্গে মিথ্যা, কল্পনার সঙ্গে বাস্তব, তথ্যের সঙ্গে সৌন্দর্য ও রসের মিশ্রণ ঘটেছে।

রবীন্দ্র-যুগেও অভূতপূর্ব, শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' তাই শুধুমাত্র লেখকের আত্মজীবনীও নয়, আবার উপন্যাসও নয়। গ্রন্থটি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস।

# জীবে প্রেম : শরৎচন্দ্র

**আশালতা রায়**

শরৎচন্দ্রের নামের আগে 'অপরাজেয়' এবং দরদী বিশেষণ দুটি অনেককাল ধরে চলে আসছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে জয়-পরাজয়ের কথা অবাস্তব; কিন্তু দরদী বিশেষণটি দুর্লভ। লেখকমাত্রেই তো হৃদয়বান, সহানুভূতিশীল। নইলে তিনি মানুষের জীবনকে ফোটাবেন কি করে?

তবু বিশেষ অর্থে শরৎচন্দ্র দরদী শিল্পী, দরদী মানুষ। গৃহপোষ্য প্রাণীকে আমরা সকলেই ভালবাসি: সে ভালবাসার অন্য নাম করুণা। সেই পোষ্য প্রাণীর মৃত্যুতে শোকও হয়। কিন্তু তা পিতৃশোক বা পুত্রশোকের সঙ্গে তুলনীয় নয়।

এক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র ব্যতিক্রম। তিনি ইতরজীব 'পোষেন' নি, 'মানুষ' করেছেন। 'যেমন সংসারে যারা শুধু দিলে পেলে না কিছুই...মানুষ যাদের চোখের জলের কোন হিসাব নিলে না,' তাদের প্রতি ছিল শরৎচন্দ্রের অপার মমতা, তেমনি আন্তরিক ভালবাসা ছিল পালিত জীবদের প্রতি।

তবে কি বিবেকানন্দের মত আর্ত জীবের সেবাই ছিল তাঁর কাছে ঈশ্বর-সেবা?

বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর!

এখানে জীবের মধ্যে শিবের সন্ধান করা হয়েছে। তাই জীব থেকে চেতনার শিবত্বে উত্তরণ। শরৎচন্দ্রের জীবনে প্রশ্নটি এভাবে আসেনি। জীবের মধ্যে শিবের সন্ধান তিনি আদৌ করেননি। কোন অধ্যাত্ম বিশ্বাসের রঙে জীব-সত্তা প্রতীকী সত্তা হয়ে ওঠেনি। কুকুর, পাখি, ছাগল তাদের জীবস্বরূপেই যে মানুষের কত প্রিয় কত আপন হতে পারে শরৎচন্দ্রের জীবনে তার নিদর্শন মেলে। তিনি ছিলেন একান্তভাবেই মানবপ্রেমিক। সেই মানুষী প্রেমই পোষা প্রাণীতে সঞ্চারিত, সম্প্রসারিত হয়েছে।

তিনটি দৃষ্টান্ত একে একে দেওয়া যেতে পারে।

(১) বাটুবাবা

শরৎচন্দ্র তখন রেঙ্গুনে। পাখিওয়ালার কাছ থেকে একটি সুন্দর নুরি-পাখি কিনেছিলেন। নাম রেখেছিলেন বাটু। আদর করে ডাকতেন বাটুবাবা। দেখতে অনেকটা আমাদের টিয়ার মত। গায়ের রঙ লাল, পাখাদুটি সবুজ,

মোলায়েম। সকলেই দেখে মুগ্ধ হত। অতিথি দেখলেই বাটুর আপ্যায়ন—কে, এসো—বস। সেই বাটু ছিল শরৎচন্দ্রের পরম আদরের। থরে থরে তার জন্যে সাজানো থাকতো খাবার। পেস্তা বাদাম আঙুর ফলের কুচি।

বাটুও কম নয়, সেও শরৎচন্দ্রকে বাবা বলত। সুসন্তানের মত একবার বাবাকে বিপদ থেকে বাঁচিয়েছিল। দরজা খোলা। ঘরের মধ্যে হিরণ্ময়ী দেবী ঘুমিয়ে আছেন। কাজের লোক এদিক-ওদিক কোথাও গেছে। এর মধ্যে রান্না-ঘরে সেঁধিয়েছে এক চোর। তার ইচ্ছে বাসনপত্র নিয়ে সরে পড়বে। কিন্তু দাঁড়ে বসে বাটুবাবা তো সব দেখছে। পাগলাঘণ্টি বাজানোর মত বাটু এমন তার-স্বরে চেঁচাতে লাগল যে চোর হতভম্ব। হিরণ্ময়ীর ঘুম গেল ভেঙে। লোক জড় হল। সে যাত্রা চোরটা কোনমতে পালিয়ে বাঁচল। কিন্তু এই কথা ছড়িয়ে পড়ল মুখে মুখে। তাই তারপর যে কদিন তিনি রেঙ্গুনে ছিলেন, বাড়িতে আর চোর পড়ে নি।

তিনি যখন রেঙ্গুন ছেড়ে হাওড়া শহরে এলেন তখন বাটুও সঙ্গে এল। তারপরও অনেকদিন বাটুবাবা বেঁচে ছিল। বাজেশিবপুরে বাটু মারা যায়। শরৎচন্দ্র তাকে নিজের ভাই প্রভাসের পাশেই সমাধিস্থ করেন।

প্রিয়জনের মৃত্যুসংবাদ যে-খাতায় লেখা থাকত, সেখানেই তিনি লিখে রাখলেন :

> বাটুর মৃত্যু হলো। মঙ্গলবার ২৪শে ফাল্গুন ১৩৩৮ সামতাবেড়-হাবড়া। বন্ধন থেকে সে নিজেই শুধু মুক্তি পেলে না। আমাকেও একটা মস্ত মুক্তি দিয়ে গেল।

(২) ভেলু

শরৎচন্দ্রের একটি আদরের কুকুর ছিল। খাঁটি স্বদেশী। রেঙ্গুনে থাকার সময় অসহায় এই কুকুর-বাচ্চাকে তিনি মাত্র আট আনায় কিনেছিলেন। পরের দিনই কলকাতা থেকে গিয়ে পেঁছিলো দুশো টাকার মনি অর্ডার। তাই ভেলু হল তাঁর পয়মন্ত কুকুর। কলকাতায় এলে সঙ্গে আসতেন হিরণ্ময়ী এবং ভেলু। নিঃসন্তান শরৎচন্দ্রের এ-এক নিঃস্বার্থ সন্তানস্নেহ। যখন তিনি কাশী গেলেন তখন ভেলুও ২২৬ নং শিবালয়ে বাস করছে। ভেলুর স্বভাব ছিল বাটুর বিপরীত। সে কাউকে কামড়াতো না কিন্তু বাড়িতে লোক এলেই সে বীর বিক্রমে তেড়ে যেত, চিৎকারে জানিয়ে দিত—দেখ কে এসেছে, তোমাদের বাঞ্ছিত অতিথি কিনা। আবার শরৎচন্দ্র এসে যেই বলতেন 'এই ভেলু' সঙ্গে সঙ্গেই ভেলুর আওয়াজ থামত। সে চড়ে বসত শরৎচন্দ্রের কোলে।

এই ভেলু একবার অসুখে পড়ল। দারুণ অসুখ। তাঁর হোমিওপ্যাথিতে হল না। ভেটেরিনারি ডাক্তারের ওষুধেও কিছু হল না। তাঁরা বললেন হাস-পাতালে দিতে। শরৎচন্দ্র নিজে ভেলুকে বেলগাছিয়া পশুহাসপাতালে রেখে

রোজই দেখতে যেতেন। অনেক চেষ্টায় ভেলু সুস্থ হয়ে বাড়ি এল। কিন্তু আর বেশিদিন ভেলু বেঁচে ছিল না। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি থেকে জানা যায়, অসুস্থ ভেলুকে রেখে মুন্সীগঞ্জে যাবার সময় তিনি কত উদ্বিগ্ন ছিলেন। সেই ভেলু মারা যেতে শরৎচন্দ্র খুবই মুষড়ে পড়েন।

তারপরেও শরৎচন্দ্র বাঘা নামে কুকুর পুষেছেন। তা ছাড়া ছিল কাকাতুয়া এবং ময়ূরও। কিন্তু এই খাঁটি স্বদেশী ভেলুর জন্যে চৌকি ছিল একটি। তাতে একটি পুরানো কার্পেট এবং একটি তাকিয়াও ছিল। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি বলেছিলেন. ওর আগে পরে অনেকেই এল গেল, কিন্তু ও যেন মাঝের মাণিকটি। এবারও খাতায় লেখা হল ঃ 'ভেলুর দেহত্যাগের দিন ১০ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার ১৩৩২ সকাল ৬টা ২৩শে এপ্রিল ১৯২৫। সমাধি বেলা ৯॥ বাজেশিবপুর, হাবড়া। রাত্রিদিনের সঙ্গী আমার পরম স্নেহের বস্তু।'

(৩) স্বামীজি

শরৎচন্দ্রের একটি পোষা খাসী ছিল। সখের পোষা নয়, মৃত্যুর মুখ থেকেই সে ফিরে এসেছিল। ঘটনাটা সামতাবেড়ের। তিনি একদিন চেনা পথ দিয়ে বাড়ি ফিরছেন। দেখেন এক গাছতলায় মানুষের জটলা, মাঝখানে দড়িবাঁধা একটা খাসী। তাকে কেটে কে কীরকম মাংস ভাগ করবে, তারই আলোচনা হচ্ছে। খাসীটা নির্বিকার। পরিস্থিতিটা দেখে শরৎচন্দ্রের খুব মায়া হল। তিনি খাসীটা বলে কয়ে কিনে নিলেন। তার গায়ের রঙ ছিল গেরুয়া। চোখ দুটিতে নির্বিকার নিরাসক্ত ভাব। তাই হয়ত নাম দিয়েছিলেন স্বামীজি। আদরযত্নে তার চেহারাটি হয়েছিল বেশ হৃষ্টপুষ্ট। তার মৃত্যু হল ১৩ই মাঘ, ১৩৩৯। তাঁর খাতায় লেখা—'আর একটা ভাবনা ঘুচলো।'

অবশ্য লেখকমাত্রে দরদী, হৃদয়বেদনার রূপকার। পশুহিংসার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ একখানা বড়ো নাটকই (বিসর্জন) লিখে ফেলেছেন। কিন্তু পশু ক্লেশ নিবারণের তাগিদে 'পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি'র সভ্য হয় কজন? শরৎচন্দ্র একসময় ঐ প্রতিষ্ঠানের চাকরি নিতে চেয়েছিলেন। তিনি হাওড়া পশুক্লেশ নিবারণী সমিতির সক্রিয় সভ্য এবং পরে সভাপতিও হন।

শরৎচন্দ্রের বন্ধু. আত্মীয়, প্রতিবেশী বহু লেখকের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, জীবে প্রেম তাঁর সহজাত ধর্ম ছিল। 'দেওঘরের স্মৃতি' হাওয়া বদলের স্মৃতি তো বটেই—তার চেয়ে বড় কথা একটি কুকুরের স্মৃতি। তার নাম দিয়েছিলেন অতিথ। শরৎচন্দ্র লিখেছেন, গেটের বাইরে সার সার গাড়ি এসে দাঁড়ালো। মালপত্র বোঝাই দেওয়া চললো। অতিথ মহাব্যস্ত, কুলিদের সঙ্গে ক্রমাগত ছুটাছুটি করে খবরদারি করতে লাগলো কোথাও যেন কিছু খোয়া না না যায়। তার উৎসাহই সবচেয়ে বেশি।

একে একে গাড়িগুলো ছেড়ে দিলে, আমার গাড়িটা চলতে শুরু করলে।

স্টেশন দূরে নয়, সেখানে পেঁাছে নাবতে গিয়ে দেখি অতিথ দাঁড়িয়ে। কিরে এখানেও এসেছিস? সে লেজ নেড়ে তার জবাব দিলে—কি জানি মানে তার কি।...বাড়ি ফিরে যাবার আগ্রহ মনের মধ্যে কোথাও খুঁজে পেলাম না। কেবলি মনে হতে লাগল অতিথ আজ ফিরে গিয়ে দেখবে বাড়ির লোহার গেট বন্ধ—ঢোকবার যো নেই। হয়ত পথে দাঁড়িয়ে দিন দুই তার কাটবে, হয়ত নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের কোন ফাঁকে লুকিয়ে উপরে উঠে খুঁজে দেখবে আমার ঘরটা—তারপরে পথের কুকুর পথেই আশ্রয় নেবে।

এই আমাদের শরৎচন্দ্র। দরদী শরৎচন্দ্র যিনি একটি পথের কুকুরের প্রীতি মায়ার টানে ঘরেই ফিরতে চাইছিলেন না। এই ধরনের আরেকটি ঘটনা এখানে বলা দরকার। জীবে প্রেম বিশেষ অর্থেই শরৎচন্দ্রের জীবনে সত্য হয়ে উঠেছিল। মানুষের প্রীতি ভালবাসার চেয়ে এ প্রেম কম নয়। বাজেশিবপুরে থাকার সময় এত শীতের সকালে কয়েকটি নেহাত শিশু কুকুরছানার কান্না শুনে তিনি বিচলিত হন। তখনো ছানাগুলি চলতে শেখেনি। তাদের চারপাশে যেসব ছোট ছেলেরা দাঁড়িয়েছিল তাদের সঙ্গে নিজেও একটি ছানাকে বুকে আগলিয়ে বাড়ি নিয়ে এলেন। ভোলা চাকর, খাঁদুবাবু (অমরেন্দ্রনাথ মজুমদার), ছেলের দল, এবং তিনি নিজে বারে বারে খুঁজে আসেন—কোথায় সেই ছানাগুলির মা। ওদিকে বাড়িতে রয়েছে শরৎচন্দ্রের চির-আদরের ভেলু। সে এতগুলি স্বজাতি, শত্রু দেখে ক্ষোভে গর্জন করে উঠলো। অবশ্য 'এই ভেলু' বলতেই আবার সব শান্ত। কিন্তু এই ছানাগুলি বাঁচবে কি করে? চটের বিছানায় শুয়ে তারা দিব্যি শরৎচন্দ্রের হাতে চামচে করে দুধ খেলে। এইভাবে তিনদিন কেটে গেল। শেষে বাড়ির রাস্তা থেকে কিছুটা দূরে জঙ্গলে ভরতি একটা পোড়ো বাড়ির মধ্যে তার খোঁজ পেলেন। সঙ্গে ছিলেন খাঁদুবাবু। তাঁর মুখে খবর পেয়ে এলো ভোলা। সঙ্গে দড়ি ঝুড়ি পাউরুটি সন্দেশ। কারণ মা-কুকুরটা খাবারের সন্ধানে এসে জঙ্গলে ভরতি একটা কুয়োর মধ্যে পড়ে যায়। সেখানে সে তিনদিন অনাহারে রয়েছে। ঝুড়ির মধ্যে পাউরুটি সন্দেশ খেতে যেই সে উঠবে অমনি দড়ি ধরে ওপরে তোলা হবে। এই করে তিনি মা ও সন্তানের মিলন ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সামতাবেড়ের বাড়িটা ছিল রূপনারায়ণের একেবারে পাড় ঘেঁষে। তাই তাঁর বাগানের ঘাসে অনেক সময় সাপ দেখা যেত। তিনি ভয় পেতেন না। কাউকে মারতেও দিতেন না।

বাজেশিবপুরের কালীবাড়িতে ধুম করে বলির বাজনা বাজলেই শরৎচন্দ্র বাড়ি বসে গাল দিতেন। একবার হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর কল্যাণে জোড়া পাঁঠা মানত করেছিলেন। তিনি সুস্থ হয়ে সে মানত রক্ষা করতে দেননি। তাঁর বদলে জোড়া পাঁঠার দাম পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

# শরৎচন্দ্র

## নলিনীকান্ত গুপ্ত

শরৎচন্দ্র বাঙলাসাহিত্যে—শুধু বাঙলাসাহিত্যে কেন, বাঙালীর জীবনে ও চেতনায় একটি রসায়নী শক্তি—তীব্র তেজালো সক্রিয় রসায়নী শক্তি। শরৎচন্দ্র বাঙালী ঔপন্যাসিকের গল্পলেখকের ক্ষেত্র পরিসরে বাড়িয়ে দিয়েছেন, নূতন রকমের চরিত্র ও ঘটনাচক্রের সমাবেশ দেখিয়েছেন, বাঙালীর জীবনে রোমান্সের 'ড্রামা'র অবকাশ আবিষ্কার করেছেন। তিনি আরও দারুণ কাজ করেছেন এই যে শিষ্টসম্মত, প্রথানুগত, 'বুর্জোয়া' আচার-বিচার, ধর্মকর্মের পরিবর্তে বরণ করে নিয়েছেন মানব-প্রকৃতির আনকোরা-প্রাকৃত প্রবৃত্তি, সমাদরে সম্মুখে স্থান করে দিয়েছেন সেইসব মানুষী বৃত্তিকে—প্রেরণার জন্য যা সমাজের সামাজিক জীবনের আশেপাশে কোণেকানাচে পড়ে থাকত বা লুকিয়ে ফিরত। এসব সত্য কথা—কিন্তু এহ বাহ্য। শরৎচন্দ্রকে নিরঙ্কুশ তারুণ্যের, বিদ্রোহীর, ভাঙনপন্থীর পাণ্ডা হিসাবে একান্তভাবে বা মুখ্যভাবে দেখলে, তাঁর গভীরতর সত্যকার প্রকৃতি, তাঁর স্বরূপটিকে আমরা ঠিক বুঝব না। তথাকথিত দুর্নীতি অর্থাৎ প্রচলিত নীতির প্রতিবাদ তাতে যথেষ্ট আছে—কিন্তু সমাজসংস্কারক বা সামাজিক বিপ্লবী হিসাবে, এদের বিশিষ্ট চেতনা নিয়ে তিনি ও কাজটি করেন নি। এরকম কোনো উদ্দেশ্য, সমস্যা বা সংকল্প তাঁর শিল্পীচেতনার গোড়ায় ছিল না (শেষের দিকে লোকেব কথায় তিনি হয়তো এদিকে একটু ঝুঁকেছিলেন)। আমার মনে হয় শরৎচন্দ্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এইখানে যে বাঙালীর সামাজিক জীবন যেমনটি—সে জীবন পাশ্চাত্ত্য সামাজিক জীবনের তুলনায় যতই সংকীর্ণ, একঘেয়ে হোক না কেন—তাকে ঠিক তেমনিভাবে গ্রহণ করে, তারই মাঝ থেকে তিনি আবিষ্কার করেছেন, ফুটিয়ে ফলিয়ে ধরেছেন এমন সব বৃত্তি, এমন সব প্রেরণা, বা এমনভাবে বৃত্তি ও প্রেরণা সব, দেখে মনে হয় তারা সত্য জীবন্ত চিরন্তন সর্বজনীন—শুধু সত্যই নয়, তারা আবার শিবম্ ও সুন্দরম। শরৎচন্দ্রের শিল্পপ্রতিভার এইটিই হল মর্মকথা। বৃত্তি বা প্রেরণা বা কর্মধারা গতানুগতিক প্রথানুমোদিত সমাজসম্মত হোক অথবা তার বিপরীত হোক, উভয়কেই শরৎচন্দ্র দিয়েছেন একটি মৌলিক সত্তা, আদিম অবিকৃত অসংস্কৃত আবেগ; প্রাকৃতিক শক্তির মতো—রৌদ্রবর্ষার ঝড়তুফানের মতো, গ্রহনক্ষত্রের গতির মতো উভয়েই রয়েছে একটা সহজ স্বাভাবিক নৈসর্গিক অনিবার্যতা। এই দিক দিয়ে শরৎচন্দ্রের সাথে আমার প্রায়ই মনে পড়ে শেক্সপীয়রের কথা—শেক্সপীয়র হলেন প্রকৃতির আদি আদিম প্রবেগের এলিমেন্টাল ফোর্সের বিগ্রহ। অবশ্য শেক্সপীয়রের প্রকৃতি বিপুল বিচিত্র জটিল, সেখানে

ধ্বনিত হয়েছে সাগরের রোল। শরৎচন্দ্রে স্পন্দিত কয়েকটি সুর বা আবেগ—কিন্তু এদেরও তীব্রতা, আন্তরিকতা, প্রামাণিকতা তেমনি স্বয়ংসিদ্ধ ও স্বপ্রকাশ। মানবপ্রকৃতির সর্বসাধারণ বাঁধনহারা বৃত্তিকে, রিপুনিচয়কে প্রামাণিক করে দেখানো অপেক্ষাকৃত সহজ। শরৎচন্দ্র বাঙালীর পরিচিত জীবন-আয়তনের মধ্যে ঘটনাসংস্থানের সহায়ে দেখিয়েছেন সে-সবই (যথা, নিষিদ্ধ প্রেম) এখানেও কেমন সহজে সম্ভব ও স্বাভাবিক। কিন্তু শরৎচন্দ্রের ইন্দ্রজাল এইখানে যে শুধু নিষিদ্ধ প্রবৃত্তি নয়, সমাজানুমোদিত বৃত্তিকেও তিনি সমানে জীবন্ত ও তীব্র করে ধরেছেন—বাঙালীর নিজস্ব পারিবারিক গণ্ডীগত, একান্ত বাঙালী সমাজেরই সংস্কারগত হাবের ভাবের মধ্যে তিনি ভরে দিয়েছেন এই সর্বজনীন সত্যের আদি ও আদিম প্রকৃতির আবেগ ও স্বাচ্ছন্দ্য।

প্রবৃত্তির যে নৈসর্গিক প্রবেশ ও তীক্ষ্ণতা শরৎচন্দ্রে তা প্রকাশ পেয়েছে একটা বিশেষ ধরনে। বাহ্য বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে দেখি বেগ উতল উচ্ছল হয়ে ওঠে বাধা ও বিরোধের সম্মুখে পড়ে। শরৎচন্দ্রে এই বিরোধ ঘটেছে প্রথম দৃষ্টিতে দেখা যায় ব্যষ্টির ও সমষ্টির, ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির ও সামাজিক আদর্শ ও নির্দেশের বিভিন্ন দাবির ফলে। এবং যেখানে উভয় দাবিই সমান সত্য এবং জীবন্ত হয়ে দেখা দেয়, সেখানে সংঘর্ষ তত করুণ ও কঠোর হয়ে ওঠে। কিন্তু তা ছাড়াও শরৎচন্দ্রে বিরোধ আরও অন্তর্মুখী—এ বিরোধ গভীরতরভাবে আত্মবিরোধ। সম্প্রতি আমাদের একজন খ্যাতনামা মনস্তাত্ত্বিক মানবচেতনায় অ্যাম্‌বিভ্যালেন্স-এর কথা বলেছেন (যদিও আরো সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখা যায় মানবচেতনা অ্যাম্‌বিভ্যালেণ্ট নয়, পলিভ্যালেণ্ট)—শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট মানুষে রয়েছে ঠিক এই আত্মগত দ্বৈধের, বৈপরীত্যের আকর্ষণ-বিকর্ষণ। বৃত্তিটি জীয়ে আছে, বেড়ে চলেছে আপনাকে সংহত করে, নিগ্রহ করে, নিপীড়িত করে, অস্বীকার পর্যন্ত করে। এরকম চাপের ফলে মুহূর্তে মুহূর্তে সে ফেটে পড়তে চায়, ফেটে পড়ছেও এখানে ওখানে—তলিয়ে গিয়েছে· ফল্গুপ্রবাহের মতো আগ্নেয়গিরির গর্ভাগ্নির মতো হয়তো সেখানে সুপ্ত অন্তর্লীন হয়ে আছে যেন নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস অথবা হয়তো বা পরিশেষে কোথাও দিয়ে ছিন্নদীর্ণ করে বের হয়েছে, নিজেকেও নষ্ট ভ্রষ্ট করে দিয়েছে। গীতায় বলেছে এমন অত্যুগ্র তপস্বীর কথা যিনি শরীরকে ক্লিষ্ট করে, অন্তরাত্মাকে খিন্ন করে আনন্দ পান—শরৎচন্দ্রের অনেক মানুষ নিজের অস্তিত্ব অনুভব করতে চান, নিজের সার্থকতা বাড়িয়ে তুলতে চান এইরকমে নিজেকে উৎপীড়িত করেই।

প্রাকৃত বৃত্তির যে রাজ্যে শরৎচন্দ্র আমাদের নিয়ে এসেছেন সেখান থেকে খুব বেশি দূরে নয় সেই জগৎ যেখানে শুনেছি 'ভক্ষণরত ভক্ষক ভুক্ত হয়'। শরৎচন্দ্র যদি পাশ্চাত্যের হতেন তবে তাঁর স্বাভাবিক যে পরিণতি হত—জোলা বা মোপাসাঁর ধারায়—টমসন সাহেব বুঝি বলেছেন শরৎচন্দ্র হলেন বাঙলার

মোপাসাঁ—তা দেখে আমার মনে পড়ত প্রাণিবিজ্ঞানের আবিষ্কৃত এক বিচিত্র ব্যাপার—একরকম প্রাণী আছে যাদের যৌনক্ষুধা এত তীব্র যে উপভোগান্তে মেয়েটি পুরুষটিকে মেরে ফেলে—মেরে ফেলে তবে পূর্ণ তৃপ্তি পায়।* যোগ-তন্ত্রের ভাষায় এ হল নিম্নতন প্রাণের আঁধার রাজ্য। শরৎচন্দ্র এ জগতের মধ্যে হয়তো আসেন নি, কিন্তু তার অনেকখানি ঘেঁষে পাশ কাটিয়ে চলে গেছেন।

এদিক দিয়ে বঙ্গসাহিত্যে একটা ক্রমাভিব্যক্তির পর্যায় নির্দেশ করা যেতে পারে। প্রথমে বঙ্কিম। বঙ্কিমে প্রধানত মনোময় চেতনার রাজ্য—আদর্শের, কল্পনার, চিন্তাচাতুর্যের, বুদ্ধিবিলাসের ক্ষেত্র। আকাশ-বাতাস এখানে এখন-তখন ঝড়বৃষ্টি সত্ত্বেও—স্বভাবত স্থির, নির্মল, প্রসন্ন। রবীন্দ্রনাথে এসে সে আকাশ-বাতাস কিছু চঞ্চল, আকুল আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে—তবুও এ হল ভাবুকতার রঙ, হৃদয়ানুভবের আবেশ, প্রাণের কিন্তু ঊর্ধ্বমুখী প্রাণের স্পন্দন। রবীন্দ্রনাথ মর্মের, হৃদয়নাড়ীর সূক্ষ্ম সুকুমার স্পর্শালুতার জগৎ। চেতনা এখানে মন থেকে হৃদয়গত প্রাণে নেমে এসেছে—আকাশের অদৃশ্য বায়বীয় জল-কণা যেন কোথাও শ্বেতস্বচ্ছ কুয়াশায়, কোথাও ইন্দ্রধনুর বিবিধ বর্ণচ্ছটায় প্রকট-স্থূলীভূত হয়েছে। তারপর শেষে শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্র হলেন স্নায়ুর ধমনীর মধ্যে চেতনার অবতরণ—এ হল দেহগত, দেহমিশ্রিত প্রাণশক্তির রাজ্য। বৃত্তি এখানে বাঁধা পড়েছে এসে মর্ত্যের জড়ের কুণ্ডলীর মধ্যে, তাই বুঝি তারা সেখানে ফুলে ফুলে গর্জে উঠছে, তাই এখানে সব এত জাগ্রত জীবন্ত মূর্ত, এত চলচঞ্চল, এত ঘোরালো।

একটা লক্ষ্য করবার বিষয়, শরৎচন্দ্র যত সহজে ও যতখানি লোকপ্রিয় হতে পেরেছেন আর কেউ তা পারেন নি—বঙ্কিমও নন, রবীন্দ্রনাথও নন। বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত হলেন প্রধানত গুণিজনের—অভিরুপভূয়িষ্ঠ সমাজের শিল্পী। তাঁদের মার্জিত বুদ্ধি, সংস্কৃত প্রবৃত্তি, ভব্যতাময় শালীনতার, কৌলীন্যের একটা সীমানা অতিক্রম করে নি। তাঁদের রসগ্রহণ করেছেন বিশেষ-ভাবে রসিকেরা, শিক্ষিতেরা, বিদ্বানেরা—যাঁরা সমাজের ব্রাহ্মণ্যবর্ণ। শরৎচন্দ্রের প্রভাব সকল দেউল জাঙ্গাল ভেঙে ফেলে বিপুল প্লাবনের মতো সর্বত্র সর্ব-সাধারণ্যে চারিয়ে গিয়েছে। শরৎচন্দ্র বাস্তবিকই আবালবৃদ্ধবনিতার মানুষ। এর কারণ কেবল ফ্যাশন নয়, একটা সাময়িক উত্তেজনা নয়—লোককে খুশী কর-বার চাতুরী তাঁর ছিল বলেও নয়। লোকে তাঁকে লেখক হিসাবে—সাহিত্যিক শিল্পী কারিগর হিসাবে হঠাৎ ভালবেসে ফেলে নি। লোকে তাঁকে অনুভব করেছে 'মুক্তিদাতা' হিসাবে। কথাটা অত্যুক্তি হল কি? আমি তা মনে করি না। শরৎচন্দ্রের মানুষে বাঙালী পেয়েছে তার নিজের প্রাণের স্বাচ্ছন্দ্য, তার নিভৃত

* এই প্রসঙ্গে 'সতী' গল্পটি মনে পড়ে।

প্রবৃত্তির সজীব প্রকাশ, তার নিগৃহীত প্রেরণার সহজ স্ফূর্তি। বঙ্কিম-রবীন্দ্রে বাঙালীর চেতনা যে মুক্তি পেয়েছে তা অনেকটা যেন হাওয়ায় হাওয়ায়—শরৎচন্দ্র মুক্তি দিয়েছেন স্নায়ুর ধমনীর; হৃদয়ের নাড়ী নয়, শরৎচন্দ্রে তার সহজ প্রতিক্রিয়া অর্জন করেছে নাভির নাড়ী। বাঙলায় রাজনৈতিক আন্দোলন বা সমাজনৈতিক আন্দোলন বাঙালীর বাহ্য জীবনে যে পরিবর্তন ঘটিয়েছে, আমার মনে হয় বাঙালীর চিত্তে, মেজাজে, ধাতুর মধ্যে তার চেয়ে বেশি বিপর্যয় বা বিপর্যয়ের সম্ভাবনা এনেছে এই নবতন্ত্রধারক। শরৎচন্দ্র এতখানি লোকচিত্ত অধিকার করেছেন, কারণ শরৎচন্দ্র একটা গোটা আন্দোলন—মুভমেন্ট।

এ আন্দোলন অর্থনৈতিক উচ্ছৃংখলতা বা প্রাণের স্বৈরাচার নয়। যদিও সকল মুক্তিসাধককেই এক সময়ে এ বিশেষণে ভূষিত হতে হয়েছিল। শেলী বায়রন (যাঁদেরকে বলা হত স্যাটানিক পোয়েটস) বা রুসো ভলতেয়ার কী ছিলেন? সৃষ্টির সাথে প্রলয় থাকবেই—নূতনের স্থাপন অর্থ প্রাচীনের উৎখাত। আমাদেরই কবি বঙ্গজননীকে ডেকে বলেছেন সব বাঙালীকে 'গৃহ-ছাড়া লক্ষ্মীছাড়া' করে দিতে, যাতে তারা মানুষ হয়ে উঠতে পারে। কেউ কেউ বলছেন শরৎচন্দ্র এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছেন। হয়তো করেছেন বা করবার মতো করে ধরেছেন। কিন্তু ঐটুকুই সব নয়, শেষ নয়, তার বেশি কিছু করেছেন—এবং তাতেই এসেছে সকল পার্থক্য।

প্রথম কথা, শরৎচন্দ্র কেবলই 'গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া' বৃত্তির প্রশস্তি করেন নি—আমি পূর্বেই বলেছি গৃহমুখী ও লক্ষ্মীমন্ত বৃত্তিও অনেক তাঁর কাছে আদর পেয়েছে, সমানে সজীব ও তীব্র হয়ে উঠেছে। আরও বিশেষত্ব এই যে স্বৈরাচার, উচ্ছৃংখলতা, তথাকথিত দুর্নীতির মধ্যেও তিনি স্থাপিত করেছেন একটি মহত্ত্ব, ঔদার্য, একটি শ্রী। একটি সৌন্দর্য ও মাংগল্যের স্নিগ্ধতা দূর হতে নিভৃত হতে বিদ্রোহের ব্যভিচারের স্বৈরতার খরতাপকে একান্ত দুঃসহ ও অর্থহীন হয়ে উঠতে দেয়নি।

# শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিকোণ

গোপাল হালদার

মানবতাবোধ বা হিউম্যানিজম এই যুগের সাহিত্যের একটা বড় সত্য। বর্তমান কালের সাহিত্য এক হিসাবে তাই মানুষের 'মানবীয়তা'র ঘোষণাপত্র হইয়া উঠিয়াছে। একালের সাহিত্য যেন বলিতে চাহে 'Ecco Homo', সে ঈশ্বর-পুত্র নয়, মানব-পুত্রই তাহার 'মেক হিজ্ ওয়ে স্ট্রেইট'; কারণ, যুগে যুগে সে চলিয়াছে—চলিয়াছে, কেবলই চলিয়াছে। এক-একটা বাধা ভাঙিয়া পড়িতেছে আর তাহার মানবীয়তা—তাহার স্বরূপ—আরও উজ্জ্বল, আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কথা এই—এই সত্যটাও আবার নূতনরূপে এই যুগই আবিষ্কার করিয়াছে আর আবিষ্কার করিয়াছে অত্যন্ত বাস্তব কারণে, সভ্যতার বাস্তব বিকাশে। যে ধনিকতন্ত্র সামন্ততন্ত্রের ছাঁচকে ভাঙিয়া ফেলিয়া বলিল, 'তুমি শুধু দাস নও, প্রভু নও, স্ত্রী নও, স্বামী নও, তুমি মানুষ—মানুষই;'—ব্যক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করিল,—তাহাতেই মানুষ নূতন করিয়া বুঝিল 'ম্যান'স্ ম্যান ফর অ' দ্যাট।' অবশ্য সেই ধনিকতন্ত্রই এই সত্যকে আজ চাপা দিতেও চেষ্টা করিতেছে। সে 'প্রমাণসই' মানুষ চায়, 'মজুর' চায়, 'কেরানী' চায়, 'রেজিমেন্টেড রোবো' চায়, মানুষ সহ্য করিতে চায় না। কিন্তু কথা এই যে, মানুষের এই মানবীয়তাকে এই ধনিকতন্ত্রই নূতন করিয়া আবিষ্কার করিয়াছে। তাহা আর নাকচ করিতেও সে পারিবে না।

প্রসঙ্গক্রমে কথাটা বুঝিয়া লইতে পারি যে, এই 'মানবীয়তাবাদ' বা 'মানবতাবোধ' কী অর্থে 'নূতন'। মানুষ যখন হইতে নিজেকে মানুষ বলিয়া চিনিয়াছে, তখন হইতেই এক অর্থে মানবতাবোধ তাহার মধ্যে জন্মিয়াছে। কিন্তু সে অত্যন্ত অস্ফুট বোধ—সেখানে মানুষ তো প্রকৃতির হাতের অসহায় খেলার পুতুল। তাই সেইদিনকার মানবতাবোধ অর্থ মানুষের মর্যাদাবোধ নয়, মানুষের অসহায়তাবোধ, মানে, দেবতার মহিমাবোধ,—সে দেবতা মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীও হইতে পারেন, আবার গ্রীক-স্বর্গের জিউস্ বা নিয়তিও হইতে পারেন। সভ্যতার সেই প্রথমস্তরে মানবীয়তাবোধ ইহার বেশি যায় নাই। ভারতবর্ষে আমরা মানুষের এই মর্যাদাকে চরম অভিনন্দন জানাইলাম এই বলিয়া—'তত্ত্বমসি'। উহার আসল মর্মটা এই—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা,—তুমি ব্রহ্ম হইতে পার, কিন্তু হাসি-কান্নাভরা মানুষ হিসাবে মিথ্যা। মানে, মানুষের এই মর্যাদা আসলে মানুষকে একেবারে চূড়ান্তভাবে 'নস্যাৎ' করিয়া দিল। গ্রীকরা মানুষকে এইভাবে মর্যাদা না দিয়া দিল বাস্তব জীব হিসাবেই মর্যাদা। সমস্ত গ্রীক সাহিত্য আজও তাই মনে হয় এত আশ্চর্য রকমের 'আধুনিক'। সেখানে

মানুষের মানবীয়তা স্বীকৃত হইল—অবশ্য সে মানুষকেও নিয়তি ভাঙে-গড়ে। আর, এক হিসাবে তাই সে মানুষকে মনে হয় এত মহৎ ও এত ট্রাজিক। কিন্তু কথাটি এই, গ্রীকদের চোখে মানুষ বলিতে শুধু গ্রীকই মানুষ—বর্বর জাতির মানুষেরা মানুষ নয়, আর গ্রীকদের হেল্‌টরাও নয় বা দাসরাও নয়। প্রাচীন সমাজে এইরূপই হইবার কথা—সেখানে স্ব-শ্রেণীর মানুষেরা মানুষ, অন্যেরা শূদ্র বা পশুস্তরের জীব,—মানবতাবোধ তখন পর্যন্ত এইরূপ সীমাবন্ধ ছিল। তবু ইউরোপের রিনেইসেন্সের যুগে এই গ্রীক মানবতাবোধও মানুষকে মাতাল করিয়া দিল। 'মানুষ কি আশ্চর্য জীব'—মিরান্ডার মতো সমস্ত রিনেইসেন্সের সভ্যতা যেন তাহাই আবিষ্কার করিল। ইহার পরে মানুষকে শুধু আর ভূমি-দাস, শুধু পাইক, এমন কি শুধু গৃহিণী বলিয়া ভাবিলেও চলিবে না। তাহাই ঘোষণা করিল ধনিকতন্ত্রের উদ্বোধকরা 'মানুষের অধিকার' ঘোষণা করিয়া। তাহারই সত্য বার্নস্‌ উপলব্ধি করিয়া কহিলেন—'ম্যান'স ম্যান ফর অ' দ্যাট।' নূতন মানবতাবোধ পরিষ্কার হইয়া উঠিতে লাগিল—সেই বার্তা আমাদের পুরাতন সমাজ ভাঙিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও কানে পেঁাছিল। এই পৃথিবীর মানুষকেই আমরাও নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলাম। আবিষ্কার করিলাম—প্রধানত ইউরোপীয় সাহিত্য ও জীবনযাত্রার রূপ দেখিয়া (গ্রীক সাহিত্য পড়িয়াই রিনেইসেন্সের মানুষও নূতন করিয়া ইহা আবিষ্কার করিয়াছিল)। কিন্তু আবিষ্কার নিশ্চয়ই করিতাম—কারণ, নূতন সভ্যতার উহাই নূতন বাণী। ঠিক এই কারণেই ইহাকে 'তত্ত্বমসি' বা চণ্ডীদাসের 'সহজ-মানুষের' সহিত অভিন্ন করিয়া দেখা ঠিক নয়। চণ্ডীদাসের বাণী আজ মনে হয় উহার পরম বাণীরূপ। কিন্তু তাহা মনে হয় আমাদের চক্ষে,—যাহাদের চক্ষে মানবধর্ম পরম সত্য হইয়া উঠিয়াছে—এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী বাঙালীদের চক্ষে। ইহার পূর্বে চণ্ডীদাসের সেই আশ্চর্য সত্য লইয়া কয়জন বাঙালী আশ্চর্য হইয়াছেন? চণ্ডীদাসও মানুষকে আধুনিক মানবতাবোধের দৃষ্টিতে মানুষ বলিয়া চিনেন নাই—কিন্তু তাহাকে দেখিতেছিলেন সহজিয়াতন্ত্রের দিক হইতে এক সত্য হিসাবে। সেই তন্ত্রে মানুষ একদিকে যেমন সত্য তেমন আবার মিথ্যাও। একদিকে সে সত্য, কারণ তাহার জীবনলীলা এক পরম স্বাক্ষর; আবার অন্যদিকে সে মিথ্যা—কারণ তাহা স্বাক্ষর, চরম সত্য আরও কিছু। 'সহজ মানুষ'—মোটেই সাধারণ মানুষ নয়। আধুনিক মানবতাবোধের সঙ্গে উহার তফাত এই যে, আধুনিক মানবতাবোধ সামাজিক মানুষকেই মানুষ বলিয়া মানে, সমাজের ভাঙা-গড়ার উর্ধ্বের কোনো 'সহজ মানুষ' কল্পনা করে না, সমাজের ভাঙা-গড়ার মধ্যেই তাহার ক্রমপ্রকাশিত সত্তাকে দেখে, তাহার ক্রম-উদ্‌ঘাটিত সম্ভাব্যতার সন্ধান পায়। আধুনিক মানবতাবোধের মূল কথাটা এই 'সেকুলার ম্যান'—যে 'আধ্যাত্মিক সত্তা' নয়, একটা 'সামাজিক জীব' এক 'সৃষ্টি'—

'আত্মাও' নয়, 'দেবতাও' নয়,—মানুষ। মানুষের এই ঠিক রূপ তো সভ্যতার অন্য স্তরে দেখা সম্ভব ছিল না--সম্ভব হইয়াছে এই স্তরেই, সমাজের আর্থিক বিকাশের একটা উন্নত পৈঁঠায়।

আমাদের সমাজেও আমরা নিশ্চয়ই এই মানবতাবোধ লাভ করিতাম যখন আমরা আধুনিক জীবনযাত্রার সম্পর্কে আসিলাম। এই মানবীয়তা আরও তীব্র-ভাবে অনুভব করিলাম ইউরোপের ধনতান্ত্রিক যুগের শিক্ষাদীক্ষা, সাহিত্য ও দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ত করিয়া। মানুষকে মানুষ হিসাবে গ্রহণ করিতে আমরা নূতন শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরা সকলেই ছিলাম প্রস্তুত; নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের তো আমরা সেই 'মানুষের অধিকার' রাষ্ট্রে, সমাজে, আর্থিকক্ষেত্রে, পাইতেছিলাম আরও কম। তাই, এই মানবতাবোধ ছিল আমাদের পক্ষে আরও তীক্ষ্ণ, আরও তীব্র—সমস্ত প্রাণমনের একটি বেদনাময় অঙ্গীকার। শরৎচন্দ্রের মধ্যেও আমরা ঠিক তাহাই দেখিলাম—সেই হৃদয় দিয়া হৃদয় চিনা। মানবতাবোধ শুধু তাহার দৃষ্টিক্ষেত্র নয়; তাহার দৃষ্টিও সেই সপ্রেম দৃষ্টি—তাহার পথ প্রেমের পথ, ভালবাসার পথ।

তিনি যেন আমাদের পাঠক-সাধারণের সহিত একাত্ম হইয়াই আছেন।

সত্যই শরৎচন্দ্র যে আমাদের সহিত একাত্ম ছিলেন তাহা বুঝিতে পারি আরও একটু পরেই। আমাদের সহিত পা মিলাইয়া তিনি স্বদেশীর পথে চলিতে গেলেন, 'শিক্ষার বিরোধ' ঘোষণা করিতে গিয়া কবিগুরুর সঙ্গে বিরোধে অগ্রসর হইলেন, আবার আমাদের পরাজয়ে ব্যথিত ও আহত হইলেন, লিখিতে বসিলেন আমাদের অন্ধ দেশপ্রীতি ও আমাদের অন্ধ বিদ্বেষের স্তোত্র—'পথের দাবী'। ইহা আমাদের সেদিনকার রাজনৈতিক নৈরাশ্য ও দৃষ্টিহীনতার একটি অগ্নিময় পরিচয়—নিম্নমধ্যবিত্তের বেদনা ও বিষ তাহাতে আছে, কিন্তু তাহাতে নাই কোনো পথের নির্দেশ। আমরা নিম্নমধ্যবিত্তেরা তাহা জানিতাম না, আমাদের আপনার মানুষ শরৎচন্দ্রই বা তাহা জানিবেন কিরূপে? আমরা রাজনীতিক পরাজয়ে ভাবিতেছিলাম—জনজাগরণের কথা। কিন্তু কোনো স্পষ্ট ধারণা বা সংকল্প আমাদের সে সম্পর্কে ছিল না। সব্যসাচী বা তলোয়ারকারের জনবিদ্রোহের বক্তৃতা এজন্যই এমন উদ্দেশহীন, আর অবলম্বনহীন। বুদ্ধিকে হৃদয়বৃত্তির নিকট খাটো করিলে এই বিপদই ঘটে। জীবনে বুদ্ধির স্থান প্রথমে, যদিও হৃদয়বৃত্তির স্থান চরমে। কিন্তু সাধারণত আমরা ইহার ওলট-পালট করি, —চিন্তায় ও কর্মেও তাই গলদ থাকিয়া যায়। তাই তখন আমরা বুঝি নাই—শরৎচন্দ্রও দেখেন নাই—জনশক্তিই একালের সৃষ্টির অধিকারী, আর তাই সে বিপ্লবী শক্তি।

শরৎচন্দ্র আমাদের এত আপনার ছিলেন বলিয়াই আমাদেরকে ছাড়াইয়া চলিতে পারেন নাই। এমনকি, যে 'বিদ্রোহের' কথা আমরা আলোচনা করিয়াছি

সেখানেও তিনি আমাদের সহযাত্রীই ছিলেন—অগ্রদূত হইতে যান নাই। যে পরিমাণে আমরা নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজ—সাধারণ পাঠক—অগ্রবর্তী হইতে পারিয়াছি তিনিও সেই পরিমাণে আমাদের হাত ধরিয়া লইয়া চলিয়াছেন। আমাদের এই যাত্রার প্রত্যেকটি মোড় যেন তাঁহার সৃষ্টিতে সুচিহ্নিত হইয়া আছে। তিনি বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিলেন, তবু আমাদেরই ভরসা দিতে আবার নানা ছলনারও আশ্রয় লইলেন—তাহা না হইলে তখন আমরা তাঁহার সঙ্গে চলিতেই স্বীকৃত হইতাম না। 'সাবিত্রী'কে আত্মত্যাগ করাইতেই হইবে। 'কিরণময়ী'কে উন্মাদিনী করা স্বাভাবিক, কিন্তু তাহা না করিলে তাঁহার গত্যন্তর ছিল? এমনি করিয়া পার্বতী বৃদ্ধ ভুবনমোহনের মাথায় হাত বুলাইয়া দেয়, মৃণাল বৃদ্ধ স্বামীটির সেবায় অন্তত বাহ্যত বিশুদ্ধ থাকে। শেষে কমলকে পর্যন্ত শুদ্ধাচারিণী করিয়া তিনি থামিলেন—আর সতীশ হইতে জীবানন্দ পর্যন্ত বহু পুরুষকেই 'শুদ্ধি' না করিয়া তিনি ছাড়িয়া দিলেন। তাহা না হইলে আমরাই কি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতাম?

এই আমাদেরই মানসিক দৈন্য ও অস্পষ্টতা শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিতেও প্রত্যেক স্তরে মিলিবে। যেমন যতটুকু আমরা অগ্রসর হইয়াছি তেমন ততটুকু তিনি পরিষ্কার করিয়া তুলিয়াছেন। 'গৃহদাহে'র অচলাই বোধহয় আমাদের তখনকার চিন্তার সীমা নির্দেশ করে। ইহার পরে 'শেষ প্রশ্নে'র আমরা প্রশ্নের উত্তর জানি না; শরৎচন্দ্রও উত্তর দেন না। অথচ, মানুষকে তিনি এতটুকু ভালোবাসেন, ভালোবাসার রহস্য তিনি এতখানি বোঝেন যে, মানুষের এই ভালোবাসাকে তিনি অস্বীকারও করিতে চাহেন না। কিন্তু এই প্রশ্ন প্রশ্নই থাকিয়া যায়—মানুষের ইতিহাসে যে নূতন উত্তর ফুটিয়া উঠিতেছিল বাঙলার পাঠকসাধারণ আমরা তাহা পড়িতে পারি নাই। কারণ আমাদের সমাজে চারিদিকে তখন অন্ধকার নামিতেছে, আমরা আর পথ খুঁজিয়া পাই না। সেই প্রায়ান্ধকারের দিনে আমরা আগে চলিব না পিছনে চলিব, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। তেমনি দিনের আমাদের মানসিক অস্পষ্টতা ও পশ্চাদ্‌গামিতার ছাপ ফুটিয়া উঠিল শ্রীকান্ত—চতুর্থ পর্বে, আর বিপ্রদাসে। আর একবার যেন শরৎবাবু বলিতে চাহিলেন—সনাতনের সপক্ষে এখনো বলিবার কিছু আছে। শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্বের অস্পষ্টতা ও বিপ্রদাসের গতিবিমুখীনতার কথা ভাবিলে আর দুইটি কথাও মনে করিতে হইবে—শরৎচন্দ্র তখন জীবনের শেষ যামে আসিয়া ঠেকিতেছেন, তাঁহার শক্তি নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে। দ্বিতীয়ত, এই নিস্তেজ শক্তি লইয়া তিনি যে জীবনচিত্র আঁকিতে বসিলেন তাহা তাঁহার পূর্বাপর পরিচিত নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের জীবনচিত্র নয়—এই জীবন ও এই চরিত্র তাঁহার সম্পূর্ণ বশ তিনি পূর্বে করেন নাই, তখন আর উহার সময়ও নাই। বাঙলার

নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজও ততক্ষণে আর্থিক-সামাজিক বিপর্যয়ে অগ্রে এবং পশ্চাতে ছুটাছুটিই সার করিয়া তুলিয়াছে।

বলা দরকার নাই বোধহয় যে, যে-'পাঠক-সাধারণ' বা 'কমন রীডার' শরৎচন্দ্রের লক্ষ্য ও শরৎচন্দ্রের আপনার, তাহাদেরকে বাঙলার জনসাধারণ বা 'কমন ম্যান' বলা ঠিক হইবে না। বাঙলার জনসাধারণ নিরক্ষর, নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজই পাঠকসাধারণ। তাহাদের সঙ্গে জনসাধারণের ধনবৈষম্যের তফাত তখনো প্রকাণ্ড ছিল না,—এখন তাহা আরও কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা 'ভদ্রলোক', এই হিসাবে জনসাধারণের সঙ্গে পাঠক-সাধারণের জীবনযাত্রার ও দৃষ্টিভঙ্গির তফাত ছিল পূর্বে দুস্তর,—এখনো তাহা ক্ষুদ্র নয়। অথচ কোনো লেখকই নিরক্ষরদের উদ্দেশ্যে আপনার লেখা লেখেন না—যাহাদের উদ্দেশ্যে লেখেন তাহাদের ভাবনা-ধারণা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে তাঁহার লেখার রূপকে নিয়মিত করিবেই। তাই বলিয়া যাহা সত্যই সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে তাহা পড়িতে শিখিলে অন্য স্তরের লোকেরা গ্রহণ করিতে পারিবে না—ইহাও কখনই সত্য নয়। সৃষ্টি তাহার স্বীকৃতি আদায় করিয়া লইবেই। এই কারণেই এই কথা মনে করা হইবে হাস্যকর যে, শরৎচন্দ্র নিম্নমধ্যবিত্তদের জীবনকে চিত্রিত করিয়াছেন বলিয়াই তিনি সমাদৃত হইয়াছেন। কিংবা, এই মধ্যবিত্ত সমাজ তো আজ ভাঙিয়া চলিয়াছে—উচ্চমধ্যবিত্তেরা উচ্চস্তরে উঠিয়া রেণ্টিয়ার শ্রেণীতে পরিণত হইতেছেন, নিম্নমধ্যবিত্তেরা নিম্নতর স্তরে বেতন-দাসে পরিণত হইতেছেন,—অতএব, অদূর ভবিষ্যতে শরৎচন্দ্র তাঁহার পাঠক-সমাজ হারাইবেন, রাহুগ্রাসে পড়িবেন। প্রথম অবধি যে কথা সত্য সে কথা ভুলিলেই এইরূপ হাস্যকর কথা কেহ বলিতে পারেন। সে কথাটা এই—শরৎচন্দ্র স্রষ্টা, তিনি জীবনকে দেখিয়াছেন, মানুষকে আঁকিয়াছেন, তাঁহার পাতায় জীবনের স্বাক্ষর রহিয়াছে, তাঁহার চিত্রে আছে অপ্রমেয় প্রমাণ।

এইজন্যই শরৎচন্দ্রের ত্রুটি বা গুণের হিসাব লওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে হয়। আমরা জানি—তিনি নিরাসক্ত চিত্রকর নন, তিনি আমাদের মতো আবেগপ্রবণ, এমন কি, ভাবে-ভাষায় এক-এক সময় তিনিও তাল সামলাইয়া উঠিতে পারিতেন না। জানি, তিনি সুবৃহৎ পটে জীবনের মহাচিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন নাই—শ্রীকান্তের মতো গ্রন্থেও আছে মানুষের মিছিল, নাই গোরার মতো মহাকাব্যের ব্যাপকতা। আরও জানি তিনি—তাঁহার মতো শক্তিধারী স্রষ্টাও—একই মুখ একাধিকবার গড়িয়া ফেলিতেন, বিচিত্র মানুষকে তিনিও যেন তত অজস্র রূপ দিতে পারেন নাই। ইহাও জানি, কেহ কেহ তাঁহার ভাষার ভুলও ধরিয়া ফেলিয়াছেন। অথচ ইহাই কি শেষ কথা? না, শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধে কিছু-মাত্র ইহা উল্লেখযোগ্য কথা? যে বাঙলা ভাষা রবীন্দ্রনাথের হাত দিয়া গড়িয়া উঠিতেছিল, তিনিও তাহার উত্তরাধিকার পাইয়াছিলেন। কিন্তু উপন্যাসের

একটি বিশিষ্ট ভাষারীতি শরৎচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া যান—পরবর্তী ঔপন্যাসিকেরাও তাহার প্রভাব একেবারে অস্বীকার করতে পারিবেন না। অবশ্য, নূতনতর রীতিও গড়িয়া উঠিতেছে; আর অত্যন্ত সত্য কথা এই যে, ভাব ও ভাষা পার্বতী-পরমেশ্বর, এবং এক-একজনের হাতে আবার তাহারও বিশিষ্ট রূপ ফোটে।

শরৎচন্দ্র বাঙলা সাহিত্যসৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, শুধু এই কথা বলাই তাই যথেষ্ট। আর এই কথা বলিলেই বলা হইল—শরৎচন্দ্র বাঙালীকে জীবনের পথে নূতন পাথেয় দান করিয়া গিয়াছেন—চিরদিনের মতো তাহার সহযাত্রী হইয়া আছেন। আর একটু বিশিষ্ট অর্থেও এই কথাটা বলা চলে—শরৎচন্দ্র মানুষের মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন। বন্দী মানুষের এমন বন্ধু—মানুষ বড় বেশি পায় নাই। আমাদের সমাজে আবার সর্বাপেক্ষা বড় বন্দী—আমাদের বন্দিনীরা। তাঁহাদের চিত্র বাঙালী শিল্পীর হাতে বরাবরই ভালো ফুটিয়াছে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের মতো বাঙলার নারীকে আর কেহ দেখিয়াছেন কি? স্নেহময়ী, প্রেমময়ী, লীলাময়ী—দীপ্তিময়ী আর বেদনাময়ী—সেই বাঙালী নারীকে শরৎচন্দ্র যেমন রূপদান করিয়াছেন তেমন আর কেহই করেন নাই।

ইহারও কারণ আমরা পূর্বেই বুঝিয়াছি। তিনি তো শুধু দ্রষ্টা ছিলেন না, তিনি ছিলেন বন্দীর বন্ধু, ব্যথীর বন্ধু; তাঁহার দৃষ্টিপথ ছিল প্রেমের পথ। যেসব মানুষকে বলা যায় 'সাফারিং হিউম্যানিটি'-র দরদী, শরৎচন্দ্র যে তাঁহাদের মধ্যে প্রধান স্থান পাইবেন, তাহাতে সংশয় নাই।

এইখানেই একটা প্রশ্ন উঠিবে—ইহা কি বাস্তব শিল্পের লক্ষণ—এমন হৃদয় দিয়া মানুষকে দেখা? সাহিত্যে বাস্তবতা লইয়া তর্কের শেষ নাই। কোনো শিল্পই একেবারে অবাস্তব নয়। কিন্তু সব শিল্পীই সমান বস্তুনিষ্ঠও নহেন:—অনেকেই কল্পনাশ্রয়ে বাস্তবকে পাশ কাটাইয়া যাইতে চাহেন, অনেকে আবার আবেগবশে বাস্তবকে একটা অযথার্থ রূপ বা মূল্য দান করিয়া বসেন। কিন্তু তাহা লইয়া এখানে বিচার-বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। দুই-একটি মূল কথা মনে রাখিলেই চলে—সাহিত্যের ও শিল্পের বাস্তব আর বিজ্ঞানের বা ইতিহাসের বাস্তব এক জিনিস নয়। সাহিত্য ও শিল্প জীবনসত্য ও মানবসত্যকে প্রকাশ করে। তাই, ঘটনাযথার্থ্য তাহার চরম কথা নয়—জোলার বাস্তবতা শিল্পের পক্ষে কৃতিত্বের বড় প্রমাণ নয়। জীবনসত্য ও মানবসত্য তাহাতে রূপ লাভ না করিতেও পারে। শিল্পের বাস্তব তাই জীবনসত্যকে প্রকাশ করে—মানববোধকে সুস্পষ্ট করে। তেমন রূপকার যদি বলেন, 'আমি জীবনকে ভালোবাসি, আমি মানুষের অমর্যাদা সহ্য করিব না', তাহা হইলে তাহাতে শিল্পের বা সাহিত্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না—আসল কথা তিনি জীবনকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন

কি না, তাঁহার হাতে মানুষ রূপলাভ করিয়াছে কি না, তাঁহার আবেগ ও দৃষ্টি সৃষ্টিতে সার্থক হইয়াছে কি না।

আর-একটি কথাও আছে ঃ 'নিরাসক্ত' শিল্পী কতটা নিরাসক্ত তাহা জানি না। কিন্তু একটা কথা বুঝি—'বিশুদ্ধ শিল্পীর' অপেক্ষাও প্রেমময় শিল্পীকে আমরা বেশি সহজে স্বীকার করিতে পারি। এই কারণেই আনাতোল ফ্রাঁস অপেক্ষাও আমরা রোলাঁকে বেশি আপনার বলিয়া মনে করি। গর্কি ও শরৎ-চন্দ্রকে আপনার বলিয়া চিনি। আসলে শিল্পও তো জীবনেরই একটি স্বীকৃতি—সে স্বীকৃতি যত সুনিপুণ হোক, শুধু নৈপুণ্যের বলে জীবনসত্যের শেষ পর্যন্ত তাহা আমাদের পেঁৗছাইয়া দিতে পারে না। যেখানে মানুষ মানুষের সামনে আসিয়া দাঁড়ায়—জন্ম, মৃত্যুর মতো গভীরতম জীবনসত্যের মুখোমুখি আসিয়া পড়ে—সেখানে নিপুণ শিল্পে আর কুলায় না, সেখানে প্রেমময় সহ-যাত্রীর স্পর্শ আর বাহুডোর আমরা কামনা করি; আর তাহা পাইলে সেই বাহু জড়াইয়া ধরি, জানি উত্তীর্ণ হইলাম, জানি নিজেকে আজ চিনিলাম—জানি জীবন সুন্দর ও সত্য।

আর এইটিই শেষ কথা।

# শরৎচন্দ্রের স্বরূপ

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

বাংলা সাহিত্যের বড় দুর্দিনেই আমরা শরৎচন্দ্রের দেখা পেয়েছি। খুব একটা ভার ফলনের পর যেমন মাটি বা প্রকৃতি বিশ্রাম নেয়—একটা দীর্ঘ অনুর্বরতার কাল চলে, বাঙালীর মেধা তেমনি বঙ্কিম-ভূদেব-আদির পর বিশ্বের কবি রবীন্দ্রনাথকে জন্ম দিয়ে কিছুকাল ঝিমিয়ে পড়েছিল। তখনো যে এ গাছে সুখাদ্য ফল একেবারেই ফলে নি তা নয়, রবীন্দ্রনাথের সপ্তস্বরার দু-একটি তারে এক-আধটুকু নতুন মীড় যে কেউ জাগায় নি, তা বলা যায় না। কিন্তু তাকে তো আর বড় সৃষ্টি বলে না, বীণাপাণির কমলবনের ভোমরা তাঁরা হতে পারেন, কমলদলবাসিনী শ্বেতভুজার বরপুত্র তাঁরা নন।

ঋষি তাঁকেই বলে যিনি মন্ত্রদ্রষ্টা: তাঁর মন্ত্র নিয়ে সেই মন্ত্রের শক্তিতে ভোজবাজির মতো একটা আনকোরা নতুন যুগের সৃষ্টি হয়, যেখানে পথ সব বুজে এসেছে সেই দুর্লঙ্ঘ্য মরুর মাঝে পথ জাগে, তারপর সেই পথ বেয়ে চলে সারে সারে কাতার কাতার পণ্যবাহীর দল। গল্প তো সবাই লেখে, বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাংলার কথাসাহিত্যে ঔপন্যাসিক জন্মেছে ভেরেণ্ডাকচুকালকাসন্দার মতো; রবীন্দ্রনাথ কবিত্বের যে ভরা গঙ্গা নামিয়ে এনেছেন তাতে আজ বাংলার—

"শান্তিপুর ডুবুডুবু
নদে ভেসে যায়।"

কিন্তু যখন প্রকৃত গুণী আসে সে হচ্ছে আর এক জিনিস!

তখন বিস্ময়বিমুগ্ধ মানুষ স্তব্ধ হয়ে থাকে,—

"আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং আশ্চর্যবৎ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবৎ কশ্চিদেনং শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেবং বেদ নচৈব কশ্চিৎ॥"

তখন সে আশ্চর্য মানুষটিকে দেখে মনে হয় ঠিক এমনটি বুঝি আর কখনও হয় নি, আর কখনও শুনি নি, দেখি নি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন বড়মানুষ ও-পার থেকে চাপরাস নিয়ে আসে; একথা শুধু ধর্মজগতেই সত্য নয়, সাহিত্যে কলায় বিজ্ঞানে সঙ্গীতে সব ক্ষেত্রেই একথা খাটে।

"তোমার যারে হয় গো কৃপা অরূপ তার রূপের ছটা.
কোমরে কোপীন জোটে না গায়ে ছাই আর মাথায় জটা।"

দেবতা বা ভগবান ঠিক আছেন কিনা আমরা জানি নে, কিন্তু এ যে কারু পরম আশ্চর্য কৃপা, অন্তত আমাদের নিগূঢ় জীবনদেবতার বরাভয়যুক্ত দুইটি কমল করের পরিপূর্ণ আশীর্বাদের ফল, তাতে আর সন্দেহ কী? শরৎচন্দ্র ধনীর ঘরের দুলাল নন, তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মণিকারের বাটালির কাটা

রত্ন দূরে থাক একটা সস্তা পান্না চুনিও তিনি নন। শাস্ত্র ও সমাজ বড় বলে, সুশীল ও সুবোধ বালক বলে যাদের মাথায় তোলে, তাও তাঁকে বলা চলে না। তবু তিনি তাঁর ললাটে এ কি রাজটীকা বীণাপাণির কোন্ হংসমিথুনের পালক দিয়ে আপন হাতে এঁকে তুললেন আর বিস্ময়মুগ্ধ বাংলাদেশের সঙ্গে সমস্ত ভারত তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লো?

শরৎচন্দ্র হয়তো কবি ঠিক নন, কারণ ছন্দোবন্ধ রসগর্ভ পদ তিনি কখনও লেখেন নি; রবীন্দ্রনাথ দূরে থাক, সে রবির কিরণ পেয়ে বাংলার সাহিত্যগগনে যে-সব বাঁকা শশীর উদয় হয়েছে তাদেরও রাগরাগিণী শরৎচন্দ্রের তারে হয়তো বাজেনি। তিনি হচ্ছেন চিত্রী বা কথাশিল্পী, আমাদের সাহিত্যে রিয়্যালিজমের প্রথম বড় রূপদক্ষ ভাস্কর। জীবনের অলিগলির কত না চেনা বড় আপনার জনকে প্রাণদেবতার মতো নিপুণ তুলিকায় অনুপম দরদ দিয়ে শরৎচন্দ্র জীবন্ত করে রেখে গেলেন। তাই ছন্দোবন্ধ পদ না হলেও 'এ পোয়েম অফ লাইফ' কবিতার হিসাবে বড় কম যায় না। পচা পাঁক থেকে নীরবে তিলে তিলে অনবদ্য পদ্মটিকে নিপুণ সূক্ষ্মতায় রূপে লাবণ্যে গন্ধে মধুভারে ফুটিয়ে তোলাই প্রাণদেবতার কাজ, একটি তুচ্ছ ঝিনুক বা পাতাকেই সে দেবতা গড়ে কতই না সূক্ষ্ম বর্ণে কারুকার্যে নয়নমঞ্জুল করে।

শরৎচন্দ্রও প্রাণের অপূর্ব ও বিচিত্র ক্ষুধাতৃষ্ণার কবি, হৃদয়ের স্নেহ মমতা আদর অনাদর হাসি অশ্রুর গাঢ় প্রলেপে তিনি এঁকে গেছেন বাঙালীর ঘরের মা, দিদি, পত্নী, সখী, স্বামী, পুত্র, ভাই, দেবরের প্রাণারাম ছবি। সে সৃষ্টি যেমন স্বতঃস্ফূর্ত তেমনি সহজ ও অনায়াস, এই অনায়াস বৃহৎ সৃষ্টিই বড় শিল্পীর লক্ষণ।

আমাদের সাহিত্যকে নীতিধর্মের উপদেবতায় পেয়ে বসেছিল, ঠাকুরমার গল্পের মতো পাপের শাস্তি আর পুণ্যের পুরস্কার ছিল অধিকাংশ বাংলা উপন্যাসের গোবিন্দলাল-রোহিণীদের আসল কথা। রাগ-দ্বেষ-দোষ-ত্রুটিকে আঁকা হত নর্দমার কালো পাঁক দিয়ে, তারা যে নিতান্তই আমাদের ঘরের মানুষ ও আপনার জন, আলো ও অন্ধকার এই দুই মায়ের কোলে যে আমরা মানুষ হচ্ছি, সে দরদ ও সহানুভূতির পরশ এমন করে শরৎচন্দ্রের লেখায় ছাড়া আর কোথাও আমরা পাইনি। নীতিশাস্ত্র হয়তো খুব ভালো জিনিস, মানুষের মানসকল্পিত যে সমাজব্যবস্থা তাকে বাঁচিয়ে টিঁকিয়ে রাখতে খুব লম্বা টিকি এবং তিলকের হয়তো একদিন দরকার হয়েছিল। কিন্তু সে শাস্ত্র যখন তার অধিকার ডিঙিয়ে সাহিত্য ও কলার ঘরে অনধিকার প্রবেশ করে, তখনই সে ভূত বা উপদেবতা পদবাচ্য হয়। আমরা আমাদরে মানসরাজ্যের এই আচার ও নীতি দৈত্যকে যে ভগবানের নামে চালাই তিনি কিন্তু এই কচকচি ও কোলাহলের অনেক উপরে থেকে অবাধে সমভাবে দু হাতে গড়ে চলেছেন ধর্ম অধর্ম,

পাপ পুণ্য, ভাল মন্দ, কল্যাণ অকল্যাণ সবই, কারণ এসবই যে তাঁর বিচিত্র সৃষ্টির উপকরণ।

নীতির বেড়া জীবেরই জন্য, শিবের জন্য নয়, আর সব স্রষ্টারই জন্ম হচ্ছে শিবাংশে, তাই তাদের রসময় আনন্দলোকের খেলায় দেখতে পাই একটি উজ্জ্বল প্রসন্ন সমরস। মানুষের ত্রুটিবিচ্যুতিকে শরৎচন্দ্র এঁকেছেন মায়ের স্নেহবিগলিত স্পর্শ দিয়ে, তাঁর লেখায় তাই মন্দের গাঢ়কৃষ্ণ মেঘের গায়ে ভালোর সোনালী কারুকার্য কি পরম শোভাই না ধরেছে।

"তমাল পাশে কনকলতা
হেরিয়ে নয়ন জুড়াল রে,
কিম্বা নব নীরদ বামে
দামিনী হেসে দাঁড়াল রে।"

শরৎচন্দ্রের আঁকা ভাল ছেলে মহিমের চেয়ে তাই চরিত্রহীন সতীশ ও কিরণময়ী আমাদের বুকের তন্ত্রীগুলি ধরে টানে বেশি। শরৎচন্দ্রও হয়তো অনেক ক্ষেত্রে মন্দকে দুঃখের অগ্নিপরীক্ষায় ফেলেছেন আর ভালোর হাতে তুলে দিয়েছেন জীবনের ঝকঝকে প্রাইজগুলি। কিন্তু সেখানেও আমাদের বুকটা ব্যথায় সহানুভূতিতে টনটন করে তাঁর এই অবাধ্য চরিত্রহারা ছেলে-মেয়েগুলির দরদে।

আমার মনে হয় শরৎচন্দ্র এই দিক দিয়ে এক নতুন জগতের দেবদূত। মানুষের এতদিনের জীবনচক্র যে এবার পাল্টে যাবে, এতকালের শুভাশুভ, ভালমন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণের মনগড়া দাঁড়িপাল্লায় যে আর কুলাচ্ছে না, মানুষের ধর্ম নীতি সমাজ রাষ্ট্র যে আবার ফিরে যাচ্ছে তার বিধাতার হাতে কাদার নরম তালটি হয়ে—বুঝি নতুন কী এক রূপান্তর পাবার জন্য, একথা পাশ্চাত্ত্যের বর্তমান যুগের অনেক খুব বড় বড় কথাচিত্রীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে শরৎচন্দ্রই বাংলায় প্রথম বলে গেলেন।

বাংলায় শরৎচন্দ্র মানবতার প্রথম ঋষি। মানুষ যে দেবতা না হলেও মানুষ হিসাবে নিজেই অনবদ্য ও অনুপম, কোন শাস্ত্র শ্লোক তন্ত্র মন্ত্র তার চেয়ে বড় নয়, তাকে নীতির অঙ্কুশ মেরে নরকের আগুনে তাতিয়ে পিটিয়ে টেনে-টুনেও যে খুব বেশি বড় করা যায় না, একথা শরৎচন্দ্রের লেখনীতে যেমন ফুটেছে তেমন আর কোথায় ফুটেছে জানি নে। আমরা বহুদিন থেকে মানুষকে মানুষ বলে দেখতে ভুলে গেছি। মানুষেরই প্রতিভা থেকে যার জন্ম সেই বেদ বেদান্ত পুরাণ স্মৃতি যেদিন ভূতের মতো মানুষের ঘাড়ে চাপল এবং অপৌরুষেয়তার মেকী গর্বে, তাদের স্রষ্টা মানুষের কানে দিল হাত, সেই দিন থেকে মানবতার হল মৃত্যু। সেই দিন থেকে পুঁথিতাড়িত শ্লোকভীত আমরা মানুষ দেখতে ভুলে গেলাম, ক্রমশ তার জায়গায় দেখলাম হয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়

মুচী মেথর, নয় শাণ্ডিল্য ভরদ্বাজ গোত্র, নয় রাঢ়ী বারেন্দ্র শ্রেণী, আর নয়তো হিন্দু মুসলমান জৈন খ্রীষ্টান এমনি একটা স্বকপোলকল্পিত কিছু।

এই ভূতে-পাওয়া আত্মবিস্মৃত জাতিকে মানুষের দোষেগুণে অপরূপ কলঙ্কী পূর্ণশশীর ছবি প্রথম চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন মানবতার পুরোহিত শরৎচন্দ্র। তিনি তাই সজ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক একটা দুর্জয় বিপ্লবের পুরোহিতের আসনে উঠে বসেছেন। এ বিপ্লব সারা পৃথিবীতে নানা জাতির তরুণ ও চিন্তাবীরদের মাঝে আজ আসন্ন হয়ে আসছে, তারই বুঝি ঢেউ দিয়েছে আমাদের গঙ্গা-ভাগীরথী-পদ্মার কূলে কূলে শরৎচন্দ্রের দিকনিনাদী কণ্ঠে। এক অপূর্ব মুক্ত স্বপ্রতিষ্ঠ মহামানবতার হবে অভ্যুত্থান, সেই শক্তির পদভরে আজ পৃথিবী টলমল।

নবীন চিরদিনই আসে গোড়ায় একটা ঝঞ্ঝা বা ধূমকেতুর রূপ নিয়ে। ক্রুদ্ধ শিবের চোখে যার জন্ম তার প্রথম রূপটা করাল ও সর্বভূত না হয়ে যায় না। একটি নূতন মন্ত্রের টঙ্কার যার মাঝে আছে সে বাণী হচ্ছে কালীর হাতের অসি। 'শেষ প্রশ্নের' কমলের মাঝে আমরা তার নগ্ন ফলার ঝিকি-মিকি প্রথম ভাল করে দেখতে পাই। এ দেশের রাজশক্তি অন্যরূপ হলে সে অসি আজ বাংলার ভাবজগতের গোটা আকাশটা চিরে ফেলতো।

শরৎচন্দ্রের মতো যাঁরা মানুষের গ্লানি, মানুষের দ্বারা মানুষের চরম অপমান ও অধোগতির কথা প্রথম বলেছেন তাঁর সমগোত্র সেই টলস্টয় গর্কী তুর্গেনিভ গোড়ায় হয়তো বুঝতে পারেন নি কি লোহিত জগদ্দাহি রাগে একদিন উদিত হবে এই মানবতার নবভানু। শিবনেত্রের এই ক্রোধ যে কত প্রখর হতে পারে তা আজ নব-রাশিয়ার নিরীশ্বর রূপ দেখে অনুমান করা যায়। শরৎচন্দ্রও তাঁর অপরাজেয় বিশাল হৃদয়ের অনুরাগ দিয়েই বলেছেন সমাজের অপকার ও ধর্মের ত্রুটির কথা। তাঁর চোখে আগেই জেগেছে স্নিগ্ধ শুভ্র এক ভাবী নব উষার সচন্দন কাষায় বধূমূর্তি, সে উষাবধূর প্রকাশের আগের কালরাত্রির প্রলয়সমারোহ তাঁর চোখে হয়তো পুরাপুরি পড়ে নি। যে সমাজের কোলেপিঠে শরৎচন্দ্র মানুষ হয়েছেন, তার প্রতি কতকটা অন্ধ মমতা তাঁর মুক্তিবাণীকে বার বার ক্ষুণ্ণ করেছে হয়তো, কিন্তু হৃদয়ের রাজা শরৎচন্দ্র মমতা ও করুণাকে এড়িয়ে যাবেন কী করে?

কিন্তু একথাও সত্য যে, হঠাৎ তরুণদের কাছ থেকে এতবড় পূজা পেয়েছেন, শুধু বড় ঔপন্যাসিক হলে তিনি তার সিকিও পেতেন কিনা সন্দেহ। মুক্তির ঋষি বলেই তাঁর শিরে আজ এত লাজপুষ্পবর্ষণের সমারোহ। তাঁর জন্মোৎসব হচ্ছে আসলে মানুষের শৃঙ্খলমুক্তির মহোৎসব, মানবতার নব দিগ্বিজয়ের পূর্ণ জয়ন্তী।

# শরৎ-বন্দনা

## প্রমথ চৌধুরী

আজকের দিনে বাঙলার পাঠকসমাজ শরৎচন্দ্রের প্রতি তাঁদের আন্তরিক প্রীতি ও ভক্তি সর্ব্বজনসমক্ষে নিবেদন করবার জন্য একটি বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন, এবং এই উপলক্ষে আমিও দু-কথা বলবার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েছি।

কেন জানিনে, অনেকে আমাকে একটি চতুর সমালোচক বলে গণ্য করেন। সুতরাং তাঁরা হয়তো আমার মুখে শরৎ-সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা শুনতে চান।

আমি রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে যে প্রবন্ধ লিখি, তা এই বলে আরম্ভ করি যে—"আজকের সভা রবীন্দ্র সাহিত্যের বিচারালয় নয়। আজ এ ক্ষেত্রে আমরা সমবেত হয়েছি বাঙলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের প্রতি আমাদের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে।"

অর্থাৎ যখন কোনও সাহিত্যিক লোকসমাজের নিকট একটি বিশিষ্ট লেখক বলে গণ্য হন, তখন তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের সঙ্গে লোকসমাজকে পরিচিত করে দেবার কোনও সার্থকতা নেই। আর সমালোচনার অন্য যে উদ্দেশ্যই থাক না কেন, কোনও বিশেষ সাহিত্য সম্বন্ধে পাঠকসমাজের কৌতূহল উদ্রেক করাও তার একটি প্রধান উদ্দেশ্য। যা সকলেই দেখতে পান তা তাঁদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার চেষ্টাটি কি হাস্যকর নয়?

আমরা নিত্য বলি, সাহিত্যের বিশেষ ধর্ম হচ্ছে—পাঠককে আনন্দ দান করা। আর লোকপ্রিয় সাহিত্য যে বহু লোককে আনন্দ দান করেছে—সে বিষয়ে তিল-মাত্র সন্দেহ নেই। শরৎ-সাহিত্যের বহু নিন্দাও শুনেছি; বহু প্রশংসাও শুনেছি। কিন্তু সমালোচকদের সেই নিন্দাপ্রশংসা অতিক্রম করে, এ সাহিত্য লোকপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এর থেকে এই প্রমাণ হয় যে, সে সাহিত্য বহু লোকের মনকে স্পর্শ করেছে এবং উৎফুল্ল করেছে। যে সাহিত্য নিজগুণে লোকসমাজে স্বপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার সম্বন্ধে সমালোচক আর বেশি কী বলতে পারেন?

এ ক্ষেত্রে আমি একটিমাত্র কথা বলতে চাই। দেশে যাঁরা বড় সাহিত্যিক বলে গণ্য হয়েছেন, পাঠকসমাজ যে তাঁদের শ্রদ্ধার পাত্র বলে মনে করেন, এ লেখকমাত্রের পক্ষেই অতি সুখের কথা।

আমাদের দেশে বাঙলা সাহিত্যের প্রতি শিক্ষিত সমাজের যথোচিত প্রীতিও নেই, ভক্তিও নেই। দেশের যাঁরা কাজের লোক, অর্থাৎ হাকিম, কেরাণি, উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়, তাঁরা আজ পর্যন্ত বাঙালী লেখক-দের উপেক্ষা করে আসছেন; যদিচ এ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকের বিলেতি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় কলেজের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়েছে।

স্বজাতির মনের আনুকূল্য না থাকলে কোনও দেশে জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় না। যাঁর প্রতিভা আছে, তিনি অবশ্য স্বজাতির এ ঔদাসীন্য উপেক্ষা করে, সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রতিভাশালী ব্যক্তি সকল দেশে, সকল কালেই অতি বিরল। অপর পক্ষে সাধারণ লোকের পক্ষে সমাজের এরূপ আনুকূল্য নিতান্ত প্রয়োজন। এমন কি গ্যেটে-এর আদিগ্রন্থ সরোজ অব্ ওয়ার্দার যদি তার প্রকাশমাত্রেই সর্বজন-আদৃত না হত, তাহলে হয়তো তাঁর প্রতিভা পূর্ণ বিকশিত হত না।

শরৎচন্দ্রকে পাঠকসমাজ আজকের দিনে যে সম্মান দেখাচ্ছেন, তার ফলে শুধু শরৎচন্দ্র নয়—দেশের সাহিত্যিকমাত্রেই ধন্য হবে। সাহিত্য মানবসভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ। সুতরাং সাহিত্যের প্রতি প্রীতি ও ভক্তি প্রদর্শন করে, সমগ্র সমাজ স্বীয় সভ্যতারই প্রমাণ দেন। এই কারণে আমি এই শরৎবন্দনাকে একটি শুভ সামাজিক ব্যাপার বলে মনে করি। এবং এ ব্যাপারের ফলে বাঙলা সাহিত্যের যে শ্রীবৃদ্ধি হবে—সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং আমি সর্বান্তঃকরণে এ বন্দনায় যোগদান করছি—একটি স্বনামধন্য বাঙালী সাহিত্যিকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে এবং সেই সঙ্গে ভাবী বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির আশায়।

# শরৎচন্দ্র

## হুমায়ুন কবির

দরদী তোমারে কেমন করিয়া জানাব আজি
তোমার দরদে মোরাও দরদী সবে ?
লক্ষ বুকের দুঃখ-সুখের রচিয়া সাজি
আনিয়াছ তুমি অশ্রুতে উৎসবে।
কোথা পল্লীর জড়তার গুরু বিষম ভার
প্রাণের সহজ প্রকাশ রুধিছে বারম্বার.
অসহায় হিয়া সহিয়া চলেছে অত্যাচার
কেবল বিলাপ জানায়ে আর্তরবে।
কবি, তুমি মূক নিগূঢ় গোপন সে বেদনার
দীপ্ত কাহিনী ধ্বনিয়া তুলিলে ভবে।

হেথায় মোদের সমাজ-শাসন কঠিন ঘোর,
বাধার ওপর বাঁধন রচিনু কত,
সে কারা গাঁথিতে কত চোখে বহে অশ্রুলোর,
ভিত্তিতে কত হৃদয়রক্তস্রোত।
কত অপমান, বেদনা, হতাশা, অশ্রুনীরে
নির্মম জড় কঠিন প্রাচীর রেখেছে ঘিরে.
তাহার রুদ্ধ পাষাণকক্ষে কাঁদিয়া ফিরে
ভগ্ন মনের হাহাকার অবিরত।
পেঁৗছেনি ভীরু যে কথা মোদের হৃদয়তীরে
সে ব্যথারে তুমি দিলে রূপ শাশ্বত।
মোদের জীবনে আনন্দ কোথা, কোথায় হাসি ?
চিন্তাবিহীন উচ্চ হরষ-রোল ?
একটানা ঢিমা জীবনের ছায়া পড়েছে আসি—
শিশুও ভুলেছে আনন্দকল্লোল।
কোথা বিচিত্র জীবনের নব প্রকাশ নিতি ?
হৃদয়দোলানো আশা-আশঙ্কা হর্ষভীতি ?
গোপনে চিত্ত উদ্বেল করি তীব্র গীতি
জীবন-প্রকাশ করিতেছে চঞ্চল ?

প্রতীদিন মাঝে আমরা হেরিনু প্রাচীন রীতি
তুমি হেরিয়াছ সেথায় প্রাণের দোল।

অতীত স্বপন নিয়ে যারা চাহে থাকিতে ভুলি
বর্তমানের কঠিন সত্যরাশি,
নিষ্ঠুর করে তুমি তাহাদের নয়ন খুলি
আজিকার রূপ তাদের দেখালে আসি।
দেশেব শ্মশানে ফিরি আজি মোরা প্রেতের দল।
ক্ষীণ কঙ্কাল টানিবার মত নাহিক বল,
প্রাণহীন দেহ, শুকাইয়া গেছে অশ্রুজল,
নির্জীব শব কালস্রোতে চলে ভাসি।
তোমার বজ্রবাণীতে আলোড়ে মর্মতল
যুগান্তরের পুঞ্জ জড়তা নাশি।

দেশের মনের বেদনারে তুমি দিয়াছ ভাষা,
তোমার কণ্ঠে মোরা তাই খুঁজি বাণী।
ব্যক্তিজীবনে চিরদিনকার লুকানো আশা
তারেও খুঁজিয়া ভাষা তুমি দিলে আনি।
বালকমনের অতি ছোট সুখ বেদনা ক্ষীণ,
প্রতি দিবসের জীবনের যত রজনী দিন,
হতভাগিনীর কঠিন হতাশা অশ্রুহীন,—
সকলি আপন বক্ষে লইলে টানি।
সাধনারে তুমি স্বপ্নের মোহে করনি লীন
দুঃখ সহিলে সত্যের সন্ধানী।

# শরৎচন্দ্র

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

তখনও কৈশোর অতিক্রম করি নাই, ইস্কুলে পড়িতাম, তখন হইতেই গল্প লিখিতে শুরু করি। কেন লিখিতাম জানি না। দুঃখদেবতার কৃপাদৃষ্টি অতি শৈশব হইতেই আমার উপর একটুখানি বেশি। কাজেই জীবনের দুঃখময় দিনগুলি যখন আর কোনো প্রকারেই অতিবাহিত হইতে চাহিত না, তখন ভাবিতাম হয়তো একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে দুঃখের কথাগুলি নিঃসংকোচে বলিতে পারিলেও বা সে গুরুভার লাঘব হয়—কতকটা নিষ্কৃতি পাই। কিন্তু পাছে আমার সে-দুঃখকে কেহ উপহাস করে এই ভয়ে কাহারও কাছে কিছু বলিতাম না। সহপাঠী বন্ধুদের মধ্যে আমার সমদুঃখভোগী কেহ ছিলও না। কাজেই একা-একা ঘুরিয়া বেড়াইতাম। অতি শৈশবে মা হারাইয়াছিলাম। ভাবিতাম মানুষ মরে কেন এবং মরিলেই বা যায় কোথায়? ইহাই ছিল তখনকার দিনে আমার একমাত্র চিন্তার বিষয়।

সহসা একদিন কী যে মনে হইল কে জানে, নিজের জীবনের ঘটনাগুলি অতি সংক্ষেপে সাজাইয়া নিজের নামের জায়গায় অন্য একটা কাল্পনিক নাম দিয়া গল্পের আকারে লিখিতে বসিলাম। মন্দ লাগিল না। ভাবিতাম বন্ধু না মিলুক, ভবিষ্যতে মনের মতো বান্ধবী যদি মিলে তো তাহারই হাতে আমার এ খাতাখানি তুলিয়া দিব। জীবনে আমার ঘটনার আর অন্ত ছিল না। দিনের পর দিন অত্যন্ত সযত্নে পাতার পর পাতা লিখিয়া চলিলাম।

কিন্তু সে লেখা আমার বেশিদিন চলিল না। একদিন ধরা পড়িলাম।

যাঁহার বাড়িতে থাকিয়া আমার বিদ্যালাভ চলিতেছিল তাঁহার গৃহিণী আমার মঙ্গল-কামনায় স্বামীকে দিয়া আমায় যৎপরোনাস্তি প্রহার করাইলেন এবং তিনি স্বয়ং একটি দিয়াশলাই-এর কাঠি জ্বালাইয়া আমার সে খাতাখানি আমারই চোখের সম্মুখে পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিলেন। সেদিন আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তুটিকে এমনভাবে ভস্মীভূত হইতে দেখিয়া কী নিদারুণ দুঃখভোগ যে করিয়াছিলাম তাহা আমার আজও মনে আছে।

মনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। গোপনে আবার অমনি একটা খাতা বাঁধিব কিনা তাহাই ভাবিতেছি, এমন দিনে আমার এক সহপাঠী বন্ধু বলিল, 'একখানা নভেল পড়বি?'

'কেমন নভেল?'

'খুব ভাল। আমি পড়েছি। দিদি এনেছে শ্বশুরবাড়ি থেকে। জামাইবাবু দিয়েছে।'

বলিলাম, 'পড়ব।'

শশাঙ্ক বলিল, 'তোকে ভাই আসতে হবে আমার সঙ্গে। দরজায় দাঁড়াবি, আমি লুকিয়ে এনে দেবো।'

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। থানার মাঠে আলো জ্বলিয়াছে। বাড়ি তাহাদের বেশি দূরে নয়।

দরজার সম্মুখে আস্তাবল। সেই আস্তাবলের পাশে অন্ধকারে ঠিক চোরের মতো দাঁড়াইয়া রহিলাম।

আনিতে দেরি হইতেছিল। তাহাকেও লুকাইয়া আনিতে হইবে। কাকার কাছে ধরা পড়িলেই মুশকিল। পাঁচকড়ি দে'র দুখানি 'ডিটেকটিভ' তখন শেষ করিয়াছি। একখানা ভারি ভাল লাগিয়াছে, আর একখানা ভাল লাগে নাই। ভাল না লাগিবার কারণ—ডিটেকটিভকে লক্ষ্য করিয়া যতগুলো গুলি ছোঁড়া হয় কোনোটাই তাহার গায়ে লাগে না, কোনোটা বা কানের পাশ দিয়া কোনোটা বা হাতের পাশ দিয়া ফস্ করিয়া পার হইয়া যায়, আর ডিটেকটিভের কোনও গুলিই ফাঁক যায় না—সন্ধান একেবারে অব্যর্থ। এইটা কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকিয়াছিল, তাই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিলাম, ও-রকম ডিটেকটিভ হয় তো পড়িব না।

অনেকক্ষণ পরে শশাঙ্ক আসিয়া চুপিচুপি একখানি বাঁধানো বই আমার হাতে দিল। বইখানি হাতে পাইবামাত্র সেখানে দাঁড়ানো আর প্রয়োজন বোধ করিলাম না, কাপড়ের তলায় লুকাইয়া ছুটিয়া একেবারে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ি আসিয়া পেঁৗছিলাম। তক্তপোশের উপর পড়িবার বই খুলিয়া রাখিয়া গিয়াছিলাম, পুনরায় লক্ষ্মীছেলের মতো সেইখানে বসিয়া নভেলখানি আলোর সম্মুখে খুলিয়া ধরিলাম। চকচকে মলাট। নাম—'বিন্দুর ছেলে'। বইখানি একবার উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিয়া ভাবিলাম, খাওয়া-দাওয়ার পর দরজায় খিল বন্ধ করিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়াই পড়িতে বসিব। কিন্তু এক লাইন দু' লাইন করিয়া পড়িতে পড়িতে এমনি মন বসিয়া গেল যে আর ছাড়িতে পারিলাম না। খাইবার ডাক পড়িল। বলিলাম, 'যাই।' দ্বিতীয়বার যখন ডাকিতে আসিল, আমার এখনও মনে আছে, অন্নপূর্ণা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'আজ আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে শপথ করছি, ওদের ভাত খাবার আগে যেন আমাকে ব্যাটার মাথা খেতে হয়।'

এই না শুনিয়া 'কি করলে দিদি!' বলিয়া বিন্দু মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে।

বলিলাম, 'খাব না। অসুখ করেছে।' উহাই যথেষ্ট। সত্যই অসুখ করিয়াছে কিনা এবং কী রকম অসুখ তাহা কেহই দেখিতে আসিবে না জানি। দরজায় খিল বন্ধ করিয়া দিয়া আবার পড়িতে আরম্ভ করিলাম। প্রথম গল্পটি শেষ হইয়া গেল। আমার চোখের জল তখনও শুকায় নাই। বুকের ভিতরটা

তোলপাড় করিতে লাগিল। চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। আমার খাতার শোক তখন আমি ভুলিয়া গেছি। পুড়াইয়া দিয়াছে, ভালই হইয়াছে। লিখিতে হইলে এমনি করিয়াই লিখিতে হয়।

তাহার পর দ্বিতীয় গল্প—'রামের সুমতি'। এখনও মনে আছে, ধরিয়া ধরিয়া একটু একটু করিয়া পড়িতে লাগিলাম। ভয় শুধু পাছে তাড়াতাড়ি শেষ হইয়া যায়।

গল্প লিখিয়া কেহ যে কাহাকেও এমন করিয়া কাঁদাইতে পারে তাহা জানিতাম না। কাঁদিতে কাঁদিতে বই-এর উপর মাথা রাখিয়া কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম বুঝিতে পারি নাই। ঘুম যখন ভাঙিল, দেখি,—সকাল হইয়া গেছে, আমি তেমনি উপুড় হইয়া পড়িয়া আছি, আর শিয়রের কাছে আলো জ্বলিতেছে।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সেই যে আমার চোখের জলে পরিচয়ের শুরু, সে পরিচয় অন্তরে আমার আজও তেমনি নিবিড় হইয়া আছে।

শহরে একটি লাইব্রেরি তখন খোলা হইয়াছে, কিন্তু আমাদের বয়সের ছেলেকে বই দেওয়ার নিয়ম সেখানে ছিল না, নভেল পড়িয়া ছেলেরা পাছে বিগড়াইয়া যায় এই ভয়ে। টিফিনের সময় কিছু খাইবার জন্য রোজ দুইটি করিয়া পয়সা পাইতাম। লাইব্রেরির মাসিক চাঁদা চার আনা। টিফিনের ঘণ্টা বাজিলেই দূরে রেল-লাইনের ধারে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে লাগিলাম। আটদিন পরে দেখিলাম চার আনা পয়সা জমিয়াছে। আমাদের গ্রামের একজন ময়রাদের ছোকরা ইস্কুলের কাছেই পানের দোকান করিত। সেদিন পরমানন্দে সেই চার আনা পয়সা তাহার হাতে দিয়া বলিলাম, 'আজ তোমাকে যেতে হবে গোষ্ট, চল।' দু-তিন দিন ধরিয়া ক্রমাগত তাহার খোসামুদি করিতেছিলাম এবং এই অঙ্গীকারে শেষ পর্যন্ত সে রাজি হইয়াছিল যে, বইগুলি তাহাকে একবার করিয়া পড়িতে দিতে হইবে। পথে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'নামটি মনে আছে তো গোষ্ট?' গোষ্ট বলিল, 'তা আবার মনে নেই? বই আমি এনে দিলেই তো হলো! চার আনা পয়সা দাম দিয়ে বলব—সুরেন্দ চন্দ টাটুজ্যের বই দাও।' অগত্যা একটি কাগজের উপর পেন্সিল দিয়া 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' নামটি তাহাকে লিখিয়া দিতে হইল।

লাইব্রেরির দরজার পাশে লুকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। গোষ্ট ভেতরে ঢুকিয়া বই চাহিল। লাইব্রেরিয়ান এ-খাতা সে-খাতা ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া খানিক পরে বলিল, 'না, ও-নামে 'অথার' নেই। সুরেন ভট্চাজের বই নিয়ে যাও। খুব ভাল বই।' গোষ্ট আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিল। পয়সা চার আনা ফেরত লইয়া বাড়ি ফিরিলাম।

আমাদের সে কমলা-কুটির দেশে শরৎচন্দ্র তখনও পর্যন্ত পোঁছিতে পারেন

নাই। তখন পাঁচকড়ি দে ও সুরেন ভট্‌চাজের যুগ। তাহার পরেও অনেক-বার আমি অনেককে দিয়া শরৎচন্দ্রের বই সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তখন কে-ই বা তাঁহার খবর রাখে!

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া কলিকাতায় আসিলাম কলেজে পড়িবার জন্য। আসিয়াই আমার কাজ হইল শরৎচন্দ্রের বই পড়া। তখন পর্যন্ত যতগুলি বই তাঁহার ছাপা হইয়াছিল একে একে সবই পড়িয়া ফেলিলাম। মাস-দুই ধরিয়া কলেজের পড়া একরকম পড়ি নাই বলিলেই হয়। কী আনন্দে যে দিনগুলো আমার কাটিয়াছিল তাহা আমার এখনও মনে আছে, চিরদিন মনে থাকিবে।

শরৎচন্দ্রের উপর শ্রদ্ধায় আমার সমস্ত অন্তঃকরণ ভরিয়া উঠিল। কী ভাল যে তাঁহাকে বাসিলাম, কত ভালো যে লাগিল তাহা লিখিয়া বুঝাইবার নয়। বই-এর মধ্যে বই-এর মানুষটিকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। দুনিয়ার নরনারীকে যিনি এমন করিয়া ভালবাসিলেন, দুর্ভাগ্যলাঞ্ছিত মানবের বেদনা-বিদগ্ধ জীবনের কাহিনীকে যিনি মহিমান্বিত করিয়া তুলিলেন, বহু বিচিত্র জীবনের গোপন রহস্যপুরে সহানুভূতিকরুণ একটি মমতাময় তীক্ষ্ণদৃষ্টি যাঁহার সদাজাগ্রত, সে ব্যক্তিটি নিজে কেমন, কোথায় তাঁহার দেশ, কী করেন, কোথায় থাকেন—জানিবার কৌতূহল দিনে দিনে বাড়িয়াই চলিতে লাগিল।

নিজের দুঃখকে মানুষ চিরকাল বড় করিয়াই দেখে। ভাবিতাম শরৎচন্দ্রও আশৈশব ঠিক আমার মতো দুঃখভোগ করিয়াছেন। তাই কখনও 'রামের সুমতি'র রামের মধ্যে, কখনও দেবদাসের মধ্যে, কখনও শ্রীকান্তের মধ্যে, কখনও জীবানন্দের মধ্যে—তাঁহার সন্ধান করিয়া ফিরিতাম।

নানাজনের মুখে নানা গুজব শুনিতাম। কেহ বলিত, লোকটা পাগল, কেহ বলিত অদ্ভুত, কেহ বলিত আরও-কিছু। কখনও শুনিতাম মানুষটি বর্মামুলুক হইতে আসিয়াছেন—বামাচারী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী, সঙ্গে সর্বদা একপাল কুকুর থাকে, গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করেন, মুখে একমুখ দাড়ি, চুলগুলো বড় বড়, মাথায় পাগড়ি বাঁধা।

অন্নদাদি যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সাপুড়ে সাহ-জির সঙ্গে মনে-মনে মিলাইয়া দেখিতাম। ভাবিতাম এমন অদ্ভুত মানুষ যখন, তখন সাপ তিনি নিশ্চয়ই ধরিতে পারেন।

কখনই কি তাঁহাকে দেখিতে পাইব না?

শুনিতাম, তিনি শিবপুরে থাকেন।

আবার এক-এক সময় ভাবিতাম, থাক, আর দেখিয়া কাজ নাই। যাহা শুনিয়াছি হয়তো সবই ভুল, সবই মিথ্যা, হয়তো তিনি ঠিক আমাদেরই মতো

মানুষ। এ ভুল ভাঙিবার কোনও প্রয়োজন নাই, আমার অন্তরের সেই অপরূপ শরৎচন্দ্র বিধাতার মতো রহস্যময় হইয়াই থাকুন।

সাহিত্যকে আশৈশব ভালবাসিয়া আসিয়াছি, কিন্তু কে জানিত সাহিত্যই একদিন আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইয়া উঠিবে, কে জানিত শরৎচন্দ্রকে একদিন দেখিতে পাইব! এবং শুধু দেখিতে পাওয়া নয়, তাঁহার সঙ্গে পরিচয় যে আমার একদিন ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবে, তাঁহার স্নেহাশীর্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হইব, সে ধারণা কোনো দিন করিতে পারি নাই। তাঁহার সম্বন্ধে উদ্ভট গুজব আজ আমার কাছে মিথ্যা হইয়া গেছে। বাংলার মাটির মতো স্নেহপ্রবণ সহজ সুন্দর একটি মানুষ! স্নিগ্ধ শান্ত তাঁহার সে দুটি আয়ত চক্ষের সুগভীর দৃষ্টির মধ্যে একটি অতলস্পর্শী রহস্য লুকানো, তাঁহার সে প্রশান্তপ্রসন্ন মুখচ্ছবি একবার দেখিলে সহজে আর তাহা ভুলিবার উপায় নাই। স্নেহ-বঞ্চিত বুভুক্ষু অন্তর, রিক্ত রুক্ষ তপঃক্লিষ্ট সন্ন্যাসী, আকাশের মতো উদার, বিধাতার মতো উদাসীন।

আজ ভাদ্র-সংক্রান্তি। শরৎচন্দ্রের সপ্তপঞ্চাশত্তম জন্মতিথি। দেশবাসী আজ তাঁহাকে সংবর্ধনা করিবে, শ্রদ্ধা নিবেদন করিবে। এমনি কত ভাদ্রের কত সংক্রান্তি যে তাঁহার পথে-প্রান্তরে কাটিয়াছে কে জানে, গৃহহীন স্নেহহীন স্বজনবান্ধবহীন শিল্পী হয়তো বেদনা-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অবহেলিত উপেক্ষিত অবস্থায় বহু জন্মতিথিতে পথে পথে কাঁদিয়া ফিরিয়াছেন। কেহ তখন একটি-বার ফিরিয়াও চাহে নাই। আজ এতদিন পরে যে তাহাদের সে-শুভবুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছে তাহার জন্য বিধাতাকে ধন্যবাদ! যাহাদের জন্য তিনি বিষপান করিয়া অমৃতের তপস্যা করিলেন আজ তাঁহাকে বাঁচাইবার প্রয়োজন যে তাহারাই অনুভব করিয়াছে ইহাই যথেষ্ট। দেশবাসীর আজ এই শ্রদ্ধা-সম্মান এই আদর-অভ্যর্থনা শরৎচন্দ্রের দুই চক্ষু ভরিয়া অশ্রু আনিবে তাহা জানি, কিন্তু তবু ইহার একান্ত প্রয়োজন।

নিজের তরফ হইতে বলিবার আর কীই-বা আছে! যাঁহাকে দিনের পর দিন পূজা করিয়াছি, তাঁহাকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা যদি আজ কাগজে-কলমে লিখিয়া নিবেদন করিতে হয় তো তাহার চেয়ে বিড়ম্বনা বোধকরি আর কোথাও কিছুই নাই। অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা-নিবেদনের ভাষা আমার অজ্ঞাত। ভাষা যেখানে মূক, হৃদয় যেখানে পরিপূর্ণ আনন্দে স্তব্ধ, গোপন অন্তস্তলের সেই নিভৃত নীরব জ্যোতির্মণ্ডে আমাদের অগ্রজ শিল্পী এই শরৎচন্দ্রের সিংহাসন পাতিয়া রাখিয়াছি। প্রকাশকুণ্ঠ ভাষা যদি আজ তাঁহাকে সেখান হইতে টানিয়া সর্বজনসমক্ষে বাহির করিতে অসমর্থই হইয়া থাকে তো আশাকরি আমার অন্তর্যামী সেজন্য আমায় ক্ষমা করিবেন।

## নলিনীকান্ত সরকারকে লেখা শরৎচন্দ্রের একটি চিঠি

সামতাবেড়, পানিত্রাস
হাওড়া

প্রিয় নলিনীবাবু,

আপনার চিঠি পেলাম কিন্তু এমনিতেও যে সময় ফেরবার শক্তি নেই। আট দশ দিন থেকে মাথা-ধরা বিশ্রী আকারে দাঁড়িয়েছে একটা dull বেদনা লেগেই আছে। ডাক্তারের আদেশ লেখা-পড়া না করার জন্য।

এই (সাধারণ) অনুরোধটি যে রাখতে পারলাম না তার জন্য আন্তরিক দুঃখিত। ভবিষ্যতে যদি কখনো প্রয়োজন হয় হপ্তা খানেক আগে যদি একটা চিঠি লিখে পাঠান ত আর কোন গোল হবে না। ৩/৪ দিন পরে কলকাতায় যাব তখন আপনার সঙ্গে দেখা হবেই।

খবরের কাগজে পড়ি যে আপনাদের নাকি অভিনন্দন প্রায়ই হয় [illegible]। ভেবেছি [illegible] আমারও আমার মত কাজ পালা হয়ে গেলেই

হবে নিশ্চয়ই।

আমার শরীর বৃদ্ধ—না ভোগাচ্ছে কিন্তু সামলে উঠেছি। শুধু চোখ বেশ আগেকার রইল ভালো।

নমস্কার জানবেন।

ইতি ১১ই জ্যৈষ্ঠ ৩৯

আপনার

শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

# শরৎ-সাহিত্যের আভাস

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

শরৎচন্দ্র আজ জীবনের ষষ্ঠপঞ্চাশৎ বৎসর অতিক্রম করিলেন ; বাঙলা দেশ ও বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে ইহা পরম কল্যাণ ও সৌভাগ্যের কথা। কমলবনের সরস্বতী তাঁহাকে আরো সুদীর্ঘকাল বাঁচাইয়া রাখিয়া আরো নূতনতর সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করুন, এই প্রার্থনা করি।

বাঙলা সাহিত্যের একটি পরম শুভক্ষণে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছে। এই হিসাবে শরৎচন্দ্র সৌভাগ্যবান্ সন্দেহ নাই। তাঁহাকে ঊষর ভূমি কাটিয়া জল ঢালিয়া ফসল ফলাইতে হয় নাই ; ভূমি তাঁহার জন্য তৈরী হইয়াই ছিল। বঙ্কিম যেমন করিয়া নূতন ভাষা গড়িয়াছেন, এবং বাঙলা ভাষাকে সাহিত্যের আসনে উন্নীত করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ যেমন করিয়া বঙ্কিমের ভাষার জড়িমা ঘুচাইয়া তাহাকে সহজ-সরল ও সাবলীল করিয়াছেন এবং বাঙালী পাঠকের মনে বিচিত্র রসবোধ ও সৌন্দর্যানুভূতির সৃষ্টি করিয়াছেন, শরৎচন্দ্রকে তেমন কিছু করিতে হয় নাই। শরৎচন্দ্রের জন্য বাঙালী পাঠকসমাজ তৈরী হইয়াই ছিল, কাজেই তিনি যখন নামিলেন, তখন তাঁহাকে কাহারও পরিচয় করাইয়া দিবারও প্রয়োজন হইল না, সহজেই তিনি সকলের মন জুড়িয়া বসিবার সুযোগ পাইলেন। ভাষার জন্যও তাঁহাকে খুব কিছু ভাবিতে বা নূতন কিছু সৃষ্টি করিতে হইল না—বঙ্কিমের পর রবীন্দ্রনাথ বাঙলা ভাষার যে রূপদান করিয়াছেন, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অতি তুচ্ছ সুখ-দুঃখের কথা ও কাহিনীগুলি সরল করিয়া বলিবার জন্য ভাষার মধ্যে যে অদ্ভুত শক্তি তিনি সঞ্চার করিয়াছেন এবং যে সর্বাঙ্গীণ ভঙ্গিমার সন্ধান তিনি দিয়াছেন, শরৎচন্দ্র তাহাকেই পরিপূর্ণ রূপে নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন, এবং সেই ভাষাকেই নিজের মতন করিয়া গড়িয়া সাজাইয়া সকল নৈবেদ্যের থালায় পরিবেশন করিয়া দিয়াছেন।

আমাদের বাঙালী জীবনের বাস্তবতাকে অবলম্বন করিয়া শরৎচন্দ্র যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, বাঙলা সাহিত্যের যে-দিকটি তিনি কমলগুচ্ছে সাজাইয়াছেন, তাহার রসসমৃদ্ধির তুলনা পাওয়া কঠিন। আমাদের সমাজ ও পারিবারিক জীবনের সুখ-দুঃখের মধ্যে যে এত মাধুর্য তাহা কে কবে জানিত এমন রসানুভূতির দৃষ্টি লইয়া কে কবে আমাদের জীবনের দিকে তাকাইয়াছিলাম ? আমাদের সমাজ ও পরিবারের সঙ্গে তো আমাদের চিরকালের পরিচয়, তাহার সুখ-দুঃখ তো আমরা প্রতিদিন ভোগ করি, কিন্তু তাহার মধ্যে এমন নিবিড় রসানুভূতির সঞ্চার যে সম্ভব, সুখদুঃখের মাধুর্য যে এত

বেশী, তাহা কি আমরা ভাল করিয়া জানিতাম, না, আমাদের মনের অনুভূতির অলিগলি যে এত সূক্ষ্ম ও জটিল, সে সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল? বস্তুতঃ, উপন্যাসের বাস্তব ঘটনাপর্যায়ের মধ্যে এমন তীব্র হৃদয়াবেগের সঞ্চার, এমনি সুতীক্ষ্ম অনুভূতির প্রেরণা এবং সর্বোপরি কি চরিত্র, কি ঘটনাবস্তু—সব কিছুকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ভাবের মোহে ও ভাষার জালে এমন মাদকতার সৃষ্টি শরৎচন্দ্রের আগে বাঙলা সাহিত্যে আমরা কমই দেখিয়াছি। শরৎচন্দ্রই বোধ হয় সর্বপ্রথম না হইলেও, সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তি ও সাহসে আমাদের চিত্তের খেয়াল ও সংস্কারকে, হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র লীলাকে সাহিত্যের আসরে টানিয়া নামাইলেন, এবং আমাদের জীবনের অনেক গোপন অলিগলির লজ্জা ও দৈন্য ঘুচাইলেন।

শরৎচন্দ্রের কথা বলিবার ভঙ্গীটিও সুন্দর ও মধুর, খুব সহজ (ডাইরেক্ট) সরল (সিনসিয়ার) ও স্বাভাবিক। তাহার একটি লঘুগতি আছে, কিন্তু তাহা চপল ও চটুল নহে। দুজনার কথাবার্তা যেখানে, সেখানেও বলিবার ভঙ্গী বুদ্ধি ও অনুভূতিতে উজ্জ্বল ও সরস, কিন্তু তীব্র ও প্রখর নহে। কথাবার্তার মধ্যে উজ্জ্বল হাস্যরসের কিছু প্রাচুর্য নাই, কিন্তু সরস রসিকতার লঘু হাসির আনন্দ আছে, এবং তাহার মধ্যে সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ণনার ভঙ্গীটিও খুব অভিনব ; এমন ঘরোয়া অথচ এমন সরল ও সরস করিয়া ঘটনা ও চরিত্র বর্ণনা করিবার শক্তি খব সহজ শক্তি নয়। এই কথার ভঙ্গী, এই বর্ণনার ভঙ্গী, ভাষার সহজ লঘুগতি, শব্দের সহজ অনাড়ম্বর সব কিছু লইয়া তাহার যে 'স্টাইল' সে যেন এক নূতন সৃষ্টি, নূতন রূপ।

শরৎচন্দ্র ঔপন্যাসিক। জীবনের বিচিত্র বাস্তবতা লইয়া উপন্যাস ; তাহার বিচিত্র ঘটনাপর্যায়ের তন্তুজাল বুনিয়া বুনিয়া তবে উপন্যাসের রসসৃষ্টি। সেইজন্য ঔপন্যাসিক যিনি, জীবনের প্রত্যেক চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে তাঁহাকে তালে তালে পা ফেলিয়া চলিতেই হইবে ; জীবনের সঙ্গে বিচ্যুত হইলে চলিবে না। শরৎচন্দ্র তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টিতে কোথাও জীবন হইতে নিজেকে বিচ্যুত করেন নাই, একান্তভাবেই তাহাকে মানিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার জীবনে এই বিচিত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার সুযোগও যথেষ্ট হইয়াছে। যে চরিত্রগুলিকে তিনি তাঁহার উপন্যাসে অমরত্ব দান করিয়াছেন, তাহার প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গেই জীবনের কোনো না কোনো সময়ে তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিয়াছে। কৈশোরের ইন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রৌঢ় বয়সের জীবানন্দ পর্যন্ত কেহই তাঁহার অপরিচিত নয়। চরিত্র ছাড়া, যে-সব প্রশ্ন ও সমস্যা তাঁহার বিষয়বস্তুর তন্তু বুনিয়া তুলিয়াছে, তাহারাও তাঁহার একান্ত পরিচিত। জীবনের নানান ক্ষেত্রে নানান ভাবে তিনি তাহাদের সম্মুখীন হইয়াছেন। ইহার ফলে লাভ হইয়াছে এই যে তাঁহার প্রায় সব সৃষ্টিই আমাদের বাস্তব জীবনের কাছে অধিকতর

সত্য, এবং আমাদের অনুভূতির নিকটতর ও সেই হেতু প্রিয়তর। তাঁহার গল্প ও উপন্যাসের বিষয়বস্তু এবং মনের বিচিত্র তরঙ্গলীলা আমাদের একান্ত পরিচিত; শরৎচন্দ্র এই পরিচিত রাজ্যকেই সরস ও বিচিত্রভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। সেইজন্যেই তাহারা এত সহজে আমাদের চিত্তকে আন্দোলিত করে এবং সহজেই পাঠক তাহাদের রসবোধে সমর্থ হয়।

শরৎচন্দ্রের প্রতিভা সকল বস্তুর এক অখণ্ড রসপরিণাম স্বীকার করে না; তাঁহার অনুভূতি কখনও বস্তুকে ছাড়াইয়া রসের ঊর্ধ্বলোকে, ভাবের কল্প-জগতে বিচরণ করে না। তাঁহার মনের মধ্যে মানুষের সুখদুঃখের অনুভূতি নির্দিষ্ট বস্তু, ব্যক্তি ও অবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট হইয়া জাগিয়া থাকে—বস্তুকে অতিক্রম করিয়া বিশ্ব চরাচরের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে না। শরৎচন্দ্রের প্রতিভা সেইজন্য আমাদের জীবনের সীমাবদ্ধ আবেষ্টনের মধ্যে তার একান্ত সত্য সুখদুঃখকেই খুঁজিয়াছে, এবং তাহাকেই একান্ত নিবিড় করিয়া একান্ত আত্মগত করিয়া অনুভব করিয়াছে। পৃথিবীর ধুলোমাটির দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই, প্রকৃতির বিচিত্রতার দিকেও নয়—মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গে ইহাদের তিনি বাঁধিতে যান নাই, সেদিকে তাঁহার কল্পনা প্রসারিত হয় নাই। তাঁহার কল্পনা একেবারে ভাবগত নহে, একান্তভাবে অনুভবগত। সহানুভূতি দিয়াই সকলের দুঃখের তিনি পরিমাণ করিতে চাহিয়াছেন, নিজের ভাবের দ্বারা তাহাকে ব্যাপক করিয়া দেখেন নাই।

শরৎচন্দ্র জীবনকে দেখিয়াছেন আমাদের পরিবার ও সমাজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া—যে জীবন একই সঙ্গে ত্যাগে উজ্জ্বল ও স্বার্থে পীড়িত, অনুভূতিতে গভীর ও শাসনসংস্কারে ক্লিষ্ট। তিনি দেখিয়াছেন আমাদের পরিবারে ও সমাজে অত্যাচার ও ব্যভিচারের লীলা, দুঃখ ও দৈন্যের নিষ্করুণ উৎপীড়ন, বিধি-নিষেধের যুক্তিহীন নির্যাতন, এবং আমাদের ব্যক্তিজীবনে এই নির্যাতন, অত্যাচারের ও উৎপীড়নের সীমাহীন দুঃখ ও ক্রন্দন। যতটুকু তিনি দেখিয়াছেন খুব নিবিড় করিয়া খুব গভীর করিয়াই দেখিয়াছেন—সে দৃষ্টির গভীরতার তুলনা নাই। আমাদের এই বাস্তব জীবনের দুঃবেদনার মধ্যেই তাহার কল্পনার যত প্রসার। এই দুঃখ-বেদনাকে তিনি নিজের মনের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। এই গভীরতা যেখানে যতটুকু দুঃখ-বেদনার পরিমাপ করিতে পারিয়াছে, সেখানে ততটুকু তাঁহার কল্পনা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

বাস্তব জীবনের অজ্ঞাত কল্পনানুভূতির সুগভীর জগৎটির মধ্যে শরৎচন্দ্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন, এবং আমাদের সহানুভূতির মধ্যে তাঁহার আসন পাতিয়া দিলেন। অপূর্ব রসে ও আবেগে আমাদের সমাজ ও পরিবার-বদ্ধ দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব রূপটি আমাদের চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হইল। দুঃখে ও বেদনায় তিনি ব্যথিত হইলেন, বিধি-নিষেধের

উৎপীড়নে পীড়িত হইলেন—তাহাদের লইয়া চিন্তাও হয়তো করিলেন, কিন্তু তাহার মূল অথবা মীমাংসার কিছু খুঁজিতে গেলেন না ; তাহাদের লইয়া কিছু বিচার করিতে বসিলেন না। ভালই করিলেন, দুঃখের বিচার অথবা মীমাংসা যে আমরা পাইলাম না তাহাতেই তো দুঃখের বেদনা আমাদের কাছে গভীর হইয়া উঠিতে পারিল—তিনি দুঃখের স্বরূপটিকে আমাদের কাছে ধরিয়া দিলেন মাত্র। রমেশ যে সমাজ কর্তৃক উৎপীড়িত হইল, রমা রমেশ হৃদয়ের মধ্যে যে প্রেম বহন করিয়া সামাজিক বিধিনিষেধের বশে প্রেমের সার্থকতা পাইল না—ইহার দুঃখের স্বরূপটিকেই শরৎচন্দ্র আমাদের দেখাইলেন, সামাজিক অনুশাসনের কিছু বিচার তিনি করিলেন না, কিংবা তাহার মীমাংসা করিয়া দুজনকে একত্র মিলিত করিয়া দিলেন না। সেইজন্যেই আমাদের সহানুভূতির মধ্যে তাহাদের দুঃখ-বেদনা নিবিড় হইয়া উঠিল, তাহারা আমাদের হৃদয়ের নিকটতর হইল—এবং সাহিত্য হিসাবে শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি সার্থক হইল। সাবিত্রীকে, অন্নদাদিদিকে তো দেখিলাম—আমাদের সমাজ যে কী করিয়া তাহাদের ললাটে অসতীর গভীর কালো ছাপ মারিয়া দিয়াছে তাহাও দেখিলাম, কিন্তু কোথাও দেখিলাম না তাহার অথবা শরৎচন্দ্রের লেখনী সমাজের এই নিষ্ঠুর বিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল, অথবা তাহার একটা মীমাংসা করিল। কিন্তু তাহাদের চরিত্রের বাস্তব রূপটি এমন করিয়া আবেগে, এমন সহানুভূতিতে আমাদের কাছে চিত্রিত হইল যে তাহাদের সতীত্ব সম্বন্ধে আমাদের মনে দ্বিধামাত্র রহিল না এবং তাহাদের জীবনের দুঃখ ও উৎপীড়নের উপর দিয়াই আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অনন্তকালের জন্য তাহারা বাঁচিয়া রহিল।

শরৎচন্দ্রই সর্বপ্রথম কোন বুদ্ধির বলে নয়, যুক্তির বলে নয়—শুধু হৃদয়াবেগের ও অপূর্ব সহানুভূতির সাহায্যে দৈন্য ও সংস্কারপীড়িত বিধিনিষেধ-নির্যাতিত আমাদের বাস্তব জীবনকে আমাদের হৃদয়ের নিকটতর করিয়াছেন। পল্লীসমাজ হইতে আরম্ভ করিয়া দেনাপাওনা পর্যন্ত তাঁহার সব সৃষ্টিতেই আমাদের সমাজের ও পরিবারের নানান দুঃখ ও সমস্যার যে বাস্তব রূপ, যে সত্যরূপ—তাহাকে সমগ্রভাবে ফুটাইয়াছেন—কোথাও কিছুকে ক্ষমা করেন নাই। রমেশ-রমার দুঃখে, দেবদাসের দুঃখে আমরা ব্যথিত হই, সহানুভূতিতে হৃদয়ের কাছে তাহাদের টানিয়া লই, কিন্তু যখন ভাবি রমা বিধবা, এবং পার্বতী পরস্ত্রী তখন সংসারবদ্ধ সামাজিক চিত্ত আমাদের সঙ্কুচিত হয়। আমাদের রসবোধ তৃপ্ত হয় কিন্তু আমাদের চিরাচরিত সংস্কারবুদ্ধি তাহার সীমা অতিক্রম করিতে চাহে না। এই দুয়ের সংঘাতে আমাদের সামাজিক মনে একটা কঠোর জিজ্ঞাসা শরৎচন্দ্র জাগাইয়াছেন—তিনি বুদ্ধির মধ্যে জিজ্ঞাসা মীমাংসার

সুযোগ আমাদের দেন নাই ; সেই জন্যই তাঁহার যত আবেদন সমস্তই আমাদের হৃদয়ের মধ্যেই।

শরৎচন্দ্র বস্তুর রসকে কোথাও বিকৃত বা রূপান্তরিত করেন নাই। তবে কি শরৎচন্দ্র রিয়্যালিস্ট? আমার মনে হয়, শরৎচন্দ্র রিয়্যালিস্ট একেবারেই নহেন। রিয়্যালিস্ট সাহিত্যের স্রষ্টা যাহারা, তাহারা বস্তুর রূপকে হুবহু তার বাস্তবরূপেই দেখাইয়া থাকে, সে রূপের সঙ্গে তাহাদের আবেগ, অনুভূতি অথবা কল্পনা মিশাইয়া থাকে না। তাঁহারা বাস্তবজীবনের ফটোগ্রাফার, আর্টিস্ট নহেন। শরৎচন্দ্র বাস্তবজীবনের অবিকল ছবি আঁকিয়া চোখের সম্মুখে ধরেন নাই—সে ছবিকে তিনি হৃদয়ের রক্তে রাঙাইয়াছেন, আবেগে তাহাকে কম্পিত করিয়াছেন, এবং সর্বোপরি তাহাকে কল্পনানুভূতিতে রস-পরিপ্লুত করিয়াছেন।

# 'চরিত্রহীন' ও আধুনিকতা

**দীপ্তি ত্রিপাঠী**

'চরিত্রহীন' বাংলা উপন্যাস জগতে একটা বিস্ফোরণ সৃষ্টি করেছিল। 'যমুনা' পত্রিকা সম্পাদক ফণী পাল ব্রহ্মবাসী শরৎচন্দ্রকে তার পাঠিয়েছিলেন —'চরিত্রহীনে'র মুদ্রণে alarming sensation দেখা দিয়েছে। কেন? 'চরিত্রহীন' কি শুধুই দুর্নীতি? অশ্লীল? কুরুচি? উদ্দাম চিত্তবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খল রূপ? সাহিত্য ও দুর্নীতি নিয়ে প্রচণ্ড বিতর্ক তুলেছিল এই গ্রন্থ। কিন্তু কেন?

'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'চোখের বালি'র পর 'চরিত্রহীনে' এমন কি নূতনত্ব ছিল যে বাঙালী পাঠক এতটা নাড়া খেয়ে উঠেছিল? বৈধব্যের সংস্কার ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব যে মানুষকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে, সে তো বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন। তা হলে?

আসলে 'চরিত্রহীনে'র প্রধান বক্তব্য বিধবার সমস্যা নয়। শরৎচন্দ্র এখানে সমাজকে উপহাস করেছেন 'চরিত্রহীনে'র সংজ্ঞা নিয়ে। 'চরিত্রহীন' কাকে বলা উচিত? অতএব 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বা 'চোখের বালি'র সঙ্গে আপাতমিল থাকলেও 'চরিত্রহীন' সম্পূর্ণ নূতন ধরনের উপন্যাস যার মূল সমস্যা মোটেই সামাজিক নয়—নৈতিক। তথা মনস্তত্ত্বমূলক।

শরৎচন্দ্র নিজেও সে কথা বলেছেন।

(১) চরিত্রহীন ষটচক্রভেদ নয়। কেবল এথিক্‌স আর সাইকোলজি। ধর্ম নয়। (প্রমথ ভট্টাচার্যকে পত্র ৩/৫/১৩)

(২) ওটা সাইকোলজি এবং এ্যানালিসিস......একটা সম্পূর্ণ সায়েন্টিফিক এথিক্যাল নভেল। (ফণীন্দ্র পালকে পত্র ১০/৫/১৩)

'চরিত্রহীনে'র লেখার পদ্ধতিও ছিল অভিনব। রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছিলেন—'শরৎ, তুমি নাকি পিছন দিক দিয়ে চরিত্রহীন লিখেছ?' না, ঠিক তা হয়নি। তবে শেষের দু-চারটে অধ্যায় আগেই লিখেছিলেন। এই যে পারম্পর্যভঙ্গ এটা আধুনিক লক্ষণ। দ্বিতীয় আধুনিক লক্ষণ—শরৎচন্দ্র এতে প্লট ধরে লেখেননি : চরিত্র অবলম্বন করে লিখেছেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুরে মামা সুরেন গাঙ্গুলীকে বলছেন—"আজ তিন চার বছর ধরে আমি তিন চারটে চরিত্র মনে মনে গড়ে তুলেছি।......তার নামটা এখন ঠিক হয়ে গেছে চরিত্রহীন।"

প্রমথ ভট্টাচার্যকে ১৯১৩, ৮ই এপ্রিল, লিখছেন "চরিত্রহীন তোমাকে পড়তে দিতে পারি।....এই চরিত্রহীনের লেখা চরিত্রহীন। চরিত্রহীন গল্প হিসেবে—তা সে প্রায় কিছুই না।"

অর্থাৎ চরিত্রহীন প্লট-নির্ভর নয়—চরিত্র-নির্ভর। 'চরিত্রহীনের লেখা চরিত্রহীন'—বাক্যাংশটিও লক্ষণীয়। শরৎচন্দ্র এবং চরিত্রহীন শব্দটি এতই ওত-প্রোত হয়ে গিয়েছিল। শরৎচন্দ্র সমগ্র জীবন দিয়ে সাধনা করে জানতে চেয়েছেন—চরিত্র কী? দুর্নীতি কী? প্রেম কী? প্রবৃত্তি কী? সমাজের বিধি কি মনের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে বড়? ভালোবাসা আর দুর্নীতি কি সমার্থক? নারীত্ব এবং সতীত্বে দ্বন্দ্ব কোথায়? এই জবনবোধের জন্যই শরৎচন্দ্র অপরাজেয় কথা-শিল্পী, দরদী সাহিত্যিক, বন্দিত রূপকার। এবং এই জীবনবোধের প্রথম স্ফুরণ 'চরিত্রহীনে'। এবং 'চরিত্রহীনে'র প্রথম স্ফুরণ দেবানন্দপুরে ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতায়। এই দেবানন্দপুরেই তাঁর জীবনের প্রথম awakening—যৌবনের জাগরণ। কিশোর শরৎচন্দ্র সহসা অনুভব করলেন desire কী? পবিত্র শৈশব থেকে এই যৌবন-ক্ষুধার উন্মেষে তিনি উদ্‌ভ্রান্ত বোধ করলেন। পায়ে হেঁটে চলে এলেন পুরী। এই শুরু হল জীবন-জিজ্ঞাসা। অ্যানিমালিটি ও র‍্যাশানালিটির দ্বন্দ্বে তিনি বিব্রত, সেক্স ও ইনটেলেক্টের দ্বন্দ্বে তিনি ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন। তারপর উচ্ছৃঙ্খল হয়ে, উন্ধত হয়ে, ছন্নছাড়া হয়ে, ভবঘুরে হয়ে, সন্ন্যাসী হয়ে, অভিনেতা হয়ে, মোসাহেব হয়ে, বিদ্রোহী হয়ে শরৎচন্দ্র কেবলি খুঁজেছেন চরিত্র কী? প্রেম কী?

সুরেন গাঙ্গুলী এজন্যই লিখেছেন—"দেবানন্দপুর তাঁর প্রবৃত্তির তান্ত্রিক সাধনার যজ্ঞবেদী ছিল। সেখানে শরৎচন্দ্র প্রবৃত্তির বাম হস্ত দিয়ে আহরিত গরল পান করেছিলেন।"

'চরিত্রহীন' উপন্যাসের বড় কথা বিধবার প্রেম নয়, desire—নারীর desire নয়, পুরুষের। উপেন, সতীশ এবং দিবাকরই এখানে প্রধান—সাবিত্রী, সুরবালা, কিরণময়ী নয়। শরৎচন্দ্র সমগ্র জীবন ধরে এই এষণাই করেছেন—ভালোবাসা কি পাপ? রাধারাণী দেবীকে এক পত্রে লিখেছিলেন,—"তোমাদের মত কবি-কল্পনা দিয়ে নয়, নিজের জীবনকে ফোঁটা ফোঁটা গলিয়ে নিঃশেষে নীরবে দগ্ধ করে যে অভিজ্ঞতা বাস্তব থেকে আহরণ করেছি ;......"

দেবানন্দপুর শরৎচন্দ্রের সাধনক্ষেত্র। রেঙ্গুনে সেই ব্রতের উদ্‌যাপন। 'চরিত্রহীন' শরৎচন্দ্রের জীবনের থিসিস্। কিন্তু একদিনে লেখা হয়নি। ১৮৯২ সালে এর শুরু; ১৯১৩-তে শেষ। ১৮৯৫-৯৬ সালে তিনি যখন নাগা সন্ন্যাসী-দের সঙ্গে ঘুরেছেন তখন মজঃফরপুরে তাঁর ঝুলিতে ছিল এই কাহিনী। তার নাম তখন ঠিক হয়ে গেছে। অর্থাৎ, 'চোখের বালি' বা 'বড়দিদি' লেখার অনেক আগে 'চরিত্রহীনে'র শুরু। অনেকদিন ধরে একটু একটু করে তিনি লিখেছেন—সে হিসেবে 'চরিত্রহীন' তাঁর অষ্টম উপন্যাস। কিন্তু আসলে এইটেই তাঁর প্রথম উপন্যাস।

বর্মায় থাকার সময় বিভূতিভূষণ ভট্টকে পত্রে শরৎচন্দ্র প্রশ্ন করেছেন,......

"আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেরই আমি ঘৃণার পাত্র। এ বোঝা যে কত মর্মান্তিক তাহা বলিলে লোকে বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু পুটু সমস্তটাই কি আমার নিজের হাতে গড়া? আমার ঘুড়ির নীচে ভার নাই, আমার তীরের মাথায় ফলা নাই—আমার নৌকায় হাল নাই—এখন সোজা চলিতেছি না বলিয়া যে ধিক্কার দিয়া দুহাত দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছ তার সবটাই কি আমার দোষ?" (২২।২।১৯০৮)

এই পত্রেই আছে তিনি 'চরিত্রহীন' লিখতে শুরু করবেন। গল্পটা মনে মনে তৈরিই ছিল। কিন্তু গৃহদাহে শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন পুড়ে যায়। প্রমথ ভট্টাচার্যকে লিখছেন—"আগুনে পুড়িয়াছে আমার সমস্তই। লাইব্রেরী এবং 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের ম্যানুস্ক্রিপ্ট।" (২২।৩।১২)

পুনশ্চ যে তিনি এই গ্রন্থ লেখেন তা প্রমথবাবুকে লেখা ৮।৪।১৯১৩র পত্রে জানা যায়। শরৎচন্দ্রের পক্ষে 'চরিত্রহীন' পুনশ্চ লেখা কঠিন ছিল না। কারণ, পূর্বেই বলেছি, 'চরিত্রহীন' শরৎচন্দ্রের জীবনায়ন। সেই ১৮৯২ থেকে তিনি এর চরিত্রগুলির সঙ্গে মনে মনে বাস করছিলেন। এমনকি সন্ন্যাসের সময়ও ত্যাগ করেন নি। তারপর ব্রহ্মদেশে গল্পটি একটু একটু করে উপন্যাসে দাঁড়ালো। পুড়ে গিয়েও সে 'নারীর ইতিহাসের' মত হারিয়ে গেল না। তাই কি তিনি একে টলস্টয়ের 'রেজারেক্‌শনে'র সঙ্গে তুলনা করেছেন? 'চরিত্রহীন' সম্বন্ধে লেখকের যত মমত্ব দেখি, এমন আর কোন গ্রন্থ নিয়ে নয়। তাঁর সব বন্ধুকে তিনি গ্রন্থটি পড়তে বলেছেন, যথা প্রমথ ভট্টাচার্য, সুরেন গাঙ্গুলী, বিভূতি ভট্ট, নিরুপমা দেবী। সে যুগের প্রায় সব সম্পাদকই যথা সুরেশ সমাজপতি ("সাহিত্য"), স্বর্ণকুমারী দেবী ("ভারতী"), হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ("ভারতবর্ষ") গ্রন্থটি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। এক স্বর্ণকুমারী ভিন্ন আর কেউই গ্রন্থটি প্রকাশে সাহস করেন নি। স্বর্ণকুমারী দেবীকে শরৎচন্দ্রই গ্রন্থটি দেন নি, কারণ তখনো কিরণময়ী চরিত্র লেখা হয় নি, অথচ মনে মনে তৈরি হয়ে গেছে। শরৎচন্দ্র ব্যঙ্গ করেছেন সে যুগের নীতিবাগীশদের; বলেছেন, তাহলে উপন্যাস না লিখে পাদরিদের হীম বা গির্জার প্রেয়ার ছাপালেই হয়। "এটা সুনীতি সঞ্চারিনী সভার জন্যও নয়, স্কুল পাঠ্যও নয়।" (১৪।৯।১৩)

ভয়ে পশ্চাৎপদ হবার লোক শরৎচন্দ্র ছিলেন না। 'চরিত্রহীন' তাঁর দুঃসাহসিক পরীক্ষা। তাঁর মতে প্রবৃত্তির প্রচণ্ডতায় বিদ্যা-বুদ্ধি সমাজসংস্কার বর্তমান-ভবিষ্যৎ যে সব ভেসে যায়, তাও সাহিত্যের বিষয়। অনেক কাল পরে মোহিতলাল তাই লিখেছিলেন—"বাসনার বাঁশী বেজে উঠে যায় ঘুচে যায় তার ইহ ও পর। আগুনে যেমন সব বিষ যায় প্রেমেও তেমনি সকলি শুচি।"

শরৎচন্দ্র এই গ্রন্থের একটা লাইনও পরিবর্তন করতে চান নি। সন্দেহ নেই 'চরিত্রহীন' নামটাই অনেক নীতিবাগীশকে আহত করেছিল। সুরেন গাঙ্গুলিও

নামটা পছন্দ করেন নি। বলেছিলেন--'ভারি অলক্ষুণে নাম।' কিন্তু শরৎচন্দ্র তো বিস্ফোরণ ঘটাতেই চেয়েছিলেন। সেটাই তো আধুনিকত্ব।

আসলে শরৎচন্দ্র আধুনিক যুগের সূত্রপাতেই যুগলক্ষণগুলি অনুভব করেছিলেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্য তখনো রবীন্দ্রযুগে মগ্ন। এইজন্যই এই সংঘাত। আধুনিক চেতনার সব কয়টি লক্ষণই 'চরিত্রহীনে' দেখি :—

(১) অনিকেত ছিন্নমূল নোঙরহীন সত্তা ; (২) অস্থির উদ্বেগ ; (৩) নিঃসংগতাবোধ ; (৪) ধর্মহীন ঈশ্বরহীন অস্তিত্বের যন্ত্রণা ; (৫) মৃত্যু-ভয় ; (৬) আত্মজীবনীর প্রাধান্য ; (৭) দৈহিক প্রেম ; (৮) ভয়ানক ও বীভৎস রসের প্রাধান্য ; (৯) মনোবিকার, অবদমিত আসঙ্গলিপ্সা, মগ্ন চৈতন্যের নিরুদ্ধ কামনা ইত্যাদি মনস্তত্ত্বের প্রয়োগ ; (১০) তুচ্ছকে মূল্য দান যথা পতিতা, ভবঘুরে, বাউন্ডুলে চরিত্রের প্রাধান্য ; (১১) অমঙ্গলবোধ ; (১২) শৃঙ্খলাহীন পারম্পর্যহীন বেঢপ গড়ন ; (১৩) অসম্পূর্ণতাকে মেনে নেওয়া ; এবং (১৪) রোম্যান্টিকতা, তথা আধ্যাত্মিকতা-বিরোধী, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী।

'চরিত্রহীনে'র শুরু পাপবোধ থেকে—এক কিশোরের সেক্সবুদ্ধির উন্মেষ থেকে। তার ছিন্নমূল অনিকেত সত্তা বারবার নোঙরের সন্ধান করেও পায়নি। প্রবাসে স্মৃতির গভীরে ডুব দিয়ে সে হাতড়েছে তার শেকড়। সেই আশ্চর্য চরিত্র কিরণময়ী। শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব, যৌবনের সেই রূপতৃষ্ণাকে তিনি মেরে ফেলেননি। সেই উন্মাদ জীবনাবেগ উন্মত্ত হয়েও বেঁচে থাকল, যদিচ বিস্মৃতির অন্তরালে।

সুরেশ সমাজপতি বা প্রমথ ভট্টাচার্যের মতো রক্ষণশীলেরা সাবিত্রীকে দেখে যদিও শকড হয়েছেন, সাবিত্রী কিন্তু শরৎচন্দ্রের নূতন সৃষ্টি নয়। সাবিত্রী আমাদের দেশের হিন্দু বিধবার সংস্কারের প্রতিমূর্তি। 'চরিত্রহীনে'র একমাত্র আধ্যাত্মিক চরিত্র বলে যদি কিছু থাকে তবে সে তাই।

শরৎচন্দ্র যে থিসিস লিখতে বসেছিলেন—বিধবার ভালবাসার অধিকার নেই কেন? কোন্‌টা বড়—সতীত্ব না নারীত্ব?—তার উত্তর সাবিত্রী নয়। শরৎচন্দ্রের উত্তর ছিল নারীত্ব। সতীত্বের চেয়েও মনুষ্যত্বকে তিনি বেশি মূল্য দিতেন। কিন্তু যে অদৃশ্য তর্জনী তাঁকে অন্তরাল থেকে নিয়ন্ত্রণ করত, তাঁর সে উত্তর ছিল না। তিনি নিরুপমা দেবী। রাধারাণী দেবীকে ২০ বৈশাখ ১৩৩৭ পত্রে লিখছেন—"আমার একজন গারজেন ছিলেন।...তাঁর তীক্ষ্ণ তিরস্কারে না ছিল আমার আলস্যের অবকাশ, না ছিল......ফাঁকি দেবার সুযোগ।"

সতীশ ও সাবিত্রীর সম্পর্কের মধ্যে এই গারজেন ভাবটি স্পষ্ট। বন্ধু প্রমথ ভট্টাচার্যকে তাই তিনি সখেদে লিখেছিলেন—"তোমরা ওকে...মেসের ঝি বলিয়াই দেখিয়াছ। প্রমথ, হীরাকে কাঁচ বলিয়া ভুল করিলে ভাই।" (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০)।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সাবিত্রীচরিত্র সৃষ্টিতে রক্ষণশীলদের মতই জয়ী হয়েছে। শরৎচন্দ্র তা মেনে নিয়ে লিখেছেন—"যাতে এটা ইন্‌ স্ট্রিক্‌টেস্ট সেন্সে ময়্যাল হয়, তাই উপসংহার করব।"

সাবিত্রীর উপসংহার তাই হয়েছে। সেদিক থেকে 'চরিত্রহীন', 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'চোখের বালি'র সমগোত্রীয়। সাবিত্রীর কুন্দ বা রোহিণীর মতো অপমৃত্যু হয়নি বটে, বিনোদিনীর মতো কাশীতেও সে নির্বাসনে যায়নি, কিন্তু সরোজিনীর হাতে সতীশকে দিয়ে নিজের হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করে জীবন্মৃতা হয়ে থেকেছে। সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মীর পেন্সিল স্কেচ—ম্লান বিবর্ণ ছায়া। তেমন বর্ণাঢ্য, চমকপ্রদ নয়।

শরৎচন্দ্রের সত্যকার সৃষ্টি কিরণময়ী। এখানে তিনি আপোসহীন, নির্ভীক, বেপরোয়া আধুনিক। প্রমথ ভট্টাচার্যকে এক পত্রে তিনি লিখেছেন—"শুধু সৌন্দর্যসৃষ্টি করা ছাড়াও উপন্যাস লেখকের আরো একটা গভীর কাজ আছে। সে কাজটা যদি ক্ষত দেখিতেই চায়, তাই করিতে হইবে।" (১২-৫-১৯১৩) তাঁর বক্তব্য, সমাজের ক্ষত যদি দেখাতেই হয়, হবে ; তা যতই গোপনীয় হোক না কেন। এর উদ্দেশ্য আরোগ্যলাভ, ভয় দেখানো নয়।

'চরিত্রহীনে'র দ্বাদশ অধ্যায় থেকে এর শুরু। পাথুরিয়াঘাটার সেই অন্ধকার অতিসংকীর্ণ গলি যেন সমাজের নালীঘায়ের মতো। সতীশের সন্দেহ হয়েছিল—এখানে মানুষ থাকে? তার উপর বাড়ীর নম্বর তেরো। অমঙ্গলের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। সমস্ত পরিবেশ অন্ধকার। উপরে, নীচে, কাছে, দূরে সর্বত্র অন্ধকার। বহুক্ষণ পরে স্ত্রীকণ্ঠের সাড়া—'কে?' উপেন দরজা খুলতে বলায় যা দেখি তাতে উপেনের সঙ্গে পাঠকও স্তম্ভিত। সেই ইঁটবালিখসা স্যাঁতসেঁতে বাড়ীতে কেরাসিনের ডিবে হাতে দাঁড়িয়ে আছে এক অপরূপ রূপসী। 'নিখুঁত সুন্দর মুখের উপর হাতের আলোক-সম্পাতে ভ্রূযুগের মধ্যে সন্নিবিষ্ট কাঁচপোকা টিপ চিক চিক করিয়া উঠিল......'

এই অবয়বত্ব—এই ইন্দ্রিয়ঘনত্ব—নিঃসন্দেহে আধুনিক লক্ষণ। উপেনের সঙ্গে আমরাও আবিষ্ট বোধ করি—রূপসীর রূপে মগ্ন হই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শরৎচন্দ্র এক ভয়ানক রসের অবতারণা করে রূঢ় বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছেন। স্ত্রীলোকটির স্বামী, শাশুড়ী সবাই অসুস্থ। গলির মধ্যে জীর্ণ বাড়ীটার তলা বড় ঠান্ডা। চার পাঁচটি ঘর ছিল—গোটা দুই পড়ে গেছে। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেই দেখি—"মূষিকের দল তখন জীর্ণ ও পুরাতন অব্যবহার্য শয্যা ও উপাধান হইতে তুলা বাহির করিয়া ঘরময় ছড়াইয়া যদৃচ্ছা বিচরণ করিয়া ফিরিতেছিল......সমস্ত ঘরময় ভাঙা টেবিল-চেয়ার, ভাঙা কাঠের তোরঙ্গ, ভাঙা টিন, খালি শিশি বোতল এবং আরো কত কি...ভগ্নাংশ..."

সমাজের যে ক্ষতস্থান শরৎচন্দ্র দেখাতে চেয়েছিলেন তার দক্ষ তুলিকায়

গৃহবর্ণনার প্রতীকে তা ফুটে উঠেছে। রূপসী কিরণময়ী এই গৃহের মতোই জান্তব এবং ভগ্ন। হ্যাঁ, প্রথম থেকেই লেখক দেখিয়েছেন তার মন, চরিত্র, সংস্কার, বিশ্বাস, ভালবাসা সব ভাঙা। একমাত্র অটুট তার রূপ। সেই অন্ধকার পরিবেশে একমাত্র রিডীমিং ফীচার কিরণময়ীর হাসি। কিন্তু এ প্রসন্নতার হাসি নয়, ব্যর্থতার উপহাস্য।

পরক্ষণেই দেখি, প্রদীপের মিটমিটে আলোয় হারানের জীবন্মৃত দেহ। সেই রুদ্ধ, দুষ্ট বায়ু ঘেরা ঘরে এই দৃশ্যে মৃতুর যে একটা ভয়ঙ্কর দিক আছে, তা আমাদের মনে মৃত্যুভয় জাগিয়ে তোলে। সতীশের মতো আমাদেরও মনে হয় "স্বামী যার এই সে আবার হাসে, পরিহাসে যোগ দেয়, খোঁপা বাঁধে, টিপ পরে।"

হারান ও কিরণময়ীর তিক্ত সম্পর্ক এক মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হারান তার সামান্য সম্পত্তি ও মায়ের ভার উপেন্দ্রকে নিতে বলে। কিন্তু স্ত্রীর কথা উল্লেখও করে না। উপেন কিন্তু কিরণময়ীর প্রতি সমবেদনা বোধ করে প্রথম থেকে। তাই প্রশ্ন 'আর তোমার স্ত্রী?' হারানের নিরুত্তাপ উত্তর—'ওকেও দেখো।' কৃষ্ণপক্ষের মেঘমেদুর সেই রাত্রি যেন কিরণময়ীর অন্ধকার জীবনের প্রতিচ্ছায়া। কিরণময়ী অবশ্য স্বামীর উক্তি গোপনে শুনেছে এবং সতীশের চোখে ধরাও পড়েছে। লুকোচুরিতে এখানে সে অনেকটা রোহিণীর মতো। স্বামীর বিষয় নিয়ে উপেনের সঙ্গে বিতণ্ডায় তাকে একই সঙ্গে স্বার্থপর ও বিষয়বুদ্ধিনিপুণা মনে হয়। কিরণময়ীর মধ্যে শরৎচন্দ্র অনেকগুলি বিপরীত গুণের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সতীশের মুখে নগেন্দ্র-কুন্দের সাক্ষাৎ বর্ণিত হয়েছে। সেখানেও অন্ধকার ভাঙা বাড়িতে রূপসীর সাক্ষাৎ-লাভ; ফলে নায়কের জীবনে বিপর্যয়। সতীশের মুখে গল্পটির ভুল বর্ণনা চমৎকার আধুনিক শিল্প-কৌশল। কারণ, তখনি পাঠকের মনে প্রতিবাদ ওঠে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' ফ্ল্যাশব্যাকের টেকনিকে মনে আলো জ্বালিয়ে তোলে। ফবিস্ট আন্দোলনের চিত্রকরেরাও এমনি নীল ঘোড়া বা লালটিয়া এঁকে সত্যকে দ্বিগুণ প্রজ্বলিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু সতীশের সাবধানতা সত্ত্বেও ট্র্যাজেডি এড়ানো যায় নি। প্রবৃত্তির এমনি শক্তি যে তার হাত এড়ানো যায় না—তার ভোগেও যন্ত্রণা, তার ত্যাগেও যন্ত্রণা! এই শরৎচন্দ্রের বক্তব্য।

প্রেম যে দেহকে বাদ দিয়ে নয়, এটা শরৎচন্দ্র বারবার বলেছেন। বলা বাহুল্য এটাও আধুনিক লক্ষণ। যেমন ব্যায়ামরত সতীশকে দেখে সরোজিনীর মনোভাব—

(১) "কি সুন্দর বলিষ্ঠ উন্নত দেহ! কপালে তখনও বিন্দু বিন্দু ঘাম রহিয়াছে, সুশ্রী গৌরবর্ণ মুখে রক্তাভা পড়িয়া আরও সুন্দর দেখাইতেছে।" (ত্রয়োদশ অধ্যায়)

(২) "কিরণময়ী প্রজ্বলিত উনানের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। জ্বলন্ত ইন্ধনের উজ্জ্বল রক্তাভ আলোক প্রচুর পরিমাণে তাহার মুখের উপর পড়িয়াছে।...এ মুখে খুঁৎ আছে কিনা সে আলোচনা চলে না। নিখুঁৎ বলিয়াও ইহাকে প্রকাশ করা যায় না। ইহা আশ্চর্য।" (ষোড়শ অধ্যায়)

চতুর্দশ অধ্যায়ে বিষয়-বঞ্চিতা কিরণময়ীর প্রতিক্রিয়া দেখি অনঙ্গ ডাক্তারের বিদায়ে। উপেন যে তাকে যথেষ্ট নাড়া দিয়েছে এই তার প্রমাণ। এখানে পরিস্থিতি যথেষ্ট ঘোরালো করে লেখক এক অপূর্ব নাটকীয় রসসৃষ্টি করেছেন। কিরণময়ী চরিত্রে একই সঙ্গে পারভারশান ও ইনটেলেক্ট-এর সমন্বয় আমাদের অভিভূত করে। দ্বিতীয়ত, লেখক কিরণময়ীর বর্ণনায় অনেক সময়ই জান্তব চিত্ররূপ দিয়েছেন। এটাও আধুনিক লক্ষণ। প্রথমেই আমরা তাকে দেখি মূষিকপরিবৃত ঘরে কপালে কাঁচপোকার টিপ...। সতীশের কথায় আহত হয়ে তার প্রতিক্রিয়া—"তীব্র কার্বলিকের গন্ধে সাপ যেমন করিয়া তাহার উদ্যত ফণা মুহূর্তে সংবরণ করিয়া আঘাতের পরিবর্তে আত্মরক্ষার পথ অন্বেষণ করে, এই নিরুপমা, এই লীলা-কৌশলময়ী—তেজস্বিনী যুবতী তেমনি সঙ্কুচিত..." (১২ অধ্যায়)।

"অন্ধকারে তাহার চোখ দুটো হিংস্রজন্তুর মতোই জ্বলিতে লাগিল। তার মনে হইতে লাগিল, ছুটিয়া গিয়া কাহারো বক্ষঃস্থলে দংশন করিতে পারিলে সে বাঁচে।" (১৪ অধ্যায়)।

শেষ বোঝাপড়ার দিনে কিরণময়ীর প্রতি উপেন্দ্রের ক্রোধোক্তি—

"নাস্তিক! অপবিত্র, 'ভাইপার'!" (৩৩ অধ্যায়)

"কাঁচপোকা যেমন করিয়া তেলাপোকাকে টানিয়া আনে, তেমনি করিয়া দুর্নিবার যাদুমন্ত্রে কিরণময়ী অর্ধ-সচেতন, বিমূঢ়চিত্ত হতভাগ্য দিবাকরকে... টানিয়া আনিয়া উপস্থিত করিল।" (৩৪ অধ্যায়)।

বর্মা যাত্রাকালে এক শয্যায় শোওয়ায় দিবাকরের অসম্মতি শুনে, "দুই চক্ষু তাহার (কিরণময়ী) বাণবিদ্ধ ব্যাঘ্রীর মত জ্বলিয়া উঠিল।" (৩৪ অধ্যায়)।

এক শয্যায় শুয়ে দিবাকরের বক্ষে কিরণময়ীর হাত সম্বন্ধে লেখকের বর্ণনা—"কিরণময়ীর কোমল বাম হস্ত নিদ্রিত কাল-সর্পের মতো পড়িয়া আছে। পাছে সজাগ হইয়া উঠিয়াই দংশন করে..." (৩৪ অধ্যায়)।

কিন্তু সাবিত্রীর প্রসঙ্গ যখন এসেছে গ্রন্থকার তার সঙ্গে কোন কালিমা লিপ্ত করেন নি। যেমন, "...কোন কালিমাই তো সে-মুখে নাই। গর্বে দীপ্ত, বুদ্ধিতে স্থির, স্নেহে স্নিগ্ধ, পরিণত যৌবনের ভারে গভীর অথচ রসে, লীলায় চঞ্চল—সেই মুখ, সেই হাসি, সেই দৃষ্টি, সেই সংযত পরিহাস, সর্বোপরি তাহার সেই অকৃত্রিম সেবা।" (১৫ অধ্যায়)।

নিরুপমার ঘোর আচারনিষ্ঠা ও শরৎচন্দ্রের ঘোর নিষ্ঠাহীনতার আসলে

একই উৎস—ব্যর্থ ভালবাসা। হিন্দু বিধবার সংস্কার অবদমন—মনের ক্ষুধাকে ধর্মকর্ম জপতপ দিয়ে দমন করাই তার আদর্শ। সাবিত্রী, রমা, রাজলক্ষ্মী এই ধরনের চরিত্র। নিরুপমার ছায়া আছে এদের মধ্যে। 'এ চরিত্রকে তিনি কখনোই ক্লেদাক্ত করেন নি। সাবিত্রী তাঁর প্রেমের প্রতীক, কিন্তু কিরণময়ী তাঁর ডিজায়ার-এর সিম্বল। সে শৈবলিনীর মতো 'ইলেন ভিটাল' বা জীবনী-শক্তির প্রতীক। শতদিকে রুদ্ধ হয়েও সে মরে না।

কিরণময়ীর দাম্পত্যপ্রেমহীন শুষ্ক জীবন তাই কেবলি বক্রগতিতে আলোর পথ খুঁজেছে। সুরবালা উপেন্দ্রকে দেখে সে বুঝেছে দাম্পত্যপ্রেমের মূল্য। কিন্তু প্রায় তখনি তার স্বামীর মৃত্যু হল। তার সমগ্র জীবন ব্যর্থতার ইতিহাস। অতএব সমাজ, সংস্কার, ধর্ম, আত্মাকে সে যে উপেক্ষা করবে এতে আশ্চর্য কি? জীবনে একবারই মাত্র সে আলো দেখেছিল উপেন্দ্রকে ভালোবেসে। এইখানেই কিরণময়ীর মৃত জীবনের রেজারেকশন। কিরণময়ী এতদিনে বুঝল প্রেম কী? জীবন কী? পূর্ণতা কী? কিন্তু বিধাতা তাকে সহজে মুক্তি দেন নি। প্রবৃত্তির কারাগারে চিরন্তন বন্দিনী থাকাই ছিল তার অদৃষ্ট। তাই ১৭ অধ্যায়ে অনংগ ডাক্তারের পুনরাবির্ভাব। নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ পার্থিব সঞ্চয় অংগের অলঙ্কার দিয়ে কিরণময়ী এ বীভৎস বন্ধনপাশ মুক্ত করেছে। এখানে শরৎচন্দ্রের বর্ণনা প্রতীকধর্মী। "বাহিরে ডাক্তারের পায়ের শব্দ যখন তাহার কানে দূরে চলিয়া গেল, তখন সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চাহিয়া দেখিল উনুন নিবিয়া গিয়াছে।" (১৭ অধ্যায়) এ যেন কিরণময়ীর নিভন্ত বাসনার প্রতীক। কিন্তু বাসনা কি সহজে নেবে? তবু কিরণময়ী অতিক্রমের চেষ্টা করেছিল উপেনকে ভালোবেসে। তার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, দাম্পত্যজীবনের সাফল্য, তার স্বাচ্ছল্য, তার ঔদার্য, তার বিদ্যা কিরণময়ীর জীবনে একটা পূর্ণতার আদর্শ তুলে ধরেছিল।

কিন্তু এই দেব-চরিত্রের স্খলন শুরু হয়েছে ২০ অধ্যায় থেকে। সতীশের গৃহে সাবিত্রীকে দেখে কোন প্রশ্ন না করেই তার প্রস্থান পিউরিটান মনোভাবেরই প্রকাশ। ঘটনাটা এত অপ্রত্যাশিত যে পাঠক হতবুদ্ধি না হয়ে পারে না। উপেন্দ্রকে এতক্ষণ যেভাবে আঁকা হচ্ছিল—সুরবালা, দিবাকর, সতীশ, হারান, কিরণময়ী, অঘোরময়ী যার ছত্রছায়ায় নিশ্চিন্ত, তার এই আচরণ আমাদের স্তম্ভিত করে! যদিও এর পেছনে রাখালের বেয়ারীং চিঠি আছে এবং গ্রন্থকার সেক্সপীরিয় টেকনিক ব্যবহার করেছেন (প্রসঙ্গত বলি ২৪ অধ্যায়ে উপেন্দ্র কিরণময়ীর প্রতি ওথেলো-সুলভ অমূলক সন্দেহ করেছে)—কিন্তু সামাজিক উপন্যাসে এ ঢং চলে না। তার প্রমাণ গিরিশ ঘোষের প্রফুল্ল।

উপেন্দ্র-চরিত্রের যে পরিচয় এখানে পাই, তা শুচিবায়ুতার। নাকি সমাজের সে প্রতীক—এই ভণ্ড সমাজের এক তথাকথিত চরিত্রবান পুরুষ? কারণ,

সুরবালার গভীর প্রেম সত্ত্বেও উপেন্দ্র স্পষ্টতঃ কিরণময়ীর প্রতি আকৃষ্ট। ১৬ অধ্যায়ে অঘোরময়ীর চিন্তায় তা প্রকাশ—"উপেন্দ্র যে এই জালে ধীরে ধীরে আবদ্ধ হইতেছে...এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহও ছিল না, আপত্তিও ছিল না।"

অথচ উপেন্দ্র দেবতা। সতীশের বিশুদ্ধ ভালোবাসা সমাজের চোখে উদ্দাম চিত্তবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খল বিস্ফোরণ। সব সমালোচকের মতে সতীশই চরিত্রহীন—'চরিত্রহীন' উপন্যাসের যথার্থ নায়ক। দুঃসাহসী, বিদ্রোহী, বেপরোয়া। কিন্তু তার মানবিকতা গভীর। সাবিত্রী সমাজের চোখে পতিতা, দাসী—কিন্তু সত্যই কি তার চারিত্রগুণ নেই ?

আর উপেন্দ্র আদর্শ মানব—যাঁর গোপন ইচ্ছার কথা অঘোরময়ীর অজানিত নেই: ২৪ অধ্যায়ে স্পষ্টই বলছে, কিরণময়ীর কাছে তার মাথা নত হয়েছে; ২৭ অধ্যায়ে মধ্যরাত্রে কিরণময়ীর তৈরি লুচি খেতে খেতে তার প্রেমনিবেদনকে মনে মনে উপভোগ করেছে; ৩৩ অধ্যায়ে অঘোরময়ীর মুখে দিবাকর-কিরণময়ীর ঘনিষ্ঠতার মিথ্যা দোষারোপ শুনে ঈর্ষায় জ্বলে ট্র্যাজেডিকে ঘনীভূত করেছে—তাকেই চরিত্রবান বলতে হবে ?

২৩ অধ্যায়ে সতীশের তাই উপেনের উদ্দেশ্যে বিস্ফোরণ। দেবতার মতো যাকে ভক্তি করত, তাকেই ছোটলোক বলে সম্বোধন। এর পর থেকেই উপেন্দ্র আর দেবতা নেই। রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, সতীশের অভাবে সে দুর্বল মানুষ বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। হারানের মৃত্যুর দিনে সে নিজেকে অসহায় মনে করেছে। সে বিপদে তাকে সাহস দিয়েছে কিরণময়ী। প্রথম দর্শনেই তার রূপ ও বুদ্ধিতে উপেন্দ্র মুগ্ধ হয়েছিল। বিপদে তার ধৈর্য ও সাহসে সে সমর্পিত হয়ে গেছে।

শুধু কিরণময়ী নয়, যে সুরবালাকে উপেন্দ্র মনুষ্য জ্ঞান করত না সেও তার সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। এই সুরবালা চরিত্রটি অভিনব। শরৎচন্দ্র দেবানন্দপুরে এঁকে দেখেই প্রথম যৌবনকে অনুভব করেন। তিনি বলছেন, ঐ সুরবালাই আমার প্রবৃত্তির দিকটা জাগিয়ে দেওয়ার গুরু ছিলেন। তাঁর শিক্ষায় তিনি কিরণময়ী চরিত্র এঁকেছেন। কিরণময়ী চরিত্র এই নারীর কাছে তাঁর গুরুদক্ষিণা। তাঁর সম্পর্কিত বৌদি কিরণশশীকে ভেঙে দুটি চরিত্র লেখক সৃষ্টি করেন—(১) সুরবালা, (২) কিরণময়ী। শরৎচন্দ্র সুরেন গাঙ্গুলীকে বলেছিলেন, কিরণময়ীর শেষাংশ বদলাতে গেলে সুরবালাকেও বদলাতে হবে। দুজনে একই।

দেবানন্দপুরের বাড়ি পরবর্তী কালে কিনতে গিয়েও শরৎচন্দ্র কেনেন নি। বিস্মৃতির আড়ালে যে-কথা চাপা পড়ে গেছে, তাকে আর জাগিয়ে কি হবে ?—এই ছিল তাঁর মনোভাব। কিন্তু সত্যই কি সে অধ্যায় বিস্মৃত ? 'চরিত্রহীনে' কি তা ভাস্বর হয়ে নেই ?

অমৃতময় প্রেম কিরণময়ী পায়নি। সে বুঝেছে জীবনের লক্ষ্য কী? উপেনকে ভালোবেসে সুরবালা তরে গেছে। সেও কি ত্রাণ পাবে না? অনঙ্গ ডাক্তারকে জীবনের শেষ সঞ্চয় গয়নাগুলো দিয়ে কিরণময়ী প্রেমের আনন্দরাজ্যে প্রবেশাধিকার চেয়েছে। "এক অন্ধকার সন্ধ্যায় যখন সেইগুলোর লোভে সে তার বীভৎস পুচ্ছপাশ আমার সর্বাঙ্গ থেকে খুলে নিয়ে চোরের মতো নিঃশব্দে সরে গেল, মনে হল বাঁচলুম! আমি বাঁচলুম!" (২৭ অধ্যায়)

উপেন্দ্রকে সে কোন কথা গোপন করে নি। তারপর প্রণয় নিবেদন করেছে। উপেন্দ্র কি তাকে উদ্ধার করতে পারে না?

না, পারে না। উপেন্দ্র সমাজ: সুরবালা বিশ্বাস; কিরণময়ী জীবনাবেগ। সমাজ সব সময়ই জীবনাবেগকে বাঁধের মতো ধরে রাখতে চায়। আর জীবনাবেগ বন্যার মতো সেই বাঁধ ভেঙে সব প্লাবিত করতে চায়। কিরণময়ী জানে উপেন্দ্র অটল, নিষ্ঠুর, কঠিনভাবে পবিত্র। তার পিউরিটান মন তাকে নির্মম করে তুলেছে। অনেক সময় মনে হয় উপেনের কি চরিত্র আছে? চরিত্র থাকলেও সে অ-মানুষ। তুলনায় গোবিন্দলাল অনেক মানবিক। কিন্তু এত করেও উপেন ট্র্যাজেডি এড়াতে পারে নি। প্রবৃত্তি এমনি বস্তু যে তার ভোগেও যন্ত্রণা, ত্যাগেও যন্ত্রণা। একটার পর একটা ভ্রান্তি সে করেই গেছে—যেমন, দিবাকরকে শচীর পাত্র ঠিক করা, সুরবালাকে নির্বোধ ভাবা, সতীশকে অবিশ্বাস করা। কিন্তু এসব ছোট ছোট ভুল। তার প্রধান ভুল, কিরণময়ীর হাতে দিবাকরকে মানুষ করতে দেওয়া। সে দেখেছে কিরণময়ী বুদ্ধিমতী, প্রেমময়ী। সে দেখে নি কিরণময়ী ক্ষতবিক্ষত, তার মন বিকারগ্রস্ত, তার বুদ্ধি ব্যাধিগ্রস্ত—এক ছিন্নমূল অনিকেত সত্তা, ঈশ্বরহীন ধর্মহীন অস্তিত্বের যন্ত্রণায় ঘূর্ণির মতো জ্বালাময়ী, উল্কার মতো দিশাহারা।

শরৎচন্দ্র প্রথম থেকেই তার পরিণতি ইঙ্গিত করেছেন নিপুণ মনস্তাত্ত্বিকের মতো। যেমন, ১৪ অধ্যায়ে হারানের বিষয় নিয়ে উপেনের সঙ্গে বিতণ্ডার পর—"হাতের দীপটা উঁচু করিয়া ধরিয়া উন্মাদভঙ্গী করিয়া (কিরণময়ী) বলিল, আগুন ধরিয়ে দেবার উপায় থাকলে দিতুম।" ৩৩ অধ্যায়ে উপেনের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়ার দিনে "অনেকদিন পূর্বে ঠিক এইখানে দাঁড়াইয়া তাহার দুই চোখে এমনি উন্মত্ত চাহনি, এমনি প্রজ্বলিত বহ্নিশিখা দেখা গিয়াছিল।"

তার ব্যবহারের আকস্মিকতার মধ্যেও এ উন্মত্ততার বীজ দেখা যায়—সম্পত্তি নিয়ে উপেনের সঙ্গে বিরোধ, অনঙ্গ ডাক্তারকে উগ্রতার সঙ্গে বিদায়দান, সুরবালার সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাৎ, দিবাকরের ভার গ্রহণ, উপেন্দ্রকে মধ্যরাত্রে লুচি খাবার আহ্বান। এ উন্মত্ততারই চরম পরিণাম দিবাকরসহ বর্মা প্রস্থান।

মগ্ন চৈতন্যের রুদ্ধ কামই কিরণময়ীর উন্মত্ততার মূলে—এ কথা উপেন্দ্র বোঝে নি। তার কারণ, কিরণময়ীর মধ্যে ইনটেলেক্ট-এর একটা স্ফুরণ ছিল।

৩০ ও ৩১ অধ্যায়ে তা স্পষ্ট। এখানে সে অনেকটা 'নষ্টনীড়ে'র চারুলতার মতো। তবে অনেক পরিণত।

শরৎচন্দ্র ৩১ অধ্যায়ে দিবাকরের মুখ দিয়ে বলেছেন রোহিণীর রূপ ছিল, গুণ ছিল না। কিরণময়ীর তো দুটিই ছিল—সে রূপসী তথা বিদুষী। তবু ট্র্যাজেডি হল কেন? সে কি চরিত্রের অভাবে? না মনস্তত্ত্বের জটিলতার জন্য?

কিরণময়ী অনুভব করেছে তার প্রতি দিবাকরের আসক্তি—'নবীন যৌবনের একটা সদ্যজাগ্রত ক্ষুধার মূর্তি।' সে তার মন ফেরাবার জন্য প্রেমের একটা বায়োলজিক্যাল ব্যাখ্যা দিয়েছে। বলেছে, প্রেমের মূলে 'এই সৃষ্টি করার ক্ষমতাই তার রূপযৌবন। এই সৃষ্টি করার ইচ্ছাই তার প্রেম।' প্রেমের এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সে যুগে বাংলা সাহিত্যে নতুন।

শরৎচন্দ্রই প্রথম বলেন পাশব প্রবৃত্তির তাড়ন আর স্বর্গীয় প্রেমের আকর্ষণ মূলত একই। শুধু ডিগ্রীর তফাত। স্বর্গীয় প্রেম এবং ঘৃণিত প্রেম বলে কিছু নেই। ঘৃণিত প্রেম মানে সুবুদ্ধির অভাব। কুল-শীল মিলিয়ে ভালোবাসা নয়। কিন্তু প্রেম যেহেতু বায়োলজিক্যাল, সেহেতু কোন প্রেমই ঘৃণ্য নয়। এই চিন্তা রবীন্দ্রনাথ থেকে পৃথক। আধুনিক কবিদের অনেক আগেই শরৎচন্দ্র প্রেমের অবয়বত্ব বা বৈজ্ঞানিক রূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু নারীও মূল্যহীন, তিনি এটা বলেন নি।

উপেন্দ্রের দ্বিতীয় ভুল কিরণময়ীর সঙ্গে শেষ দ্বৈরথের রাত্রে (৩৩ অধ্যায়) দিবাকরকে তার কাছে পুনশ্চ রেখে আসা। রাখালের বেয়ারিং চিঠি, অঘোরময়ীর মিথ্যা লাগানো-ভাঙানোতে বিশ্বাস এবং সতীশ ও কিরণময়ীর বক্তব্যে কর্ণপাত না করা উপেন-চরিত্রের যে রূপ ফোটায়, তা হঠকারিতার। এই কি চরিত্রবানের আদর্শ?

অঘোরময়ী চরিত্রে একদিকে গোবিন্দলালের মায়ের ঔদাসীন্য, অন্যদিকে 'চোখের বালি'র রাজলক্ষ্মীর স্বার্থপরতা। তার কাছে জীবন মানে শুধুই সারভাইভাল। সেখানে কোন মূল্যবোধই নেই। তাই পুত্রবধূ যদি রূপের জাল বিস্তার করে অনঙ্গ ডাক্তার বা উপেনকে মুগ্ধ করে সংসার চালায় তাতে তাঁর আপত্তি নেই। ২৬ অধ্যায়ে উপেন্দ্রের জন্য কিরণময়ীর চেয়েও তাঁর অধীর উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষা—এই নগ্ন স্বার্থপরতাকে স্পষ্ট করে তোলে। প্রশ্ন জাগে, ইনিও কি চরিত্রবতী?

৩৩ অধ্যায় 'চরিত্রহীনে' অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এটি একটি দিন-রাত্রির কাহিনী নিয়ে। যদি বলি, এই অধ্যায় থেকেই কিরণময়ীর উন্মত্ততার শুরু, তাহলে ভুল হয় না, যদিচ তার উন্মত্ততার ঝিলিক আমরা পূর্বেই দেখেছি। তবু অঘোরময়ীর মিথ্যা অভিযোগে উপেন্দ্রের কিরণময়ীর শেষ বক্তব্য না শুনেই ঠেলে ফেলে চলে যাওয়া এবং "নাস্তিক, অপবিত্র, ভাইপোর"

বলায় তার মস্তিষ্কে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। এর পর তাকে আমরা আরো তিনবার পড়ে যেতে দেখি—(১) বর্মায় দিবাকর তাকে ঠেলে ফেলে দেয় (৪২ অধ্যায়); (২) তার রূপযৌবনের হিন্দুস্থানী খরিদ্দার দেখে মূর্ছা (৪৩ অধ্যায়); এবং (৩) উপেনের ক্ষয়রোগ হয়েছে শুনে মূর্ছা (৪৩ অধ্যায়)। বর্মা থেকে ফেরার দিন কিরণময়ীর দুর্বল মস্তিষ্কের উপর শেষ আঘাত বর্ষিত হয়েছে বিহারীর মুখে উপেনের উক্তিতে—"কিরণ বৌঠান আমার ব্যারামের নাম শুনলে এ বাসায় কেন এ পাড়ায় ঢুকবেন না।"

এর পরেই সাবিত্রী তাকে গংগার ধারে প্রায়োন্মত্তা অবস্থায় দেখে। উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত আর সে স্বাভাবিক হয়নি। কিন্তু ৩৩ অধ্যায় থেকেই সে ক্ষিপ্তা হয়ে উঠেছে· দিবাকরকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে. উপেনের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য। দিবাকরের মধ্যে দেবানন্দপুরের বয়ঃসন্ধির শরৎচন্দ্রকে দেখি যে তার সম্পর্কিত বৌদি কিরণশশীর রূপে মুগ্ধ হয়ে পুরী পলায়ন করেছিল; দেখি. প্রথম বর্মাযাত্রী সর্বহারা যুবক শরৎচন্দ্রের মনের বেদনাকে—যে তার স্বদেশ সমাজ পরিজন সব কিছু থেকে নির্মমভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূর প্রবাসে চলেছিল।

আর কিরণময়ীর মধ্যে দেখি ধর্মহীন. নীতিহীন বুদ্ধি কোথায় নিয়ে যায়। দেখি, মগ্ন চৈতন্যের নিরুদ্ধ কাম কিভাবে তীক্ষ্নবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে। এই অপরিতৃপ্তির বেদনাই শরৎসাহিত্যের মূল সুর।

কিরণময়ী কিছুই মানে না—ঈশ্বর. আত্মা. জন্মান্তর. স্বর্গ, নরক। শুধু মানে ইহকালকে—এই দেহটাকে। এই দেহবাদ বা ঐহিকতা আধুনিক। কিরণময়ী সমাজের অবিচারকে আঘাত করতে চেয়েছে। শরৎচন্দ্রের মতে এটাও লেখকের কাজ. কর্তব্য: শুধু সুন্দর দেখানোই কাজ নয়। এও আধুনিক কথা। এই কারণেই 'চরিত্রহীনে' ভয়ানক ও বীভৎস রস তিনি ফুটিয়েছেন শৃংগার বা শান্তরসের পাশে। বীভৎস রস যথা—"বাড়িময় মুড়ি, কড়াই ভাজা. হাঁসের ডিমের খোলা. কাঁকড়া-চিবানো. চিংড়ি মাছের খোলা ছড়াছড়ি যাইতেছে—পা ফেলিবার স্থান নাই। মোক্ষদা সাবিত্রীকে দেখিতে পাইয়াই শিথিল-বস্ত্র কোমরে জড়াইতে জড়াইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া...কান্না জুড়িয়া দিল। মুখে তাহার উগ্র মদের গন্ধ; গালে, কপালে. কাপড়ে, সর্বাঙ্গে হলুদের শুকনো দাগ. নিঃশ্বাসে কাঁচা পিঁয়াজের কুৎসিত তীব্র গন্ধ।" (৯ পরিচ্ছেদ) ভয়ানক রস যথা হারানের মৃতদেহের বর্ণনা। "অন্ধকার ভাঙাবাড়ি শ্মশানের মতো স্তব্ধ।...কম্পিত-হস্তে দ্বার ঠেলিয়া চাহিতেই আঁধার শয্যাতলে আপাদ-মস্তক বস্ত্রাচ্ছাদিত হারানের মৃতদেহ চোখে পড়িল।" (২৪ পরিচ্ছেদ)।

শরৎচন্দ্র বন্ধু প্রমথ ভট্টাচার্যকে বলেছিলেন 'চরিত্রহীনের সমাপ্তি ইন্ স্ট্রিকটেস্ট সেন্সে মরাল করবেন। করেছেনও তাই। কিন্তু পোয়েটিক

জাস্‌টিস কি তাতে রক্ষিত হয়েছে? উপেন্দ্র সমাজের প্রতিভূ বলেই কিরণময়ীর উপর প্রবেশ নিষেধ জারি করে তাকে উন্মত্ততার দিকে ঠেলে দিয়েছে, সাবিত্রীকে দিয়েছে ফতোয়া আসক্তির বন্ধন ত্যাগ করে সতীশকে সরোজিনীর হাতে সমর্পণ করতে। কিরণময়ীকে উন্মাদ, দিবাকরকে ভস্ম, সাবিত্রীকে জীবন্মৃত করে উপেন্দ্র চিরবিদায় নিয়েছে। ইনি যদি চরিত্রবান হন, তবে চরিত্রহীন কে?

শেষ দৃশ্যে কিরণময়ীর বক্তব্য শৈবলিনীর এজাহারকে স্মরণ করায়। দিবাকরকে সে নষ্ট করেনি। এতদিনে সুরবালার উপদেশে সে ভগবানকে মেনেছে। মৃত্যুপথযাত্রী উপেন্দ্রের জন্য সে কালীর প্রসাদ এনেছে। যে রমণীর রূপের সীমা ছিল না—বুদ্ধির অবধি ছিল না, তার প্রলাপে নির্মম উপেন্দ্রের চোখেও জল এসেছে।

কিন্তু কিরণময়ী কেমন পাগল? গঙ্গার ঘাটে মুহূর্তের দেখা সাবিত্রীকে উপেনের কক্ষে দেখেই সে চিনেছে। কতকাল পরে দেখা সরোজিনীকেও চিনতে তার ভুল হয়নি। হয়তো অস্বাভাবিক হয়েই সে স্বাভাবিক হতে পেরেছে—কিং লিয়রের মতো, পিরানদেল্লোর হেনরী দ্য ফোর্থের মতো। উপেন্দ্রের মৃত্যুতে সে নিরুদ্বেগে ঘুমিয়েছে। সত্যিই তো উপেন্দ্র তার কে? ডিজায়ার ছাড়া আর কী? যন্ত্রণার অবসান মানেই তো উদ্বেগহীনতা! কামনার সমাপ্তিতেই তো সমাধি! সেদিক থেকে বিচারে 'চরিত্রহীনে'র সমাপ্তি স্বাভাবিক অথচ অভিনব, বাস্তব অথচ অসাধারণ!

---

'বেতার জগৎ' পত্রিকার সৌজন্যে পুনর্মুদ্রিত।

# আধুনিকতা, শরৎচন্দ্র ও উত্তরকাল

**পুষণ গুপ্ত**

'সংসারে অনেক ঘটনার মধ্যে বিবাহও একটা ঘটনা, তার বেশী নয়'—এ-জাতীয় উক্তি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে প্রায়ই শোনা যায়। চমক লাগে। আবেগসর্বস্ব, গৃহস্থ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের ভাবাদর্শ প্রভৃতি সম্বন্ধে আর একবার চিন্তার অনুরোধ উত্থাপন স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। শিল্পী শরৎ-চন্দ্র তাঁর প্রিয় নরম ম্লান রংগুলোকে সরিয়ে এই উপন্যাসে লাল কালো কয়েকটি চড়া রং ব্যবহার করেছেন এবং মাঝে মাঝে ক্যানভাসে কাগজ এঁটে কোলাজের কাজ করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি।

বস্তুত উনিশ শো একত্রিশ-এর এই উপন্যাসটিতে অপরিবর্তনীয় ভারতীয় আদর্শের প্রতি অশ্রদ্ধা, মুক্ত প্রেমে বিশ্বাস, আশ্রমের কৃচ্ছ্রসাধনায় অথবা প্রৌঢ়পতির মৃত পত্নীর স্মৃতির প্রতি বিদ্রূপ প্রভৃতি উপন্যাসটিকে বক্তব্যে প্রায় আধুনিক করে তুলেছিল।

বার্নাড শ'র আধুনিকতা শরৎচন্দ্রে খোঁজা শুধু ভুলই নয়—হাস্যকরও। কমল কখনই হৃদয়ের সঙ্গে বলে উঠতে পারত না—ম্যারেজ ইজ এ লীগাল প্রশ্চিচিউশন। এমনকি কমল নিজে মিসেস ওয়ারেনও নয়। জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে সামান্য যে অস্বস্তিকর প্রসংগটি উঠেছিল, তাও ইউরোপীয়ান পিতার মহানুভবতায় এবং উচ্চ শিক্ষায় কিছু সময় পরেই লুপ্ত হয়। কমল শরৎচন্দ্রেরই নায়িকা তবে তার মননভাগটি পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে ধারালো ও চকচকে—তাতে মরচে পড়ে নি।

শেষের কবিতা জাতীয় আধুনিকতার মুখোসে ঢাকা রোমান্টিক প্রেমের বিলাস 'শেষপ্রশ্নে' নেই। সামান্য টানাটানিতেই পাতলা কাগজের মুখোশ ছিঁড়ে যাওয়া, বিলাসী মূর্তি দর্শন—সে সকল তিক্ত অভিজ্ঞতা 'শেষপ্রশ্নে' সহ্য করা বোধহয় যেত না। শরৎচন্দ্র যা করবেন ভেবেছিলেন তিনি তাই করেছেন। এখন সত্তরের দশক থেকে ধৈর্যসহকারে সেই আধুনিক হয়ে ওঠার আয়োজন কিছুটা বিব্রত করতে পারে।

শরৎচন্দ্রের নিজের মতে 'শেষপ্রশ্ন' অতি আধুনিক উপন্যাসের মডেল। সহজেই বোঝা যায়, তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর অবধি প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে অব-তীর্ণ হতে 'শেষপ্রশ্নে'র দ্বিধা থাকার কথা নয়। অন্তত ঔপন্যাসিকের সচেতন মনোভাবে মনে করা যেতে পারে, হাতে অস্ত্র তুলে না দিলেও কমল প্রতিরক্ষার বর্ম পরিহিত ছিল।

বর্মটি নিশ্ছিদ্র কি?

কমল প্রেম ও প্রেমহীন বন্ধন নিয়ে প্রশ্ন তোলে। ব্যক্তির সুখচরিতার্থতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। বিবাহাদিতে যৌবনের অকালমৃত্যু তার কাছে ঘৃণ্য। এইসব ঘটনা কমলের জীবনযাত্রায় সমুদ্রের এবং পাহাড়ের উত্তাল হাওয়ার স্বাদ এনে দিয়েছে। কমলের উন্মুক্ত হৃদয়ের ছিটকিনিহীন জানালা-দরজা দিয়ে সেই হাওয়া বার বার ঢুকে পড়েছে এবং প্রায় সর্বক্ষণ খেলে বেড়িয়েছে। কিন্তু কমল শিবনাথকে বিয়ে করেছিল। যদিও অনুষ্ঠানটি নামমাত্র, তথাপি সেটি বিয়েই ছিল। আশা করা গেছে, অজিতকেও হয়তো সে বিয়েই করবে। চার বছর পরের 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেটুকুও সহ্য করতে পারেন নি। হেরম্ব সুপ্রিয়াকে ফিরিয়ে দিয়েছে। হেরম্ব পারত না। কিশোরী আনন্দকে বাঁচিয়ে রাখা গেল না। বস্তুত আনন্দ সেই প্রেম, যা সুপ্রিয়া অশোক মালতীর পৃথিবীতে সহাবস্থান করতে পারে না। কমলের হৃদয়ে এক অদ্ভুত আশা জ্বলে থেকেছে—সে পারবে। হেরম্ব আনন্দকে বাধা দেয় নি। নিজের সমস্ত প্রেমকে চিতায় উঠে যেতে দিয়েছে—সে বুঝেছিল পারা যায় না।

পৃথিবীর আধুনিক উপন্যাস ততদিনে ভিত্ বদল করেছে, স্বভাবতই চেহারাও বদলেছে। 'ইউলিসিস'-এর ব্লুম সকালবেলায় বেরিয়ে ক্রমান্বয়ে মাংসের দোকানে, সংবাদপত্রের অফিসে, লাইব্রেরিতে, শবযাত্রায়, এবং গণিকালয়ে ঘুরেছে। রাতে বাড়ি ফিরে ব্যাভিচারী স্ত্রী'র পাশে শুয়েছে। এ সকল দিনযাপনের গ্লানির মধ্যে কোথাও কোন তাৎপর্য প্রকাশের ইচ্ছা এই ঔপন্যাসিকদের ছিল না।

শরৎচন্দ্র মূল্যবোধ, মানবিকতা, জীবনের তাৎপর্য ইত্যাদি ভঙ্গুর বিষয়গুলি বেশ সাবধানে নাড়াচাড়া করেছেন। কমল নিজের অন্তর্গত সমস্ত বিদ্রোহ নিয়েই আশুবাবুকে শ্রদ্ধা করেছে। পল্লীতে রোগের সেবা করেছে। শিবনাথের শিল্পীসত্তার মর্যাদা দিয়েছে। বাঙালী সামাজিক গতানুগতিকতার দিকে কয়েকটি ঢিল ছুঁড়লেও—না, মূল্যবোধজাতীয় বস্তুগুলি এ-উপন্যাসে যত্নেই ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও কোন ফাটল দেখা যায় না।

বস্তুত 'আধুনিক উপন্যাস' শেষপ্রশ্ন এবং 'সাম্প্রতিক আধুনিক উপন্যাস' এক নয়। অতি প্রাচীন প্রেম—যা বর্তমানে সুবোধ ঘোষ, সন্তোষকুমার ঘোষ অথবা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী'র উপন্যাসেও আছে, থাকা স্বাভাবিক বলেই। কিন্তু সেখানে মুক্ত প্রেমের জন্য কোন আবেদন নেই, বিবাহ ইত্যাদির বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ নেই। একে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান হিসেবেই দেখা হয়েছে। এ হল সেই সবুজ দারুচিনি দ্বীপ—যাকে এই শতাব্দীর একমাত্র রিলিফও বলা যেতে পারে। কমল বহুবার তর্ক করেছে আশুবাবু, অক্ষয়, হরেন্দ্র, অবিনাশের সঙ্গে। 'উন্মাদ যৌবনের নির্লজ্জ স্তবগান' তাকে দ্বিধাগ্রস্ত করে নি। কিন্তু কমল যে

উদ্দেশে সৃষ্টি হয়েছিল, ব্যক্তিগতভাবে সে তাকে সম্পূর্ণ নষ্ট করেছে। কমল-শিবনাথের প্রেমজীবন উপন্যাসে অনুপস্থিত। অজিতের সঙ্গে তার সম্পর্কে অন্তত তিনবার বোঝা গেছে সে শুধু ভাল তাত্ত্বিকই নয়, কমল একজন নারীও। হায়, সে সকল উত্তাল সুযোগগুলি বৃথা হারিয়ে গেল যার সাহায্যে কমল কোন সঙ্গীতই রচনা করতে পারল না।

'My great religion is a belief in the blood, the flesh, as being wiser than the intellect.'—লরেন্সের এই উক্তি, বোদলেয়ারের কবিতা, পিকাসো'র ছবি এবং কাফকা'র পৃথিবীর পেছনে বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর যে বিষণ্ণতা ও অনিকেত মনোভাব বর্তমান, বাঙালী ঔপন্যাসিকেরা তা প্রথমে অঞ্জলি পেতে গ্রহণ করেছিলেন; পরে তাদের শরীরের শিরাধমনীর সাহায্যে তা হৃৎপিণ্ডে ও রক্তে ছড়িয়ে যায়।

বুদ্ধদেব বসু'র 'বিপন্নবিস্ময়' উপন্যাসে'র শ্রীপতি, যে একটা 'জোচ্চোর শরীরের' প্রয়োজনে বিয়ে করে—পরের দিকে সে কিছুটা নিষ্ক্রিয় বোধ করে। তাকে বলা হয়, 'একটু চেষ্টা করো শ্রীপতি, চেষ্টা করো শরীরটাকে খুঁচিয়ে তুলতে।'

'প্রাচীর'-এ সমরেশ বসু কয়েকজন স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে কিঞ্চিৎ অনু-শীলন করেন। উপন্যাসের এক অধ্যাপক নিখিল বলে 'আমরা কেউ ঈশ্বর নয়, পশুও নয়।...কিন্তু দু-একটা জায়গায় আমরা আজও অসহায়।'

বিমল করে'র 'দংশনে'র কান্তি ও মিলির মধ্যে একমাত্র সম্পর্ক পেথিড্রিনের একটি সিরিঞ্জে। অথচ তারা একে অপরকে ভালবাসে।

'দেহ' নামক শব্দটির প্রতি অনীহা 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসকে কিছুটা জোরেই সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের মহল থেকে টেনে বাইরে নিয়ে আসে। কমল হরেন্দ্রকে বলেছে, 'নির্জনগৃহে নরনারীর একটিমাত্র সম্বন্ধই আপনিই জানেন, পুরুষের কাছে যে মেয়েমানুষ সে শুধু মেয়েমানুষ, এর বেশী খবর আজো পৌঁছয় নি।'

কমলের প্রস্তাবটি যে ভয়াবহ তা হরেন্দ্র মনে করে—অন্তত 'ভয়ানক' শব্দটি তা প্রমাণ করে। নিশ্চয়ই কমলও মনে করে এবং তারই প্রতিবাদে সে বিদ্রোহ করে। কিন্তু বোঝা যায় না কমল হরেন্দ্রকে 'আধুনিক' মনে করে কেন? এ উপন্যাসে কমলের আধুনিকতা অন্য সকলের প্রাচীনতার বিরুদ্ধে। লক্ষণীয় অন্য সকল তর্কের ক্ষেত্রে কমলই শেষাবধি জয়ী হয়। কিন্তু হরেন্দ্রকে দ্বিতীয়-বার থাকতে কমল অনুরোধ করে না।

দেখা যায়, কমল অতি সযত্নে যৌনতাকে ঘৃণা করে। কামু তাঁর 'দ্য ফল' উপন্যাসে বলেছেন, মডার্ন মেন ওনলি ফর্নিকেট অ্যান্ড রীড দ্য নিউজপেপার। বস্তুত আধুনিক উপন্যাসে প্রেম, শরীর, হৃদয় প্রভৃতি অনেকগুলো ব্যাপারকে

স্বীকার করে নিয়েই। প্রায়ই অস্থিরতা ও যন্ত্রণার ক্লান্তি নিয়ে মানুষ দেহের জৈবিক কামনায় তার অস্তিত্বকে বয়ে নিয়ে চলে।

শেষপ্রশ্নে'র পক্ষে এই প্রশ্নগুলি ভয়াবহ।

আধুনিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বহু তথ্য কমল প্রদান করে, কিন্তু কমলের চরিত্রগঠনে মানব ভাবের স্বল্পতা তাকে একটি সম্পূর্ণ আধুনিক চরিত্র হয়ে উঠতে দিল না। অবশ্য উপন্যাসের পুরুষ চরিত্রগুলির সঙ্গে প্রেমসম্বন্ধে কমল অনেকাংশে বিশ্বাস্য। বস্তুত যথার্থ কার্যকারণ নীতি, র‍্যাশনালিজ্‌ম্‌ ইত্যাদি সম্বন্ধে আজ আর বিশেষ চিন্তা নেই। 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসটিতে শিবনাথ ও অজিতের সঙ্গে দীর্ঘজীবনযাপন সত্ত্বেও কমল রাজেনকে ভালবেসেছে। এবং সে ভালবাসা কমল কথিত কোন বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে নয়—অতিপ্রাচীন স্ত্রীমনস্তত্ত্বের দিক থেকেই। কমল একমাত্র রাজেনকেই সুপিরিয়র মনে করেছিল।

শিবনাথ তুলনায় অনেকাংশে আধুনিক। তার কমলের সঙ্গে বসবাস, মনোরমাকে স্বীকার করে নেওয়া এবং কমলের কাছে ফিরে আসার চেষ্টা প্রভৃতি তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু শিবনাথের চরিত্রের কীনোট কী? প্রয়োজন সত্ত্বেও কখনোই তার হৃদয়ের অভ্যন্তরে উঁকি দেওয়া হয়েছে কি? হয় নি।

'দিন যায়' উপন্যাসের নায়ক বীরু এলোমেলো জীবনযাপন করে, সে ছুটন্ত মোটরে ঘুরে বেড়ায়, অ্যাপার্টমেণ্টে নারীসঙ্গ ও মদ্যপান করে এবং প্রচুর বই পড়ে। ভিয়েতনামের উপর বক্তৃতা দেয়, রেস খেলে। অথচ মাঝে মাঝে একাকী মধ্যরাতে কাঁকড়ার মতো হাত-পা নাড়া একটি বাচ্চা ছেলের কর্ম ভুলতে সাদা চাঁদের আলোয় ঘুরে বেড়ায়। ঔপন্যাসিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় চরিত্রের কীনোটটি ধরিয়ে দিয়েছেন। এখানেই বীরুর যন্ত্রণা। শিবনাথ সাম্প্রতিক উপন্যাসের পর্যায়ে স্পষ্ট হল না।

শিবনাথের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা থেকে মনোরমা শিবনাথকে ভালবেসে ফেলেছে। 'ফ্রয়েডিয়ান সাইকলোজি', 'অবসেশন' শব্দগুলি একান্তই 'গ্রীক' নয়—এমনকি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেও। প্রেমের সরল এবং স্বাভাবিক গতি থেকে একটি বিস্তৃত লাফ দেওয়া হয়েছে।

রমাপদ চৌধুরীর 'লজ্জা' উপন্যাসে একটি মেয়ে তার কাজিনকে ভালবাসে। নীরব প্রেম মেয়েটির স্বাভাবিকত্ব নষ্ট করে, ক্রমে সে 'নার্ভাস ডিসঅর্ডার'-এ ভুগতে থাকে। শেষের দিকে অ্যাসাইলামে রাখার সময়ে ছেলেটি সেই প্রেম অনুভব করে এবং নিজেও এক ধরনের মেলোঙ্কলিয়ায় পতিত হয়।

নীলিমার আশুবাবুর প্রতি অনুরাগ যথার্থ বিশ্লেষিত না হওয়ার জন্য আকস্মিক মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু অবিনাশের সঙ্গে তার সম্পর্কে এক ধরনের পারভারশানের বৃত্ত গড়ে উঠেছিল। নীলিমা আশুবাবুর কাছে রিলিফ

পেয়েছে এবং একটি সুস্থ জীবনযাপনের মোহ ওই সুস্থ মানুষটির প্রতি কামনা থেকে প্রকাশিত হতেই পারে। বস্তুত তাই হয়েছে।

সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের চরিত্রগুলি হল বিমল করে'র 'যদুবংশে'র সুর্য, যে গণনাথের মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে উন্মাদনায় ছোটে, শবকে গালাগালি দেয়, ম্যারাকাস বাজিয়ে এক অদ্ভুত দুঃখকে পরিহাস করতে চায়—অবশেষে কেঁদে ফেলে। অথবা, মতি নন্দীর 'দ্বাদশ ব্যক্তি'র তারক, 'যে তাড়া-খাওয়া ক্ষিপ্ত মানুষ, যাকে অবশেষে ঘুরে দাঁড়িয়ে এক সময়ে বিদ্রোহ করতেই হয় নিজের বিরুদ্ধে'।

শেষপ্রশ্নের মানুষেরা এদের মতো নয়। তা প্রত্যাশিতও ছিল না। তারা তাদের মতোই। কয়েকজনকে এখনো পরিষ্কার চেনা যায়, বাকিরা একটু ঝাপসা। কমল অনেক উর্বরাশক্তি নিয়ে জন্মেছিল। ঔপন্যাসিক তার প্রতি সামান্য মানবিক দৃষ্টি দিলে আর কয়েকটা বছর, কমল অনায়াসেই টি'কে যেত।

'অ্যান্টি-প্লট' আধুনিক ঔপন্যাসিকেরা মেনে নিয়েছেন। আধুনিক নাট্য-কারদের অ্যান্টি-প্লের মতোই। সমরেশ বসুর 'বিবর' উপন্যাসের নায়ক একটি পতিতা মেয়েকে সম্পূর্ণ বিনা কারণে খুন করেছে। বস্তুত কোন ঘটনা নয়, গণিকার পোশাকে সমগ্র পাপী পৃথিবীকে হত্যা প্রভৃতি দার্শনিকবোধই উপন্যাসটিকে গঠন করেছে।

'সন্ধিক্ষণ' উপন্যাসে দিব্যেন্দু পালিত একটি যুবকের মৃত্যুর পর তার চারপাশের মানুষদের ক্রমশঃ বদলে যাওয়া চরিত্রের ভেতরে ঢুকতে চেয়েছেন। কোথাও কোন গল্প নেই।

এবং 'শেষপ্রশ্নে'ও সেই কাহিনীর জমাট মজাটুকু উধাও। অজিত-কমলের শহরত্যাগ, মনোরমা-শিবনাথের বিবাহ, নীলিমার প্রেম—এগুলির কোনটাই 'শেষপ্রশ্নে'র প্লট তৈরি করতে বিশেষ চেষ্টা করে নি। উপন্যাসের প্রথম দিকে যে সকল নরনারী দেখা গেছে, উপন্যাসের শেষে, ঘটনার কোন আলো না জ্বালিয়েই অতি সাধারণভাবে তারা প্রেমিক-প্রেমিকা বদল করেছে মাত্র।

ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র জানতেন, 'শেষপ্রশ্নে'র গল্পহীনতাটুকু প্রয়োজনীয়। এবং রচনারীতিতে দার্শনিক উপন্যাস হয়ে ওঠার প্রবল প্রবণতা থেকে উপন্যাসের ভূমিকামঞ্চে একজন সম্মানী বৃদ্ধের মতোই। কারণ দার্শনিকতা সাম্প্রতিক উপন্যাসের একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য। আসলে লেখক এবং তার ব্যক্তিগত বোধ, এসবই সাম্প্রতিক উপন্যাসকে তত্ত্ববহুল করে তোলে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আত্মপ্রকাশ' অবশ্যই আত্মজীবনী নয়, বরং আত্মদর্শন বলা চলে।

'এখন আমার কোন অসুখ নেই' উপন্যাসে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় মানুষের বয়স, প্রেম, যৌনবোধ প্রভৃতি নিয়ে তথ্যপূর্ণ দার্শনিক আলোচনাই করেছেন। অথচ এগুলো উপন্যাসের স্বাদ-গন্ধ-স্পর্শ নিয়েই উপস্থিত।

আধুনিক উপন্যাস 'শেষপ্রশ্নে'র দার্শনিকতাকে স্বাগত জানাবে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কমল ও অধ্যাপকদের বিতর্ক সভার মাধ্যমে তত্ত্বপ্রচারে, উপন্যাস অদৃশ্য-দর্শনে হতাশ হবে।

বস্তুত 'শেষপ্রশ্নে'র গতি, ক্ষমতা এবং শরীর আধুনিক উপন্যাস হতে চলেছিল। কিন্তু প্রতিরক্ষার বর্মটিতে কয়েকটি ছিদ্র থেকে যায়। যেহেতু চরম পরীক্ষার প্রয়োজন বোধ করা হয় নি, তাই প্রতিপক্ষের অতি সহজে নিক্ষিপ্ত কয়েকটি অস্ত্র তাতে বিদ্ধ হয়। 'শেষপ্রশ্ন' মুমূর্ষু, কিন্তু এখনও তার সমস্ত শরীর হাতড়ে বীরত্বের বহু চিহ্ন আবিষ্কৃত হয় এবং আমৃত্যু এই প্রচেষ্টা চলবে আশা করা যায়।

# শরৎচন্দ্রের উপন্যাস

**শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**

শরৎচন্দ্রের জন্য বাঙ্গালার উপন্যাস-সাহিত্য কতখানি প্রস্তুত ছিল এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যেমন স্বাভাবিক তাহার উত্তর দেওয়াও সেইরূপ দুরূহ। তিনি বাঙ্গালার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের যে সমস্ত উপাদানের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন, বিশ্লেষণ ও মন্তব্যের যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহার পূর্ববর্তী উপন্যাসসাহিত্যে তাঁহার এই বিশেষত্বগুলির কতকটা পূর্বসূচনা পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে যে ধারণা আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছে তাহা তাঁহার অনন্যসুলভ মৌলিকতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। নিষিদ্ধ, সমাজবিগর্হিত প্রেমের বিশ্লেষণ, আমাদের সামাজিক রীতি-নীতি ও চিরাগত সংস্কারগুলির তীক্ষ্ন তীব্র সমালোচনায়, স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সম্পর্কের নির্ভীক পুনর্বিচারে তিনি যে সাহসিকতার, যে অকুণ্ঠিত সহানুভূতি ও উদার মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বাঙ্গালীর মনের সঙ্কীর্ণ গন্ডী বহুদূর ছাড়াইয়া অতি-আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছেন। বাঙ্গালার উপন্যাস-সাহিত্য যে স্রোতোহীন শুষ্কপ্রায় খাতের মধ্য দিয়া অলস মন্থরগতিতে উদ্দেশ্যহীনভাবে চলিতেছিল, তিনি সেখানে বহিঃসমুদ্রের স্রোত বহাইয়া তাহার গতিবেগ বাড়াইয়া দিয়াছেন, নূতন ভাবের উত্তেজনায় তাহার মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছেন। এইদিক দিয়া দেখিতে গেলে পূর্ববর্তী উপন্যাস-সাহিত্যের সহিত তাঁহার যোগ অতি সামান্য। কিন্তু ইহাই তাঁহার উপন্যাসের একমাত্র বিষয় নয়। তাঁহার উপন্যাসের আর-একটি দিক আছে যেখানে তিনি পুরাতন ধারাই অব্যাহত রাখিয়াছেন, যেখানে পুরাতন সুরেরই প্রাধান্য। তাঁহার অনেক উপন্যাসে আধুনিক প্রেম-সমস্যার আদৌ ছায়াপাত হয় নাই, কেবলমাত্র আমাদের পারিবারিক জীবনের চিরন্তন ঘাতপ্রতিঘাতই আলোচিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসসমূহের ব্যাপক আলোচনা করিতে গেলে, তাঁহার এই নূতন ও পুরাতন—উভয় ধারাই লক্ষ্য করিতে হইবে। তাঁহার মৌলিকতা সত্ত্বেও তিনি প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা উপন্যাসের বিকাশ-ধারার বহির্ভূত নহেন।

'চরিত্রহীন', 'শ্রীকান্ত' ও 'গৃহদাহ' ছাড়া বাকী উপন্যাসগুলিতে শরৎচন্দ্র পুরাতন ধারারই অনুবর্তন করিয়াছেন। 'কাশীনাথ', 'দেবদাস', 'চন্দ্রনাথ', 'পরিণীতা', 'বড়দিদি', 'মেজদিদি', 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'বিরাজবৌ', 'স্বামী', 'নিষ্কৃতি' প্রভৃতি সমস্ত গল্পগুলিই বাঙ্গালী পরিবারের ক্ষুদ্র বিরোধ ও ঘাতপ্রতিঘাতেরই কাহিনী। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি একেবারে প্রেমবর্জিত —একান্নবর্তী গৃহস্থ পরিবারের মধ্যে প্রেমের যে স্বল্প অবসর ও অপ্রধান অংশ

তাহাই ইহাদের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। আর কতকগুলিতে যে প্রেমের চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ সাধারণ ও সামাজিক বিধিনিষেধের অনুবর্তী। প্রেমের যে দুর্দমনীয় প্রভাব, সমাজবিধ্বংসী শক্তির মূর্তি শরৎচন্দ্রের নামের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, তাহার দর্শন ইহাদের মধ্যে মিলে না। এইগুলির জন্যই শরৎচন্দ্র উপন্যাসসাহিত্যের পূর্ব ইতিহাসের সহিত সম্পর্কান্বিত হইয়াছেন।

এই সমস্ত গল্পগুলির কতকগুলি সাধারণ গুণ আছে। প্রথমতঃ তাহারা সকলেই ক্ষুদ্রাবয়ব, ছোটগল্পের অপেক্ষা আয়তন বেশী নয়। অথচ ইহারা ঠিক ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্তও নয়। ছোটগল্পের পরিসমাপ্তির মধ্যে যে একটা সাঙ্কেতিকতা, একটা অতর্কিত ভাব থাকে, তাহা ইহাদের মধ্যে নাই। তাহাদের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে যে সমস্যার অবতারণা হইয়াছে, তাহাদের আলোচনা ও মীমাংসা সম্পূর্ণ ও নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, ইহাই আমরা উপলব্ধি করি। বাঙ্গালা সাহিত্যের উপন্যাসের আয়তন সাধারণতঃ কিরূপ হওয়া উচিত তাহার কোনও আদর্শ নির্ধারিত হয় নাই। তবে ইউরোপীয় তিন ভল্যুমে সম্পূর্ণ উপন্যাসের বিস্তার যে এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে, সে সম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ অবসর নাই। আমাদের সাধারণ পারিবারিক জীবনে যে সমস্ত বিরোধ সংঘাত জাগিয়া উঠে তাহাদের গ্রন্থি বিশেষ জটিল ও দীর্ঘ নহে। সুতরাং তাহাদের আলোচনার ক্ষেত্রেও অতিবিস্তৃত হইবার প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে শরৎচন্দ্র তাঁহার অভ্যস্ত সংযম ও সহজ কলানৈপুণ্যের সহিত তাঁহার উপন্যাসগুলির যে সীমানির্দেশ করিয়া দিয়াছেন তাহাই বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের স্বাভাবিক আয়তন বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।

এই গল্পগুলিতে পারিবারিক বিরোধের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে মেলে। আমাদের পারিবারিক জীবনে স্নেহ প্রেম ঈর্ষা প্রভৃতি মনোবৃত্তিগুলি সাধারণতঃ যে খাতে প্রবাহিত হয়—তাহার ব্যতিক্রম দেখানোতেই ইহাদের বৈচিত্র্য। যে বিভিন্ন উপাদান লইয়া আমাদের পারিবারিক ঐক্য গঠিত হয়, যে পরস্পরবিরোধী স্বার্থসংঘাত একান্নবর্তী পরিবারের ছায়াতলে একটা ক্ষণস্থায়ী মিলনে বাঁধা পড়ে, তাহাদের মধ্যে একটা চিরপ্রথাগত সন্ধি-বিগ্রহের, ভেদ-মিলনের সূত্র ঠিক হইয়াই থাকে। দৈনিক জীবনযাত্রার মধ্যে যখনই সংঘর্ষ বাধিয়া উঠে, যখনই ভাঙ্গন শুরু হয়, তখন এই পূর্বনির্দিষ্ট ভেদরেখা ধরিয়াই ফাটল দৃষ্টিগোচর হয়। যখনই এই পারিবারিক কলহ আত্মপ্রকাশ করে, তখনই আমরা বিচ্ছেদরেখার গতিটি পূর্ব হইতেই অনুমান করিতে পারি—বুঝিতে পারি যে কে কোন পক্ষ অবলম্বন করিবে। কিন্তু সময় সময় মানুষের স্বাধীন প্রকৃতি এই সমাজরচিত বাঁধা রাস্তায় চলিতে চাহে না। এই সনাতন শ্রেণীবিভাগের সরল রেখা অতিক্রম

করিয়া একটা বক্র, তির্যক্ গতি অবলম্বন করে। তখনই পারিবারিক বিরোধটি নূতন রকমের জটিলতা ও বৈচিত্র্য লাভ করে। আবার পারিবারিক জীবনে এমন লোকও থাকে, যাহারা এই দ্বিধাবিভক্ত পরিবারের প্রান্তসীমায় দাঁড়াইয়া একটা ব্যাকুল অনিশ্চয়ের সহিত উভয় দিকেই ব্যগ্র বাহু প্রসারিত করিতে থাকে। তাহারা রক্তসম্পর্ক ও স্নেহের দাবি—এই উভয় বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে অক্ষম হইয়া একটা উৎকট, বিসদৃশ অসঙ্গতির সৃষ্টি করে। পারিবারিক জীবনে স্নেহপ্রেমের বক্রগতির চিত্র রবীন্দ্রনাথের 'পণরক্ষা', 'ব্যবধান' 'রাসমণির ছেলে' প্রভৃতি অনেকগুলি ছোটগল্পে পাওয়া যায়। সুতরাং এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে শরৎচন্দ্রের পথপ্রদর্শক বলা যাইতে পারে।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের প্রণালী রবীন্দ্রনাথ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ বিরোধের একটা সাধারণ প্রতিকৃতি অঙ্কন করিয়া তাহাকে কাব্যসৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়া তোলেন—তাঁহার গল্পগুলিতে তথ্যসন্নিবেশ অপেক্ষাকৃত বিরল, বিশ্লেষণ, মনস্তত্ত্ব ও কল্পনা-সমৃদ্ধি উভয় দিক দিয়াই মনোজ্ঞ ও রমণীয়। শরৎচন্দ্রের গল্পে বাস্তবতার সুরটি আরও তীক্ষ্ণ আরও অসন্দিগ্ধভাবে আত্মপ্রকাশ করে; কবিত্বপূর্ণ বিশ্লেষণের অন্তরালে চাপা পড়ে না। ভাব-প্রকাশের গভীরতাতেও তাঁহারই শ্রেষ্ঠত্ব—তাঁহার গল্পগুলিতে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র সংঘাতগুলি অন্তর্বিপ্লবের বিদ্যুৎ-চমকে দীপ্ত হইয়া উঠে। তিনি কোথাও কেবল ঘটনাবৈচিত্র্য বা কাব্যসৌন্দর্যের জন্য কোন দৃশ্যের অবতারণা করেন না—প্রত্যেক দৃশ্যই চরিত্রের উপর আলোকপাত করে।

শরৎচন্দ্রের পারিবারিক বিরোধ-চিত্রগুলির মধ্যে আর-একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। যে সমস্ত পূর্বতন ঔপন্যাসিক ভ্রাতৃবিরোধ বা সংসারবিচ্ছেদের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাঁহারা প্রায়ই সমস্ত দোষ এক পক্ষের উপর চাপাইরা নীতি এবং কলাকৌশল উভয় দিক হইতেই একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। যেখানে এক পক্ষ প্রবল অত্যাচারী ও অন্য পক্ষ নিরীহ ও অসহায়, বিনা প্রতি-বাদে অপর পক্ষের অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকে, সেখানে একপ্রকার সুলভ করুণরস উদ্বেলিত হইয়া উঠে বটে, কিন্তু বিরোধের তীব্রতা ও জটিলতা একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। 'স্বর্ণলতায়' ভ্রাতৃবিরোধের চিত্রটি আলোচনা করিলে পাঠকের সহানুভূতি এক মুহূর্তের জন্যও দ্বিধাগ্রস্ত বা অনিশ্চরিত থাকে না—প্রমদা ও সরলার মধ্যে পক্ষাবলম্বন করিতে বিন্দুমাত্র সংশয় বা বিলম্ব হয় না। কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রে মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণে বিশেষ কিছু গভীরতা থাকে না—কলাকৌশলের দিক দিয়া এ সমস্ত চিত্র প্রায়ই অক্ষম ও ব্যর্থ হইয়া থাকে। শরৎচন্দ্রের সমস্যাগুলি এত সহজ ও প্রাথমিক রকমের নহে—তাঁহার মনশ্চরিত্রের অভিজ্ঞতা তাঁহাকে শিখাইয়াছে যে এরূপ দায়িত্ব-বিভাগ ঠিক প্রকৃতির অনুগামী নহে। ন্যায় ও ধর্ম যে পক্ষে, যাহার হৃদয় সরল

ও অবিকৃত, তাহার মধ্যে একটা বাহ্য কর্কশতা বা তীব্র অসহিষ্ণুতা আরোপ করিয়া তিনি বিরোধটিকে জটিলতর করিয়া তোলেন।

এই বিশেষত্বের উদাহরণ শরৎচন্দ্রের প্রায় সমস্ত গল্পেই মেলে। 'বিন্দুর ছেলে'তে অমূল্যধনের প্রতি বিন্দুর তীব্র, উৎকট স্নেহ পরিবারিক জীবনের সাধারণ মাত্রাকে বহুদূর অতিক্রম করিয়া যায়। তাহার দারুণ অভিমান, পরমত-অসহিষ্ণুতা ও ধনগর্ব তাহার অনুক্ষণ সন্দেহপরায়ণ অতিসতর্ক অপরিমিত স্নেহের সহিত এমন ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত, তাহার চরিত্রটিতে দোষে গুণে এমন মাখামাখি হইয়াছে যে তাহার সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট মতামত প্রকাশ খুব সহজ নহে। ঈর্ষা বা বিদ্বেষ যে পারিবারিক শান্তিভঙ্গের একমাত্র কারণ তাহা নয় ; অনেক সময় স্নেহের আতিশয্য বা বিভাগ-বৈষম্য যে ভাঙনের সৃষ্টি করে তাহা আরও মর্মান্তিক। এখানে বাহির হইতে যে বিরোধের কারণটি আসিয়াছে —এলোকেশী ও নরেনের আবির্ভাব--তাহার প্রভাব বিশেষ স্পষ্ট হয় নাই, এবং গল্পের সহিত তাহাদের যোগ বিশেষ ঘনিষ্ঠ নহে।

'রামের সুমতি'তে একই সমস্যার একটা ভিন্ন দিক দেখানো হইয়াছে। এখানে বিরোধের মূল কারণ নারায়ণীর স্নেহাতিশয্য নহে ; একদিকে রামের উৎকট দুরন্তপনা, অপর দিকে নারায়ণীর মাতার ঈর্ষা বিদ্বেষ, জটিলতার সূত্রে পাক দিয়াছে। দুরন্ত রামের মধ্যে যে স্নেহশীল হৃদয় আছে তাহা কেবল নারায়ণীর স্নেহের স্পর্শে জাগিয়া উঠে--যাহার স্নেহ নাই সে এই গোপন মাধুর্যের সন্ধান পায় না। নারায়ণীর মাতা কেবল তাহাকে ভুল বুঝিয়াছে এবং নিজ ঈর্ষা-দগ্ধ স্পর্শের দ্বারা তাহার দুরন্তপনাকে আরও উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে।

'মেজদিদি' গল্পে বড়বধূর ভ্রাতা পিতৃমাতৃহীন কৃষ্ণর প্রতি মেজবধূ হেমাঙ্গিনীর সহানুভূতিমিশ্র ভালবাসাই মুখ্য বিষয়। নিজের দিদি অপেক্ষা এই নিঃসম্পর্কীয়া দিদির বেশী ভালবাসাই তাহাদের সম্পর্কে জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। কৃষ্ণর প্রতি হেমাঙ্গিনীর এই অহেতুক ভালবাসা চারিদিক হইতে বাধাপ্রাপ্ত ও প্রতিহত হইয়া বেশ স্বাভাবিক অক্ষুণ্ন গতিতে প্রবাহিত হইতে পায় নাই। এই রুদ্ধমুখ স্নেহ কখনও বা কৃষ্ণর প্রতি তীব্র বিরক্তির আকারে কখনও বা তাহার স্বামী বিপিনের বিরুদ্ধে একটা মর্মান্তিক অভিমানের রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যে পর্যন্ত না পরিবারের মধ্যে ইহা একটি স্বাভাবিক, চিরস্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে, সে পর্যন্ত ইহার অশান্ত বিক্ষোভ শান্তি লাভ করিতে পারে নাই।

'মামলার ফল' গল্পটিতেও স্নেহের এই তির্যক গতির একটি নূতন রকমের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। ভ্রাতৃবিরোধে দ্বিধাবিচ্ছিন্ন পরিবারের মধ্যে

ছোট ভায়ের ছেলে, কিন্তু বড় ভাইএর স্ত্রীর দ্বারা লালিতপালিত গয়ারাম একটা অভগ্ন সংযোগ সেতুরূপে রহিয়া গিয়াছে।

'একাদশী বৈরাগী'তে মানবমনের একটি বিস্ময়কর অসঙ্গতির চিহ্ন দেখানো হইয়াছে। একাদশী একেবারে চক্ষুলজ্জাহীন সুদখোর—প্রসন্নমনে একটা পয়সা সুদ ছাড়াও তাহার পক্ষে অসম্ভব। চারি আনা চাঁদা দেওয়া তাহার পক্ষে দানশীলতার চরম সীমা। কিন্তু এই পাষাণের মধ্যেও দুইটি শীতল নির্ঝর প্রবাহিত হইতেছে—এক তাহার পদস্খলিত ভগিনীর প্রতি একান্ত অনুযোগহীন স্নেহ, আর একটি তাহার গচ্ছিত অর্থ সম্বন্ধে অবিচলিত ন্যায়নিষ্ঠা ও ধর্মজ্ঞান। যাহার মন একদিকে এত নীচ, অন্যদিকে তাহা প্রায় মহত্ত্বের শিখর স্পর্শ করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টির বিশেষত্ব এই যে নীচের মধ্যে মহত্ত্বের বীজ কখনও তাঁহার চক্ষু এড়ায় না।

'নিষ্কৃতি' গল্পে ভ্রাতৃবিরোধের চিত্রটি বেশ পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে। এখানে যদিও হরিশ ও তাহার স্ত্রী নয়নতারার কুটিলতাই বিরোধের প্রধান কারণ, তথাপি সিদ্ধেশ্বরীর তোষামোদপ্রিয়তা ও অস্থিরমতিত্ব এবং শৈলর অনমনীয় তেজস্বিতা ও মতদার্ঢ্যও সংঘর্ষের তীব্রতা বাড়াইয়া দিয়াছে। একান্নবর্তী পরিবারে পাঁচজনকে লইয়া চলিতে হইলে যতটা কোমলতা, সহিষ্ণুতা ও আত্মসঙ্কোচের প্রয়োজন, শৈলর মধ্যে তাহার একান্ত অভাব। তাহার কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও অকুণ্ঠিত স্পষ্টবাদিতা কোনরূপ দুর্বলতার প্রশ্রয় দিতে নারাজ, সুতরাং সংসারের রাখা-ঢাকা, ভাগ-বণ্টনের কাজে ইহা একেবারেই অনুপযুক্ত। আবার সিদ্ধেশ্বরীর স্নেহদুর্বল হৃদয়টিও সর্বদাই দ্বিধাসন্দেহে দোলায়িত ; শৈলর প্রকৃত মনোভাব যে তিনি না বুঝেন তাহা নহে ; তথাপি তাহার নিকট নীরব, অক্লান্ত সেবার অতিরিক্ত একটাও মনরাখা কথা না পাইয়া তাঁহার মন মাঝে মাঝে বিরূপ হইয়া বসে ও নয়নতারার চক্রান্ত বুঝিলেও অনিচ্ছায় তাহার পোষকতা করে। আবার অতুলচন্দ্রের বয়কটের কথা স্মরণ করিলে নয়নতারার সপক্ষেও যে কিছু বলিবার আছে তাহা আমরা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করি। সকলের সহযোগিতাই এই পারিবারিক বিরোধের চিত্রটিকে বেশ জটিল ও মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছে—দোষ কেবল একপক্ষের হইলে সংঘর্ষের তীব্রতা এত ঘনীভূত হইতে পারিত না।

'বৈকুন্ঠের উইলে' ভ্রাতৃবিরোধের একটা অনন্যসাধারণ দিক দেখানো হইয়াছে। তাহার বি এ অনার পাশ ভাই বিনোদের প্রতি গোকুলের মনোভাব ঠিক সাধারণ অগ্রজের মতো নহে—তাহার স্নেহের সহিত একটা সশঙ্ক সশ্রদ্ধ কুণ্ঠার ভাব জড়াইয়া আছে। তাহার অশিক্ষিত, অসঙ্কোচিত, বাহ্যত কর্কশ ভাবের অন্তরালে যে মাধুর্য ও কোমল স্নেহশীলতা প্রবাহিত হইতেছে তাহার মৌলিকতা উপভোগ্য। বৈকুণ্ঠের উইলে গোকুলের চরিত্রে লেখক তাহার সহজ

ও বাহ্য ইতরতা কোন আদর্শবাদের দ্বারা রূপান্তরিত করেন নাই। তবে গোকুলের বাক্য ও ব্যবহারে অসংযম ও অস্থিরমতিত্ব যেন চরম মাত্রায় উঠিয়াছে—এইরূপ প্রকৃতির লোকের পক্ষে ব্যবসায় বা পরিবারের কর্তৃত্ব—এই দুইই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। তাহার ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশী ও পিতার অগাধ বিশ্বাসের সঙ্গে তাহার পরবর্তী খামখেয়ালী ব্যবহারের যেন একটা অসঙ্গতি থাকিয়াই যায়।

'পণ্ডিত মহাশয়' গল্পে বৃন্দাবন ও কুসুমের পরস্পর ব্যবহারের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত, তাহাদের পুনর্মিলনের পথে নূতন নূতন প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি লেখকের বিশ্লেষণনৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। কুসুমের পক্ষে প্রধান বাধা বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে ভদ্র, উচ্চবর্ণোচিত প্রবল সংস্কার—বৃন্দাবনের পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা কুসুমকর্তৃক তাহার মাতার অপমান। বিবাহের পরে ধনী শ্বশুর-বাড়ির প্রভাবে কুঞ্জনাথের অতর্কিত আমূল পরিবর্তন অথচ এই পরিবর্তনের মধ্যে তাহার লুপ্তপ্রায় ভগিনীস্নেহের ধ্বংসাবশেষের গোপন সংরক্ষণ—বেশ সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়াছে। শেষের দৃশ্যগুলিতে বৃন্দাবনের সঙ্গে সঙ্গে উপ-ন্যাসটিও বাস্তবতাকে অতিক্রম করিয়া আদর্শের ঊর্ধ্বলোকে উঠিয়া গিয়াছে।

এই শ্রেণীর বাকী গল্পগুলির মধ্যে প্রেমের কাহিনী আলোচিত হইয়াছে। এই প্রেম ঠিক নিষিদ্ধ নহে ও সামাজিক বিধিনিষেধকে একেবারে তুচ্ছ করে নাই ; এবং 'চরিত্রহীন' প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর উপন্যাসের ন্যায় এগুলিতে প্রেমের ঘাতপ্রতিঘাতের খুব দীর্ঘ ও নিপুণ বিশ্লেষণও নাই। তথাপি পর-বর্তী উপন্যাসগুলির পূর্বসূচনা কতকটা ইহাদের মধ্যেও পাওয়া যায়। প্রেম সম্বন্ধে স্বচ্ছ ও সহানুভূতিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি বরাবরই শরৎচন্দ্রের বিশেষত্ব। বিবাহের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না হইলেও, সামাজিক অনুমোদনের ছাপ মারা না থাকিলেও চিরাভ্যস্ত সংস্কারের খোলস-বর্জিত হইলেও প্রেমের যে একটা নৈসর্গিক মহত্ত্ব, একটা বিপুল আত্মলোপী আবেগ আছে সে বিষয়ে শরৎচন্দ্র তাঁহার প্রথম বয়সের উপন্যাসেও বেশ সচেতন আছেন। এই ধিক্কৃত অবমানিত প্রেম চিরকালই তাঁহার গভীর সহানুভূতি পাইয়া আসিয়াছে। ইহার প্রথম আবির্ভাব ও ক্রমপরিণতি, ইহার উচ্ছ্বসিত আবেগ ও বিপুল আত্মোৎসর্গ ইহার অদম্য স্বাধীনতা ও সমাজের অন্যায় প্রতিষেধের বিরুদ্ধে নির্ভীক বিদ্রোহ, সর্বোপরি ইহার ব্যাকুল অন্তর্দ্বন্দ্ব ও দ্বিধাসন্দেহজড়িত আত্মোপ-লব্ধি তিনি প্রত্যক্ষ গভীর অনুভূতির সহিত ও অভ্রান্ত নিপুণ বিশ্লেষণের সাহায্যে চিত্রিত করিয়াছেন—এবং বঙ্গের উপন্যাসসাহিত্যে ইহাই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

# শরৎচন্দ্র-বন্দনা

## নিরুপমা দেবী

পর্বতের এক নিভৃত গুহায় নির্ঝর যেমন তাহার জীবনের কিছুদিন কাটাইয়া সহসা একদিন প্রবলবেগে পৃথিবীর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং নিজের প্রচুর জীবনধারায় তাহার দেশগ্রাম অভিষিক্ত করিতে করিতে চলিতে থাকে, তেমনি পশ্চিমের এক সামান্য গৃহকোণে যে অদ্ভুত রচনাশক্তি ক্রমপরিণতি লাভ করিয়া আজ বাংলা সাহিত্যভূমিকে তাহার অপূর্ব রসধারায় অভিসিঞ্চিত ও প্লাবিত করিয়া বহিয়া চলিয়াছে, সেই অদ্ভুত শক্তি ও শক্তিমানের কথা ভাবিতে আজ আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই। একদিন যে সুধানিস্যন্দিনী নির্ঝরিণীর স্নেহধারা "অভিমান', 'বালা', 'শিশু", 'কোরেলগ্রাম', 'বোঝা', 'কাশীনাথ', 'চন্দ্রনাথ', 'দেবদাস', 'বড়দিদি' প্রভৃতি রূপে সেই গুহাতলে বহিয়া সেই অখ্যাত দিনের স্নেহসঙ্গীগুলিকে মন্ত্রমুগ্ধ করিত, আজ সেই নির্ঝর তাহার বিপুল বিস্তৃত স্রোতে বঙ্গসাহিত্যভূমির বক্ষে 'শ্রীকান্ত', 'পথের দাবী', 'দত্তা', 'ষোড়শী' 'পল্লী-সমাজ', 'গৃহদাহ', 'চরিত্রহীন' প্রভৃতি অসংখ্য চরিত্রতরঙ্গমালার বিচিত্র শোভা দান করিতেছে, ইহা মনে করিতেও কি সে দিনের সেই সঙ্গীগুলি হর্ষগর্বপূর্ণ এক বিচিত্র অনুভবে অনুভাবিত না হইয়া থাকিতে পারে? আজ সেই শরৎচন্দ্রের জন্মদিনে দেশের সাহিত্যসূর্য হইতে সকল সাহিত্যসাধক সাহিত্যরসিক সানন্দে সম্মিলিত! এখানে আজ তাহাদের বলিবার বেশী কিছু তো থাকিতে পারে না ; তাহাদের কেবল দেখিবার কথা, অনুভব করিবার কথা!

নিজের প্রথম জীবনের তুচ্ছ সাহিত্যসেবায় একদিন যে পরোক্ষভাবে দূর হইতে এই শরৎচন্দ্রের রচনালোকে পথ দেখিবার সাহায্য পাইয়াছিল, শরৎ-চন্দ্রের সেদিনের সেই পরোক্ষপরিচিতা ভগ্নীস্থানীয়া আজও সকলের অন্ত-রাল হইতেই তাঁহাকে সানন্দ বন্দনা জানাইতেছে মাত্র। তারও প্রার্থনা আজিকার এই আনন্দসম্মিলন পূর্ণতম হউক : এই শরতে শরৎচন্দ্রজন্ম-উৎসবপার্বণে তাঁহার রচনাকিরণ দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া বঙ্গকথাসাহিত্যের শোভা দিনে দিনে বৃদ্ধি করুক।

# শ্রীকান্ত

**ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ**

## প্রথম পর্ব

শ্রীকান্ত (১ম পর্ব) ১৩২২ সালের মাঘ-চৈত্র ও ১৩২৩ সালের বৈশাখ-মাঘ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৩ সালের মাঘ মাসে (১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯১৭)। 'শ্রীকান্ত' (১ম) ব্রহ্মদেশে লিখিত শরৎ-চন্দ্রের শেষ গ্রন্থ। ১৯১৬ সালের ১১ এপ্রিল শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করেন। সুতরাং 'শ্রীকান্তে'র কিছুটা অংশ তিনি এ-দেশে আসার পর 'ভরতবর্ষে' প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মদেশে থাকার সময় শরৎচন্দ্র 'বিরাজ বৌ', 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'পথনির্দেশ', 'পরিণীতা', 'পণ্ডিতমশাই', 'মেজদিদি', 'পল্লী-সমাজ', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'অরক্ষণীয়া' 'চরিত্রহীন' (আংশিক) ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এদের মধ্যে 'পণ্ডিতমশাই', 'পল্লীসমাজ' ও 'চরিত্রহীনে'র মধ্যে সমাজ সম্পর্কে যে ভাবনা ও প্রতিবাদ প্রকাশ পেয়েছে, শ্রীকান্তের মধ্যেও তার অবতারণা দেখতে পাই। তবে 'পণ্ডিতমশাই' ও 'পল্লীসমাজে'র মধ্যে সমাজরূপই বড় হয়ে উঠেছে, কিন্তু 'শ্রীকান্তে'র মধ্যে প্রধান হয়ে উঠেছে ব্যক্তিরূপ। আর 'চরিত্রহীনে'র মধ্যে যে প্রখর মননশীলতা ও উদ্ধত বিদ্রোহ দেখতে পাওয়া যায় শ্রীকান্তের মধ্যে তা নেই। 'শ্রীকান্তে'র মধ্যে বেদনাময় অনুভূতি মাঝে মাঝে প্রতিবাদের উত্তপ্ত ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে এবং মননশীল বিতর্কের স্থানে অন্তমুখীন ভাবচারিতা স্থান পেয়েছে। তবে উপন্যাসের শ্রেণী এবং রচনারীতির দিক দিয়ে 'শ্রীকান্ত' সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অন্যান্য রচনায় তিনি প্রত্যক্ষ বর্ণনারীতি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু 'শ্রীকান্তে' তিনি আত্মজীবনীমূলক রীতি অনুসরণ করেছেন। অন্যত্র কোথাও হয়তো তাঁর সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে, কোথাও হয়তো তাঁর নিজস্ব মতামত প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তিনি আর তাঁর চরিত্র এক হ'য়ে যান নি। তিনি একটু দূরে থেকে দেখেছেন ও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসে তিনি আর তাঁর নায়ক চরিত্র এক হ'য়ে গেছেন, কোন্ কথা শ্রীকান্তের আর কোন্ কথা শরৎচন্দ্রের সে-পার্থক্য বোঝা যায় না।

'শ্রীকান্ত' আত্মজীবনীমূলক রীতিতে রচিত হয়েছে বটে, কিন্তু 'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনী কিনা, এ সংশয় ও বিতর্ক বহুদিন ধরে চলেছে। সংশয় ও বিতর্কের কারণ, 'শ্রীকান্তে' বর্ণিত বহু ঘটনার সঙ্গে শরৎ-চন্দ্রের জীবনের অনেক ঘটনার মিল এবং 'শ্রীকান্তে'র কয়েকটি চরিত্র শরৎ-চন্দ্রের জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েক ব্যক্তির সঙ্গে অবিকল সাদৃশ্যযুক্ত। ভাগলপুরের ঘরবাড়ি, পথঘাট, বনজঙ্গল, গঙ্গা ও তার পারিপার্শ্বিক পরি-বেশ সবই শ্রীকান্তের কৈশোর পর্বের বর্ণনার মধ্যে স্থান পেয়েছে। শ্রীকান্তের যৌবনপর্বের ঘটনাগুলিও শরৎচন্দ্রের প্রথম যৌবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার

বর্ণনা বলেই মনে হয়। শ্রীকান্তের শিকার কাহিনী, তাঁর ভবঘুরে জীবন-যাত্রা, তাঁর অজ্ঞাতবাস···সব কিছুই শরৎচন্দ্রের নিজস্ব জীবনকাহিনী বলা যায়। উপন্যাসের ঘটনাস্থলগুলিও শরৎচন্দ্রের কৈশোর-যৌবনের লীলাভূমি বিহারের নানা অঞ্চলের সঙ্গে অভিন্ন। পিসিমা, পিসেমশাই, সেজদা, ছোড়দা, যতীনদা, রামকমল ভট্চায, ইন্দ্রনাথ, নীরুদিদি, কুমারসাহেব, রাজলক্ষ্মী—এ-সব চরিত্র শরৎচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ নানা ব্যক্তির অবিকল প্রতিকৃতিমাত্র। এ-সব কারণেই শ্রীকান্তের কাহিনী শরৎচন্দ্রেরই আত্মকাহিনী বলে মনে হয়।

শুধু কেবল বাইরের ঘটনা ও চরিত্রের দিক দিয়েই যে শ্রীকান্তের কাহিনীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের জীবনকাহিনীর সাদৃশ্য রয়েছে তা নয়; মানসিকতা, জীবন-বোধ ও সমাজভাবনার দিক দিয়ে বিচার করলেও শ্রীকান্ত ও শরৎচন্দ্রকে একই ব্যক্তি বলে মনে হয়। শরৎচন্দ্র তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে শ্রীকান্ত-সত্তার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন তা নয়, তাঁর নিজস্ব ব্যক্তি-সত্তাকেই শ্রীকান্ত-সত্তার সঙ্গে এক করে ফেলেছেন। শ্রীকান্তের ছন্নছাড়া, ভবঘুরে জীবন, তার কৌতূহলী অথচ নিরাসক্ত দৃষ্টি, নারী সম্পর্কে তার দরদ ও সহানুভূতি, সমাজের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তার তিক্ত প্রতিবাদ, তার অনুভূতিশীল ও স্পর্শকাতর মনোভঙ্গি—সব কিছুর মধ্যেই শরৎ-চন্দ্রকেই যেন দেখতে পাই। এজন্য ক্ষণে ক্ষণে ভুল হয় যে, শ্রীকান্ত এই ছদ্মনাম গ্রহণ করে শরৎচন্দ্র হয়তো আত্মজীবনী বর্ণনা করে চলেছেন। কিন্তু 'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনী নয়। কারণ, 'শ্রীকান্তে'র মধ্যে এমন অনেক ঘটনা আছে যা শরৎচন্দ্রের জীবনে ঠিক ঘটে নি, সেখানে লেখকের কল্পনাশক্তি বিচিত্র সৌন্দর্যের উপাদান সংগ্রহ করে বাস্তবের অভাব ও অপূর্ণতাকে সৌন্দর্যসুষমা ও সম্পূর্ণতামন্ডিত করে তুলেছে। শরৎচন্দ্র আত্মজীবনী রচনা করতে চান নি। তিনি তাঁর জীবনের বাস্তব তথ্যকে সাহিত্যসত্যে পরিণত করতে চেয়েছেন। তাই তিনি এক অখন্ড রসপরিকল্পনা সম্মুখে রেখে প্রয়োজনমত তাঁর জীবনের তথ্য ব্যবহার করেছেন আবার বর্জনও করেছেন এবং শিল্পের পরিপূর্ণতার জন্যই মৌলিক উদ্ভাবনীশক্তির সাহায্যে বহু উপাদান ব্যবহার করেছেন। এমনিভাবে সত্য ও মিথ্যা, বাস্তব ও কল্পনা, অভিজ্ঞতা ও অনুমান আলো ও অন্ধকারের মত মিলে-মিশে 'শ্রীকান্ত' উপ-ন্যাসের মধ্যে বিরাজ করছে। শরৎচন্দ্র কোনো সত্য ঘটনা অবলম্বনে পাঠককে বশীভূত ক'রে হয়তো অলীক কল্পনারাজ্যে নিয়ে যাচ্ছেন, আবার যে মুহূর্তে সম্মোহিত পাঠক সন্দেহ করতে শুরু করেছে তখনই তাকে আবার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কোনো সন্দেহাতীত স্থানে নিয়ে উপস্থিত করছেন। এমনিভাবে পাঠক বিশ্বাস-সংশয়ের দোলায় প্রতি মুহূর্তে আবর্তিত হতে থাকে। এখানেই লেখকের অসামান্য শিল্পচাতুর্য।

'শ্রীকান্ত' যে শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনী নয়, উপরে তা আলোচনা করা হল। তবে 'শ্রীকান্ত' কি উপন্যাস? যদি উপন্যাস হয়, কোন্ শ্রেণীর উপন্যাস?

'শ্রীকান্ত' যখন 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়েছিল, তখন নাম ছিল 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী'। হয়তো শরৎচন্দ্র ভ্রমণকাহিনীরূপেই প্রথম এর পরিকল্পনা করেছিলেন। গোড়ার দিকে ভ্রমণের উল্লেখও রয়েছে, যথা, 'ভ্রমণ করা এক, তাহা প্রকাশ করা আর।' শ্রীকান্ত নিজেকে বলেছে 'ভবঘুরে'। শ্রীকান্তের আর একটি উক্তিও উল্লেখযোগ্য, 'ভগবান যাহাকে তাঁহার বিচিত্র সৃষ্টির ঠিক মাঝখানটিতে টান দেন...'। বোধহয় ভগবানের বিচিত্র সৃষ্টির পরম রহস্য ও সৌন্দর্যের পথে আহবান শুনেছিল বলেই শ্রীকান্ত ঘরের বন্ধন ছিন্ন করে পথেই বেরিয়ে পড়েছিল। শান্ত, নিয়মমানা, আরামপ্রত্যাশী জীবন শ্রীকান্তের ছিল না। তার মধ্যে এমন একটি পলাতক মন ছিল, যা অনবরত অজানার সন্ধানে ও অপরিচিতের মেলায় বেরিয়ে পড়তে চাইত। স্নেহের আকর্ষণ তাকে ধরে রাখতে পারে নি। শাসনের ভীতি তাকে থামিয়ে রাখতে পারে নি। ইন্দ্রনাথের সঙ্গে রাতের অভিযানে যেমন সে বেরিয়ে পড়ত, তেমনি অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় কুমারসাহেবের দলে সে যোগ দিত। আবার পাটনায় যেতে গিয়ে সন্ন্যাসীর চেলা হয়ে ঘুরল, পাটনায় পিয়ারী বাইজীর আরাম ও বিলাসের শতপ্রকার আয়োজন উপেক্ষা করে আবার বেরিয়ে পড়ল। এমনিভাবে শ্রীকান্ত কেবলি চলেছে, এক অজানার নেশা তাকে অবিরাম ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। কি সে চায় তা হয়তো জানে না, তার লক্ষ্যস্থান কোথায় তাও হয়তো অস্পষ্ট, শুধু এটুকু জানে যে, থামাতে শান্তি নেই, আর কোনো পাওয়াতেই তৃপ্তি নেই। এজন্যই বোধহয় সে চির ভ্রাম্যমাণ এবং এ-জন্যই বোধহয় তার কাহিনী ভ্রমণকাহিনী।

কিন্তু তবুও 'শ্রীকান্ত'কে ভ্রমণকাহিনী বলা যায় না।

ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে বস্তুজগতের নব নব সৌন্দর্য এবং অপরিচিত প্রকৃতি ও মানবসমাজের কৌতূহলোদ্দীপক রহস্যই পাঠকচিত্তকে আকর্ষণ করে। কিন্তু 'শ্রীকান্ত' অপরিচিত বস্তুজগতের কোনো বৈচিত্র্য ও অভিনব সৌন্দর্যপ্রধান হয়ে ওঠে নি। পটভূমির কোনো দ্রুত পরিবর্তনশীলতা ভ্রমণের রস সঞ্চার করতে পারে নি। ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে বর্ণনার যে বস্তুমুখীনতা ও গতিশীলতা থাকে তা এখানে নেই। এখানে একটি অখণ্ড আত্মমগ্ন চেতনার আলোকে বস্তুজগৎ উদ্ভাসিত এবং স্থিতিশীল আত্মোপলব্ধির মধ্যে ভ্রমণের গতিশীলতা অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। সেজন্য শ্রীকান্তের চলমান জীবনের কাহিনী যথার্থ ভ্রমণকাহিনী হয়ে উঠতে পারে নি।

তবে কি 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস? এ-সম্বন্ধেও কেউ কেউ আপত্তি তোলেন। এখানে উপন্যাসের বাঁধুনি কোথায়? বিভিন্ন অংশের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য ঐক্য কোথায়? আদ্যন্ত অনিবার্য যোগ কোথায়? শুধু কেবল বিচ্ছিন্ন চিত্র-

সমষ্টি, অখণ্ড বৃত্তপরিকল্পনার অভাব। এ-সব প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, উপন্যাস তো একটিমাত্র রীতি অনুসরণ করে না, যেমন সুসংবদ্ধবৃত্ত উপন্যাস আছে, তেমনি শিথিলবৃত্ত উপন্যাসও তো রয়েছে। ঘটনার বিচ্ছিন্নতা ও বহু-মুখীনতা এবং বৃত্তগঠনের অবিন্যস্ততা বিশ্বের অনেক শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। আজকের উপন্যাস ও নাটকের মধ্যে তো সুসংহত ঐক্যবদ্ধ বৃত্ত বিলুপ্তই হয়ে গেছে, শুধু কেবল কয়েকটি অসংবদ্ধ চিত্রই সেখানে সজ্ঞান ও নির্জ্ঞান ভাবনার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে উপস্থাপিত হচ্ছে। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের ঘটনাগুলি বাহ্য ঐক্যে আবদ্ধ নয়, কিন্তু একটি অদৃশ্য আন্তর ঐক্যের সূত্র ঘটনাগুলিকে বেঁধে রেখেছে। সেই সূত্রটি রয়েছে শ্রীকান্ত চরিত্রের মধ্যে। এ-উপন্যাসের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছে শ্রীকান্ত, তার বিচিত্র অভিজ্ঞতা, তার অনুভূতির নানা রঙ, বাহ্যবস্তু সম্পর্কে তার মানস-প্রতিক্রিয়া এবং তার মনন ও দর্শনই এই উপন্যাসের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। অনেকেই তার চলার পথে এসেছে, তারা তার মনের উপর আলো ও ছায়া ফেলে সরে গেছে, কেউ কেউ বা ঘুরে ফিরে আবার এসেছে। শ্রীকান্তের অন্তরচেতনা ও হৃদয়-রসের স্পর্শে তারা বিশিষ্টভাবে মূর্ত ও প্রাণায়িত হয়ে উঠেছে। শ্রীকান্তের এই অভিজ্ঞতার অবিচ্ছিন্ন ধারা, তার চেতনার অবিরাম প্রবাহ উপন্যাসটিকে অদৃশ্য ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে। সেজন্য উপন্যাসের অখণ্ডতা ও সামগ্রিকতা যে এর মধ্যে নেই তা নয়।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাস। কিন্তু একে কোন্ শ্রেণীর উপন্যাস বলব? এর উত্তরে বলা যায় যে, 'শ্রীকান্ত'কে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বললে সম্ভবত ঠিক হয়। 'শ্রীকান্ত' আত্মজীবনী নয়, কিন্তু আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। আত্ম-জীবনীমূলক উপন্যাস আমরা সেই উপন্যাসকেই বলব, যেখানে লেখকসত্তা ও নায়কসত্তা প্রায় এক হয়ে গেছে। আত্মজীবনীলেখক উত্তম পুরুষের মুখে বর্ণনা দেন, তেমনি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসও উত্তম পুরুষের মুখে বর্ণিত হয়। লেখকের আমি ও নায়কের আমি এখানে অভিন্ন। কিন্তু উত্তম পুরুষের মুখে বর্ণনা থাকলেই উপন্যাস আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস হয় না। বঙ্কিম-চন্দ্রের 'ইন্দিরা' ও শরৎচন্দ্রের 'স্বামী'-তেও উত্তম পুরুষের মুখে কাহিনীর বর্ণনা রয়েছে, কিন্তু ওই রচনাগুলিকে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলা চলে না। আবার 'রজনী', 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে কাহিনীর বর্ণনা হয়েছে বটে, কিন্তু তাদের কথা লেখকের কথা বলে মনে হয় না। আত্মজীবনীমূলক রীতিতে অনেক সেরা উপন্যাসই রচিত হয়েছে, যথা, ড্যানিয়েল ডিফোর 'রবিনসন ক্রুসো', ডিকেন্সের 'ডেভিড কপারফিল্ড', কামুর 'আউটসাইডার', নাবোকোভের 'লোলিটা', সমরেশ বসুর 'প্রজাপতি' ইত্যাদি। এদের মধ্যে 'ডেভিড কপারফিল্ড', 'আউটসাইডার' প্রভৃতি উপন্যাসকে আত্ম-

জীবনীমূলক উপন্যাস বলা চলে। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের কতকগুলি সুবিধা আছে। লেখকের মুখে চরিত্রের অন্তর্জীবনের ব্যাখ্যা অপেক্ষা চরিত্রের নিজের মুখে তার অন্তর্জীবনের ব্যাখ্যা অনেক বেশি অকৃত্রিম ও বিশ্বাস-যোগ্য মনে হয়। আবেগ-অনুভূতির কম্পন, সযত্নে লালিত কোনো স্মৃতির ক্রন্দন, ভীরু মনের কোনো গোপন কামনা, অকারণ বেদনা-অভিমানের অব্যক্ত গুঞ্জন—এ-সব চরিত্রের মুখে ব্যক্ত হলে পাঠকের মন কোনো অজ্ঞাত হৃদয়-রহস্যের আবিষ্কারে যেন আনন্দিত হয়ে ওঠে। অন্তর্জীবনের পরিচিতি যেমন আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে অধিকতর সত্য ও প্রাণময় হয়ে ওঠে, তেমনি বহির্জীবনের বর্ণনা এই উপন্যাসে কিছুটা একপেশে ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। লেখক যদি বর্ণনাকারী হন তাহলে তিনি তাঁর নিরপেক্ষ ও সমদর্শী দৃষ্টি দিয়ে সকল চরিত্রকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। কিন্তু গ্রন্থের কোনো চরিত্র যখন বর্ণনা করে, তখন সে তাঁর ভালোলাগা কিংবা মন্দলাগা দৃষ্টি দিয়ে, তার সংস্কার, বিশ্বাস ও প্রবৃত্তি দিয়ে অন্য চরিত্রের ব্যাখ্যা ও বিচার করবে। সেজন্য সেই অন্য চরিত্রের যথার্থ স্বরূপ আচ্ছন্ন কিংবা অতিশয়িতভাবে উদ্‌-ঘাটিত হবারই সম্ভাবনা। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের আর একটি অসুবিধা এই যে, এখানে বক্তাচরিত্র নিজেকে বর্ণনা ও বিচার করতে পারে না। সে নিজেকে ব্যক্ত করতে পারে বটে, কিন্তু কোনো চরিত্রকে বর্ণনা ও বিচার করতে গেলে যে দূরত্ব প্রয়োজন, সেই দূরত্ব এখানে নেই বলে চরিত্রের আবয়-বিক সমগ্রতা এবং তার পূর্ণ ব্যক্তিত্বের মূল্য নির্ধারণ সম্ভব নয়। আলোচ্য উপন্যাসে শ্রীকান্ত দ্রষ্টা ও বক্তা, সে অপরকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছে, বর্ণনা করেছে, কিন্তু ঘটনা ও ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তার যে সত্তা প্রকাশমান তার ভাল-মন্দ বিচার করতে পারে নি। তার চিন্তা, মনন, আবেগ ও অনুভূতি সে ব্যক্ত করেছে, কিন্তু সেগুলির মূল্য ও যাথার্থ্য সে যাচাই করে দেখতে পারে নি।

লুব্বোক তাঁর 'দ্য ক্র্যাফ্‌ট অব ফিক্‌শন'-এর মধ্যে উপন্যাসের দুই রকম শিল্পরীতির কথা উল্লেখ করেছেন, যথা, নাট্যরীতি ও চিত্ররীতি। নাট্যরীতিতে লেখক বস্তুনিষ্ঠ, বিচ্ছিন্ন ও নৈর্ব্যক্তিক, কিন্তু চিত্ররীতিতে তিনি নিজের ভাবনা ও অনুভূতি রচনার মধ্যে সঞ্চার করেন এবং পাঠকের সঙ্গে একটি অন্ত-রঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপন করেন। চিত্ররীতিতে কথা অপেক্ষা কথকই বড় হয়ে ওঠেন। এই রীতির উপন্যাসে ঘটনার নিজস্ব, স্বাধীন গতি নেই, কথকের এলোমেলো ভাবনার ধারা অনুসরণ করে ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস এই চিত্ররীতি অনুসরণ করেছে। সেজন্য এখানে ঘটনার স্বাধীন ও অনিবার্য গতি নেই, খেয়ালী ও মরমী জীবন-পথিক শ্রীকান্তের মানস ভাবনা অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ ঘটনা ভাসমান শৈবালের মত ক্ষণকালের জন্য দৃষ্টি-পথে এসে আবার সরে গেছে। শ্রীকান্ত কখনো অতীতের স্মৃতিচারণ করেছে,

কখনো পার্শ্ববর্তী চলমান ঘটনার দিকে দৃষ্টিপাত করেছে, কখনো নিজস্ব কোনো মানসপ্রতিক্রিয়ার বর্ণনাতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে, আবার কখনো বা এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে মাত্রাতিরিক্ত সময়ক্ষেপ করেছে। এই রীতি অনেকটা কথকতা রীতির মত। কথকঠাকুর কথকতার সময় শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে তার অনুকূল করে এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে বিনা দ্বিধায় গমন করেন, মূল বক্তব্যবস্তু থেকে বহুদূর সরে গিয়ে কোনো অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে একেবারে মশগুল হয়ে পড়েন, নানা টীকা টিপ্পনী ও সরস মন্তব্যে বক্তব্যবস্তুকে আকর্ষণীয় করে তোলেন, আবার হয়তো পরমুহূর্তে কোনো করুণ বিষয়ের ধাক্কা দিয়ে শ্রোতাদের কান্নায় উদ্বেল করে তোলেন। শ্রীকান্তের কথনরীতিও অনেকটা এই ধরনের। শ্রীকান্তও ঘটনার গতি ও পরিণতির দিকে ভ্রূক্ষেপহীন। সে তার অতীতচারী দৃষ্টি হঠাৎ বর্তমানের মধ্যে নিবন্ধ করে হয়তো কোনো কিছু সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করে বস্তুবর্ণনা থেকে দার্শনিক ভাবনার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, কোনো রোমাঞ্চকর ঘটনার রসে পাঠকচিত্তকে নিমগ্ন করেই আবার হয়তো সমাজ-সমালোচনায় দীর্ঘ সময় ব্যয় করে তার ধৈর্য পরীক্ষা করে।

ঘটনার বিচ্ছিন্নতা ও তত্ত্বভাবনাময়তা সত্ত্বেও 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের আকর্ষণীয়তা অসাধারণ। এই আকর্ষণীয়তার কারণ হল, এতে পরিচিত জগতের সহজ বাস্তবতার পাশে অপরিচিত জগতের রহস্য ও উত্তেজনা যেন রাস্তার বাঁকে বাঁকে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করে আছে। এখানে দুঃসাহসিক অভিযাত্রী শ্রীকান্তের চোখে অ্যাডভেঞ্চারের নেশা, বিপদের কটাক্ষঘাতে তার চিত্ত চঞ্চল, ভয়ের অজগরের মাথার মণি লাভ করবার জন্য তার দুরন্ত বাসনা। এই উপন্যাসের আকর্ষণীয়তার আর একটি কারণ হল নাটকীয়ভাবে এর পরিস্থিতি ও রসের দ্রুত ও আকস্মিক পরিবর্তনশীলতা। প্রথম পরিচ্ছেদে মেজদার অসাধারণ অধ্যয়ননিষ্ঠা ও রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বৃত্তান্তের পরেই মাছ ধরার বিপদসঙ্কুল ও উত্তেজনাপূর্ণ অভিযানের বর্ণনা। কৌতুকতরল হাল্কা পরিবেশ হঠাৎ শ্বাসরোধকারী উত্তেজনাময় পরিবেশে পরিবর্তিত হয়ে গেল। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 'মেঘনাদবধ' নাটকের অভিনয়ের হাস্যরসাত্মক বর্ণনার পরেই অন্নদাদিদির দুঃখাবহ পরিণতির বিবরণ দিয়ে লেখক করুণ রসে আমাদের চিত্ত আর্দ্র করে তুলেছেন। কুমারসাহেবের তাঁবুর নৃত্যগীতমুখরিত মদোন্মত্ত পরিবেশের পাশেই শ্মশানের অন্ধকার নৈঃশব্দ্য ও অপ্রাকৃত রহস্য-লীলা। একদিকে জীবনের আলোকোজ্জ্বল সম্ভোগ-আসর, অন্যদিকে মৃত্যুর তমসাবৃত বৈরাগ্য-আশ্রম। এমনিভাবে রৌদ্রালোক ও মেঘের ছায়ার মত এই উপন্যাসের পরিস্থিতির চমকপ্রদ পরিবর্তন দেখা গেছে।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম স্তর সপ্তম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই

স্তরে শ্রীকান্তের কৈশোরলীলাই বর্ণিত হয়েছে। কিশোর বয়সের ঘরপালানো স্বভাব, দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চারের নেশা, সহজ বিশ্বাসপ্রবণতা, বন্ধুপ্রীতি এবং হৃদয়ের অদম্য ভাবোচ্ছ্বাস প্রভৃতি অতি সুন্দরভাবে এই স্তরে ফুটে উঠেছে। এই স্তরের নায়ক নিঃসন্দেহে ইন্দ্রনাথ। শ্রীকান্ত তার গুণমুগ্ধ, স্নেহাসক্ত সহযোগীমাত্র। বেপরোয়া ও দুঃসাহসী নায়ক ইন্দ্রনাথ চরিত্র অবলম্বনে শ্রীকান্ত কয়েকটি ভয়কণ্টকিত, বিপদাকীর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেছে। নিশীথরাত্রে গঙ্গার করাল স্রোতে অসমসাহসিক অ্যাডভেঞ্চার, রাশি রাশি মৃত-দেহের মধ্য দিয়ে শ্মশানের পথে যাত্রা, নিবিড় অরণ্যের ভয়াবহ অন্ধকারে সর্প-সংকুল কুটির আঙিনায় সাপুড়ের সঙ্গে ইন্দ্রনাথের প্রচণ্ড মল্লযুদ্ধ—এ-সব ঘটনা পাঠকচিত্তে নিদারুণ ভয় ও উত্তেজনার শিহরন জাগিয়ে তোলে। ইন্দ্রনাথ তার অমিত শক্তি, অসাধারণ সাহস, বুকজোড়া ভালোবাসা ও নিরাবরণ মনুষ্যত্ব শ্রীকান্তের মনের উপর চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইন্দ্রনাথের প্রভাবেই শ্রীকান্ত ঘরের শাসনের প্রতি উদাসীন, বিপদের কটাক্ষঘাতে চিরচঞ্চল, প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী এবং অবজ্ঞাত মানুষের মূল্য আবিষ্কারে আগ্রহী। আবার ইন্দ্রনাথের বিপরীত প্রভাব এসেছিল অন্নদাদিদির কাছ থেকে। শ্রীকান্তের উদ্ধত, অনিয়ন্ত্রিত ও উচ্ছৃংখল জীবনের উপরে এক সংযম ও নিবৃত্তির নিয়ন্ত্রীশক্তিরূপেই অন্নদাদিদির প্রভাব চিরকাল বিরাজ করেছে। অন্নদাদিদিকে দেখেই নারী সম্পর্কে তার অন্তরে চিরকালীন শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমবোধের সূচনা। নারী সম্পর্কে সমাজের ধারণা যে কত ভ্রান্ত এবং তার বিচার যে কত অসঙ্গত সে-শিক্ষাও শ্রীকান্ত অন্নদাদিদির চরিত্র থেকেই পেয়েছিল।

উপন্যাসের দ্বিতীয় স্তর শুরু হল অষ্টম পরিচ্ছেদ থেকে। প্রথম স্তরের বছর দশেক পরে দ্বিতীয় স্তরের ঘটনা শুরু। শ্রীকান্ত তখন যৌবনের মধুবনে অসংযত পদে চলা শুরু করেছে। অতিশয় নাটকীয়ভাবে কুমারসাহেবের মদোন্মত্ত সঙ্গীত-আসরে পিয়ারী বাইজীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মধুকণ্ঠী পিয়ারী তখন সেই তরল প্রমোদ-আসরের বহুবাঞ্ছিতা মক্ষিরাণী, শ্রীকান্তকে সে তার কণ্ঠের সকল মাধুর্য এবং হৃদয়ের সকল আগ্রহ ঢেলে গান শুনিয়েছিল। দীর্ঘ বিরহের পর সে তার চিরকাঙ্ক্ষিত প্রিয়তমকে পেয়ে বোধহয় সঙ্গীতের অর্ঘ্য সাজিয়ে তাকে বরণ করতে চাইল। তারপর শ্রীকান্তের সঙ্গে তার নিভৃত সাক্ষাতের সময় প্রথম প্রথম তাকে সেই লাস্যময়ী, বাক্‌চতুরা ও ব্যঙ্গনিপুণা বাইজীরূপেই দেখতে পাই। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তার মধ্য থেকে রাজলক্ষ্মী আত্মপ্রকাশ করল। সেই যে ছোটবেলায় যে ম্যালেরিয়াজীর্ণ মেয়েটি লোভী ও নির্মম শ্রীকান্তকে ভালোবেসেছিল, সেই ভালোবাসা বাইজী জীবনের শত-প্রকার কলুষিত কামনা ও বিলাস-সম্ভোগের মধ্যেও কিভাবে বেঁচেছিল তা ভেবে আশ্চর্য হতে হয়। সেই ভালোবাসার অধিকারেই সে শ্রীকান্তের উপরে

পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল। শ্রীকান্তের সঙ্গে রাজলক্ষ্মীর যত ঘনিষ্ঠতা হতে লাগল ততই দেখলাম সেই ছলাকলাময়ী, হাস্যোচ্ছলা, বাক্-পটীয়সী বাইজী প্রেমের বেদনা-অভিমান-অশ্রুজলে অভিষিক্তা কল্যাণময়ী রাজলক্ষ্মীতে পরিণত হচ্ছে। পাটনায় যখন রাজলক্ষ্মীকে আমরা দেখলাম, তখন তার মধ্যে সেই বারবন্দিতা যৌবনচঞ্চলা পিয়ারী বাইজী সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন। সে তখন দায়িত্বশীলা সংসারের কর্ত্রী স্নেহময়ী বঙ্কুর-মা। শ্রীকান্তের সঙ্গে তার কথাবার্তা ও আচরণের মধ্যেও প্রণয়ের গোপন কূজন-গুঞ্জন পূর্ণ ও মান-অভিমানজড়িত উচ্ছল রূপ দেখিনি, সেবাযত্ন ও সতর্ক তত্ত্বাবধানের মধ্য দিয়ে তার সংযমশাসিত পরিণত প্রেমের কল্যাণী মূর্তিই আমরা দেখেছি। রাজলক্ষ্মী সম্পর্কে শ্রীকান্তের প্রাথমিক বিরক্তি ও বিরূপতা ক্রমে ক্রমে গোপন আসক্তি এবং অবশেষে নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় পরিণত হয়েছিল। রাজলক্ষ্মীকে সে তার হৃদয়ের অনেকখানি দিয়েছিল, তা না হলে রাজলক্ষ্মীর সেবাযত্ন নিতে তার বাধত। তবে তার মধ্যে এমন একটা কঠিন সংযম ও সূক্ষ্ম আত্মমর্যাদাবোধ ছিল যে জোর করে সে কখনো দাবী জানাতে চাইত না, রাজলক্ষ্মীর হৃদয়ের সাম্রাজ্য সে ছিনিয়ে নিতে পারত, কিন্তু সেই সাম্রাজ্যের মোহ সে জয় করেছিল, সে তার অচরিতার্থ আশা ও আহত অভিমান নিজের মধ্যেই অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। রাজলক্ষ্মীকে কখনো জানাতে চায় নি।

এবার শ্রীকান্তের সামগ্রিক চরিত্র ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। শ্রীকান্তের মধ্যে ক্রিয়াশীলতা কম, ভাবুকতা ও অনুভূতিশীলতা বেশি। তাকে কখনো ঘটনা-স্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করতে, কিংবা কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে আমরা দেখিনি। যে ব্যক্তিত্ব সুস্পষ্ট পরিকল্পনাগ্রহণে, উদ্দেশ্যসাধনে কঠিন সঙ্কল্পে এবং উত্তপ্ত কর্মসংঘাতের মধ্যে প্রকাশ পায় তা আমরা শ্রীকান্তের মধ্যে দেখিনি। কিন্তু তাঁর হৃদয়ের অনুভূতিগুলি খুব সজাগ, সক্রিয় ও স্পর্শকাতর। মানুষের দুঃখ-কষ্ট তাঁর হৃদয়বীণার তন্ত্রীগুলির মধ্যে অবিরাম করুণ ঝঙ্কার তোলে। অন্নদাদিদির দুর্ভাগ্য তাকে বিচলিত করে, শিশুদের অকালমৃত্যু তার চোখদুটিকে সজল করে তোলে, নিরুদিদির শোকাবহ পরিণতি তাঁর অন্তরে স্থায়ী বেদনার রেখা এঁকে দেয়, গৌরী তেওয়ারীর কন্যার প্রতিকারহীন বিষাদ তার সন্ন্যাসীচিত্তকেও কাঁদাতে থাকে। শ্রীকান্তের ভালো-বাসার মধ্যেও বলিষ্ঠ প্রবৃত্তির আত্মঘোষণা নেই, অব্যক্ত আর্তি ও নীরব অন্তর-দহনের মধ্যেই তার অস্তিত্ব অনুভূত হয়। ইন্দ্রনাথকে সে যে কতখানি ভালোবেসেছিল তা সে শুধু অনুভব করেছে, কোনোদিন ব্যক্ত করতে পারেনি। রাজলক্ষ্মীর প্রতি তার ভালোবাসাও তার অন্তরে মণিদীপের মত প্রজ্বলিত, কিন্তু বাইরে সে দীপশিখা প্রকাশ পায়নি।

শ্রীকান্তের মধ্যে দরদী হৃদয়ের সঙ্গে একটি তীক্ষ্ম, মননশীল সমালোচক-

সত্তা যুক্ত হয়ে ছিল। চলমান ঘটনা অবলম্বনে শ্রীকান্ত সমাজের নানা শক্তির অসত্য, কপটতা, অসাধুতা ও নির্দয়তার কঠোর সমালোচনা করেছে। মড়ার জাত নিয়ে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে তার আলোচনার প্রসঙ্গ অবলম্বনে সে হিন্দু সমাজের জাতিভেদ ও ছোঁয়াছুঁয়ির অত্যাচার সম্পর্কে একটি কাহিনীর অবতারণা করে নানা কঠোর ও বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেছে। অন্নদাদিদির প্রসঙ্গে সে নারী সম্পর্কে হিন্দুসমাজের ভ্রান্ত ধারণা ও অন্যায় বিচার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে। নিরুদিদির প্রসঙ্গে পুনরায় সে সমাজের হৃদয়হীনতা সম্পর্কে তীব্র মতামত ব্যক্ত করেছে। মানুষের অন্তররহস্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীকান্ত সাহিত্যসমালোচকদের নিয়ে পড়েছে। তাদের সমালোচনা যে কত অন্তঃসারশূন্য, শুধু কেবল জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে যে মানুষের অতলান্ত হৃদয়রহস্যের কূলকিনারা পাওয়া যায় না সে-কথাই সে বিশ্লেষণ করে বোঝাতে চেয়েছে। গৌরী তেওয়ারীর হতভাগী মেয়ের প্রসঙ্গে পুনরায় শ্রীকান্ত জাতি-ভেদের কঠোর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছে। অনেক অসভ্য জাতির দৃষ্টান্ত দিয়ে সে বিচার করে দেখিয়েছে যে টিঁকে থাকাতেই সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায় না। জাতিভেদের উপর সমাজের টিঁকে থাকার মধ্যে যে কত বড় ফাঁকি ও মিথ্যা নিহিত রয়েছে তাও তার আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শ্রীকান্তের এ-সব আলোচনার মধ্যে ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান এবং সমাজের উন্নতি-অবনতির বিষয়ে তার অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীকান্ত শুধু সমাজ-সমালোচক নয়, সে জীবনদার্শনিকও বটে। চলমান ঘটনার গভীরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শ্রীকান্ত চিরন্তন জীবন-রহস্যের সন্ধান করেছে। আপাত পরিবর্তনশীলতার মধ্য দিয়ে অপরিবর্তনীয় সত্য উপলব্ধি করেছে। ইন্দ্রনাথের সহজ সত্যোপলব্ধির কথা আলোচনা করতে গিয়ে সে বলেছে, জগতে সবই সত্য। মিথ্যা শুধু মানুষের মনের সৃষ্টি। সত্য সম্পর্কে শ্রীকান্তের ধারণার মৌলিকত্বই এখানে প্রকাশ পেয়েছে। মজা দীঘির পাড়ে গিয়ে আর একদিন তার মনে হয়েছিল 'জগতে প্রত্যক্ষ সত্য যদি কিছু থাকে ত সে মরণ।' এই বহু পুরাতন সত্যটি জনহীন শূন্য শ্মশানভূমিতে নূতন করে শ্রীকান্তের মনে উপলব্ধ হল এবং বর্ণনাভঙ্গির মনোহারিত্বে পাঠকের মনকেও যেন নতুনভাবে ধাক্কা দিল। কিছু পরে ঘনীভূত রাত্রির অন্ধকারে শ্রীকান্তের দার্শনিক দৃষ্টির সম্মুখে আর একটি সত্যের যবনিকা উন্মোচিত হল। তার চোখে পড়ে অন্ধকারের দুকূলপ্লাবী সৌন্দর্য। এখানে শ্রীকান্ত শুধু দার্শনিক নয়, সে কবি। তার চোখে সত্য সুন্দর হয়ে ধরা পড়েছে। সুন্দর আলোতে নয়, সুন্দর কালোতে—এই দৃষ্টি কবির দৃষ্টি, শিল্পীর দৃষ্টি। অন্ধকার কালো, মৃত্যু কালো, ভগবানও কালো। এই জগৎব্যাপী কালোর

মধ্যে পরম সুন্দর বিরাজিত। কবি, রসিক ও দার্শনিক শ্রীকান্তের দৃষ্টি সেই পরম সুন্দরের মধ্যেই মগ্ন।

## দ্বিতীয় পর্ব

শ্রীকান্ত (২য় পর্ব) ১৩২৪ সালের আষাঢ়-ভাদ্র, অগ্রহায়ণ-চৈত্র ও ১৩২৫ সালের বৈশাখ-আষাঢ় ও ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশিত ১৩২৫ সালের ভাদ্র মাসে (২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯১৮)। শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব প্রকাশের দু'বছর পরে দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হয়। প্রথম পর্বের রচনা শুরু হয়েছিল রেঙ্গুনে, কিন্তু দ্বিতীয় পর্ব শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন হাওড়া-শিবপুরে বাস করবার সময়। শরৎচন্দ্রের জীবনধারার সঙ্গে শ্রীকান্তের কাহিনীর যদি সাদৃশ্য সন্ধান করা যায় তা হলে দেখা যাবে যে, প্রথম পর্বের মধ্যে শরৎ-জীবনেরও প্রথম পর্ব, অর্থাৎ ভাগলপুর পর্ব বর্ণিত। আবার উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের মধ্যে শরৎ-জীবনের দ্বিতীয় পর্ব, অর্থাৎ ব্রহ্মদেশ পর্বের নানা ঘটনার ছায়াপাত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে রেঙ্গুনের পটভূমিই প্রধান, অবশ্য আংশিকভাবে পাটনা ও কাশীতেও কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে, তবে এ-সব স্থানের পরিবেশ-চিত্রণ উপন্যাসে অনুপস্থিত। উপন্যাসের শেষ অংশের ঘটনাস্থল হল শ্রীকান্তের পল্লীভবন। এই পল্লীভবন শরৎচন্দ্রের দেবানন্দপুরে অবস্থিত নিজস্ব বাড়ি বলেই মনে হয়। শ্রীকান্তের আত্মীয়-স্বজন, শ্রীকান্তের সঙ্গে তাদের ব্যবহার, নিজের বাড়িতে তার সঙ্কুচিত অধিকার প্রভৃতির মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে শরৎচন্দ্রের নিজস্ব জীবনকাহিনীই যেন আভাসিত হয়ে উঠেছে। এমনিভাবে 'শ্রীকান্ত'-এর দ্বিতীয় পর্বের মধ্যেও আত্মজীবনী-মূলক উপাদানের সঙ্গে ঔপন্যাসিক উপাদান মিলে-মিশে রয়েছে।

'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বে শ্রীকান্তের কৈশোর ও প্রথম যৌবনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কৈশোরের অ্যাডভেঞ্চার এবং উদ্ধত যৌবনের দুঃসাহসিক অভি-যানের বর্ণনা ওই পর্বের পাতায় পাতায় বিস্ময়-রোমাঞ্চ জাগিয়ে তুলেছে। অপরিজ্ঞাত জীবনের রহস্যসন্ধানে এক ভ্রাম্যমাণের পথচলার বিবরণ সেখানে নব নব চমৎকৃতি ও উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে সেই ভবঘুরে শ্রীকান্ত যেন ঘরোয়া হয়ে পড়েছে। সংসারের পরিচিত চক্রের আবর্তনে সে বাঁধা পড়েছে। সেই সমাজবিহীন বোহেমিয়ান জীবনযাত্রা যেন শেষ হয়ে গেছে, এখন সে বহুজনবেষ্টিত সচেতন সামাজিক মানুষ। তার স্থিত যৌবন অসম্ভবের নেশায় আর মাতাল হয়ে ওঠে না, তা যেন অনেকটা হিসাবী, অনেকটা সাবধানী। ব্রহ্মদেশ থেকে ফিরে এসে শরৎচন্দ্র যে গ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন সেগুলির মধ্যে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনা অনেকখানি প্রাধান্য পেয়েছে এবং লেখকের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গিও অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সমাজের প্রথা

ও অনুশাসন সম্পর্কে বিচারবিতর্ক ও বিদ্রোহী ভাবনার পরিচয় পাওয়া গেছে ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে। 'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বেও সমাজের প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ সম্পর্কে শাণিত প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। প্রথম পর্বেও সমাজ সম্পর্কে অনেক ভাবনা ও অভিযোগ প্রকাশ পেয়েছে বটে, কিন্তু বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে শ্রীকান্তের মানসিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সমাজবিষয়ক নানা প্রশ্ন ও প্রতিবাদ উত্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে সামাজিক ভালোমন্দের প্রশ্ন ব্যক্ত হয়েছে প্রধানত অন্যান্য চরিত্রের বিক্ষুব্ধ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ, প্রথম পর্বে সমাজবিদ্রোহী হলেন লেখক স্বয়ং, কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে সমাজ-বিদ্রোহী স্থানান্তরিত হয়েছে তাঁরই সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে।

দ্বিতীয় পর্বে বিচিত্র মানুষের সঙ্গে শ্রীকান্তের প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ পরি-চয়ের ফলে তার দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত ও সমাজগত মানুষের বাস্তব ও যথার্থ চিত্র উজ্জ্বলভাবে ধরা দিয়েছে। বাংলাদেশের সমাজচিত্র এই পর্বে বিশেষ স্থান পায় নি। শুধু কেবল বর্ধমানগামী দরিদ্র কেরানীর একটি সহানুভূতি-সিক্ত চিত্র এবং শ্রীকান্তের আত্মীয়-স্বজনের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে গ্রাম্য নীচতা ও স্বার্থপরতার একটি শ্লেষাত্মক চিত্র উপন্যাসের স্বল্পস্থান অধিকার করে আছে। উপন্যাসের মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে বর্মী সমাজ ও রেঙ্গুনপ্রবাসী বাঙালী সমাজের বর্ণনা। শরৎচন্দ্র যতদিন ব্রহ্মদেশে ছিলেন ততদিন ব্রহ্মদেশ সম্পর্কে তিনি কিছু লেখেন নি। কিন্তু ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করার পরই ব্রহ্মদেশের পটভূমি নানাভাবে তাঁর লেখার মধ্যে এসে পড়েছে। চোখে দেখা মানুষগুলি যখন স্মৃতিপটে স্থান পেল তখনই সেই স্মৃতিপটের চরিত্রগুলি লেখকের অনুরাগ-বিরাগ, আনন্দ-বেদনার সহযোগে সাহিত্যের আঙিনায় এসে উপস্থিত হল। চোদ্দ বছর তিনি যে-দেশে ছিলেন সে-দেশের লোকগুলিকে খুব কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর সেই নিকট অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশেছিল ওই লোকগুলি সম্পর্কে তাঁর সপ্রশংস মনোভাব। বর্মী মেয়েদের স্বাধীনতা, তাদের চলাফেরার স্বচ্ছন্দ ও সঙ্কোচহীন রূপ লেখককে মুগ্ধ করেছিল। তবে একজন নিরীহ গাড়োয়ানকে নির্মমভাবে আখপেটা করার মধ্যে তাদের যে রণরঙ্গিণী মূর্তি প্রকাশ পেয়েছিল তা দেখে নারীপ্রগতি সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ একটু দমে গিয়েছিল, সন্দেহ নেই। বর্মী সমাজে বিবাহের নিয়মকানুন শিথিল হলেও বর্মী স্ত্রী বাঙালী স্বামীকে যে কি গভীরভাবে ভালোবাসতে পারে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় প্রতারিতা বর্মী মেয়েটির কাহিনীর মধ্যে। রেঙ্গুনের বস্তি অঞ্চলের চেহারা, নিম্নবৃত্তিতে লিপ্ত হরেক রকম মানুষের পেশা ও স্বভাব, বিমিশ্র জাতির লোকের সহ-অবস্থান—এসব চিত্র এই উপন্যাসে যথাযথ বাস্তবতার রঙ নিয়ে ফুটে উঠেছে।

রেঙ্গুনপ্রবাসী বাঙালী সমাজের যে চিত্র 'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বে পাওয়া

যায় তা শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে উজ্জ্বল। রেঙ্গুনের উচ্চ-বিত্ত ও সম্মানিত বাঙালী সমাজের চিত্র এখানে নেই। যে সমাজের মধ্যে শরৎচন্দ্র নিজে বাস করতেন সেই নিম্নবিত্ত মুটে, মজুর, মিস্ত্রী, কারিগর প্রভৃতি শ্রেণী নিয়ে গড়ে ওঠা সমাজের বর্ণনাই এখানে রয়েছে। কিন্তু বিদেশে শ্রেণীবৈষম্য ও জাতিভেদের কোনো বালাই নেই। এরা সকলেই মিলেমিশে শ্রেণীহীন, জাতিহীন একটি অখণ্ড সমাজ গড়ে তোলে। এদের বিবাহবন্ধন শিথিল, নিষেধ ও শাসনের বেড়াজালে এদের পারিবারিক জীবন আবদ্ধ নয়, নীতি ও ধর্মের কোনো কড়া নির্দেশ এরা গ্রাহ্য করে না।

'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের মত দ্বিতীয় পর্বের মধ্যেও বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমষ্টি সাজিয়ে কাহিনীটি গড়ে তোলা হয়েছে। তবে প্রথম পর্বে শ্রীকান্তের অন্তঃশীল মানসভাবনা যেমন সকল প্রকার বহির্বিচ্ছিন্নতার মধ্যেও একটা আন্তর-ঐক্য দান করেছে, দ্বিতীয় পর্বে কিন্তু শ্রীকান্তের মানসিকতার সেরূপ অবিচ্ছিন্ন অন্তঃপ্রবাহ নেই, তাই এখানে ঘটনাগুলি যেন আলগা আলগা ঘটেছে। ঘটনা হিসাবে সেগুলি আকর্ষণীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু সেগুলি শ্রীকান্ত-চরিত্রকে কতখানি প্রভাবিত ও বিকশিত করেছে তার কোনো নিদর্শন নেই। কাহিনীর আরম্ভ ও শেষ হয়েছে শ্রীকান্তের পল্লীগ্রামের বাড়িতে। মায়ের গঙ্গাজল সখীর প্রসঙ্গ নিয়ে কাহিনী শুরু হয়েছে। পাত্র হিসাবে সেই গঙ্গাজল যখন শ্রীকান্তের উপরেই দাবী জানিয়ে বসলেন তখন সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার জন্য পাটনায় সে রাজলক্ষ্মীর বাড়িতে গিয়েই উপস্থিত হল। প্রথম ও সংক্ষিপ্ত দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই রাজলক্ষ্মী-প্রসঙ্গ শেষ হয়েছে। এর পর শুরু হয়েছে ব্রহ্মদেশ যাত্রা। যাত্রার খুঁটিনাটি বিবরণের দিকে লেখকের এত বেশি আগ্রহ যে তিনটি পরিচ্ছেদ জুড়ে এই বিবরণ রয়েছে। 'শ্রীকান্ত'-এর প্রথম পর্বের আলোচনায় আমরা বলেছি যে, শ্রীকান্ত প্রথম পর্বকে ভ্রমণ-কাহিনী বলা যায় না। বস্তুতঃপক্ষে ভ্রমণকাহিনীরূপে দ্বিতীয় পর্বের দাবী অনেকটা যুক্তিযুক্ত মনে হতে পারে। যাত্রাপথের বর্ণনা, সহযাত্রীদের পরিচয় জ্ঞাপন, দূরবর্তী অজানা দেশের অপরিজ্ঞাত লোকেদের অভিনব স্বভাব, আচরণ প্রভৃতি বর্ণনার মধ্য দিয়ে কৌতূহল উদ্রেকের চেষ্টা, বহির্মুখীন, বস্তুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখার চেষ্টা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ভ্রমণকাহিনীর মেজাজ ও বৈশিষ্ট্যই এই রচনার মধ্যে ফুটে উঠেছে। ছয় থেকে বারো পরিচ্ছেদ পর্যন্ত রেঙ্গুনের বিচিত্র জীবনযাত্রার বর্ণনা। অবশ্য অভয়া-রোহিণীর বৃত্তান্ত এই অংশে বর্ণিত হয়েছে বটে, কিন্তু আশেপাশের চলমান দৃশ্যের চলচ্চিত্র নেওয়াই যেন লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য। এর পরের তিনটি দৃশ্যে শ্রীকান্তের দিন কেটেছে রাজলক্ষ্মীর সান্নিধ্যে—কখনো কলকাতায়, কখনো কাশীতে। অবশ্য কাহিনীশেষে নিজের পল্লীভবনে প্রত্যাগত শ্রীকান্তের কাছে রাজলক্ষ্মীর

উপস্থিতি বর্ণিত হয়েছে। কাশী থেকে শ্রীকান্তের ফিরে আসা, জ্বরে আক্রান্ত হওয়া এবং শ্রীকান্তের পাশে রাজলক্ষ্মীর এসে উপস্থিত হওয়া প্রভৃতি সময়-ব্যবহিত আলাদা আলাদা ঘটনা একই দৃশ্যে দেখানো হয়েছে। এ-কথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই পর্বে পরিচ্ছেদবিভাগে একটু অসতর্কতাই প্রকাশ পেয়েছে।

'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বের রচনারীতি প্রথম পর্বের রচনারীতি থেকে কিছুটা ভিন্ন। প্রথম পর্বের রচনা প্রধানত বর্ণনাশ্রয়ী, কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের রচনা প্রধানত সংলাপাশ্রয়ী। প্রথম পর্বে প্রকৃতির ভয়ালসুন্দর, চিত্ররস ও অনুভূতির গাঢ় রঙ আছে, দ্বিতীয় পর্বে সে-সব অনুপস্থিত। নিত্যকার কথোপকথনের ভাষায় একটা স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিকতা আছে এইমাত্র। প্রথম পর্বে প্রকৃতির ভয়ালসুন্দর, আশঙ্কা-কণ্টকিত ও রহস্যজড়িত যে-রূপ দেখা যায়, দ্বিতীয় পর্বে তা চোখে পড়ে না। দ্বিতীয় পর্বে প্রকৃতির রাজ্য থেকে শ্রীকান্ত নির্বাসিত, লোকালয়ের ভিড়ে তার অনবকাশ মন নিবদ্ধ বলে তার বর্ণনা শুধু ঘটনাকে বিবৃত করেছে, তার চেতনার রঙে সেই ঘটনাকে অনুরঞ্জিত করতে পারে নি। দ্বিতীয় পর্বে বর্ণনাকুশলতার অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সমুদ্র-ঝড়ের বর্ণনায়। এ-ধরনের চিত্তচমৎকারী শিল্পরসাত্মক সমুদ্র-ঝড়ের বর্ণনা বাংলা সাহিত্যের খুব কম জায়গাতেই পাওয়া যায়। গম্ভীর সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার খুব কমই, চরম বিপদের মধ্যেও একটি কৌতুকরসাত্মক বর্ণনা-ভঙ্গি রক্ষা করে যাওয়া, কিন্তু ঝড়ের ভয়াল সম্ভাবনা, সর্বগ্রাসী উত্তাল তরঙ্গমালার প্রলয়ঙ্কর গতি এবং তরঙ্গপ্লাবিত জাহাজের অভ্যন্তরীণ বিপর্যয়—পর পর চিত্রগুলি এক মহৎ ভয়ের রোমাঞ্চিত অনুভূতি মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখে।

'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বের শুরুতে রচনাভঙ্গি অনেকটা প্রথম পর্বের অনুরূপ অর্থাৎ, নিজেকে ছন্নছাড়া বলে শ্রীকান্ত তার মানসভাবনা প্রকাশ করে গেছে। কিন্তু এখানে তার মানসভাবনা রাজলক্ষ্মীকে কেন্দ্র করেই স্বপ্ন ও বেদনার বিচিত্র রাগিণীতে ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে। তবে কিছু পরেই অন্তর্মুখীন মানসচারিতা থেকে বহির্মুখীন ঘটনার অনুসরণেই তার লেখনী নিয়োজিত হয়েছে। তখন থেকে রচনাও এক কৌতুকদীপ্ত, পরিহাসোজ্জ্বল রূপ গ্রহণ করেছে। মাঝে কেবল পিয়ারী বাইজীর গৃহে শ্রীকান্তের অবস্থানের সময়টুকুতে আবেগ-অনুভূতির গাঢ় রঙ এসে মিশেছে। তবে সেখানেও বিদায়ের মুহূর্তটি ছাড়া শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর রঙ্গরসিকতার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত আলাপ-সম্ভাষণই প্রধান হয়ে উঠেছে। রেঙ্গুনযাত্রার শুরু থেকে আরম্ভ করে রেঙ্গুনে পদার্পণের পর ইক্ষুপ্রহরণধারিণী বীরাঙ্গনা বর্মী নারীর বৃত্তান্ত পর্যন্ত গ্রন্থমধ্যে অবিচ্ছিন্ন কৌতুকরসের ধারা প্রবাহিত হয়েছে। জাহাজঘাটে পিলেগ্‌কা ডগ্‌দারির খুঁটিনাটি বর্ণনা, জাহাজে স্থান পাবার জন্য

দিশেহারা যাত্রীদের মরণপণ চেষ্টা এবং তারপর নিশ্চিন্ত যাত্রীদের সেই জাতীয় মহাসঙ্গীত—সেই মহাসঙ্গীতে যোগ দিতে কেউ বাদ যায় নি। এমন কি কাবুলিওয়ালাও না। শরৎচন্দ্রের টিপ্পনীযুক্ত সরস বর্ণনাধারা কৌতুক-রসে পাঠককে মাতিয়ে তোলে। তারপর সেই নন্দ-মিস্ত্রী ও টগর-বোষ্টমীর বিশ বছরের ঘরকন্নার কিছু লোমহর্ষণ দৃশ্য। প্রচন্ড ঝগড়া এবং প্রচন্ডতর মারামারির পরেও কিভাবে আবার পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপড়া করে এক সঙ্গে বাস করা যায় তার অদ্ভুত দৃষ্টান্ত! কৌতুকজনক টাইপ চরিত্র হিসাবে নন্দ-মিস্ত্রী এবং বিশেষ করে টগর-বোষ্টমী অবিস্মরণীয়। জাহাজের সেকেন্ড অফিসার ও লাথি খাওয়া খালাসীদের ঘটনাটি বর্ণনার সময় শরৎচন্দ্রের কৌতুকপ্রসন্ন দৃষ্টি ক্ষোভে ও অপমানবোধে বিরস হয়ে পড়েছে। রেঙ্গুনে পদার্পণের পর ব্রহ্মদেশীয় মেয়েদের শোভন সাজসজ্জা ও স্বচ্ছন্দ চলাফেরা দেখে বিমুগ্ধ শ্রীকান্ত যখন প্রশংসায় পঞ্চমুখ তখনই সেই মোহিনী মেয়েদের পুরুষ-দলনী মূর্তি দেখে তার বিমুগ্ধ দৃষ্টি একটু বিহ্বল হয়ে পড়ল বটে। এর পর রেঙ্গুন প্রবাসের যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে রেঙ্গুনের সমাজ-চিত্র, প্লেগের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা ও অভয়াকে অবলম্বনে সতীধর্ম ও নারী-ধর্মের বিরোধ ও নারীর আত্মাধিকার লাভের দাবী—এ-সমস্ত বিষয় এসে পড়েছে। তেরো পরিচ্ছেদ থেকে শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর দেনাপাওনার অংশ তর্ক ও তত্ত্বভারমুক্ত কোমল ও বেদনাময় অনুভূতির স্পর্শে আর্দ্র ও মধুর। এখানে জটিল ও পরস্পরবিরোধী মানসিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াগুলির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ রয়েছে। মানসিক বৃত্তিগুলির দুর্জ্ঞেয় ও অভাবিত প্রকাশলীলার বিশ্লেষণেই শরৎচন্দ্রের লেখনীর যাদু ধরা পড়েছে। সেই যাদুস্পর্শে কাহিনীর এই শেষ অংশ একান্ত উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বে রাজলক্ষ্মীর পাশে আর একটি নারীচরিত্র অনেক-খানি গুরুত্ব লাভ করেছে। সে হল অভয়া। ঘটনার দিক থেকে বিচার করলে অভয়া বোধ হয় রাজলক্ষ্মীর চেয়েও অধিকতর স্থান জুড়ে রয়েছে। তবুও সে এ-পর্বের নায়িকা নয়, সহ-নায়িকা মাত্র; নায়িকা হল রাজলক্ষ্মী। অভয়া শ্রীকান্তকে ভাবিয়েছে, তার মনে বিতর্কিত সমাজচিন্তা জাগিয়ে তুলেছে কিন্তু অভয়ার প্রতি শ্রীকান্তের স্নেহ ও সহানুভূতি সত্ত্বেও অভয়ার জীবনের সঙ্গে শ্রীকান্তের অন্তর্জীবনের কোনো নিবিড় যোগ নেই। অভয়া সম্পর্কে শ্রীকান্ত শুধু দ্রষ্টা ও ব্যাখ্যাতা মাত্র, অভয়ার কাছ থেকে তার নিরপেক্ষ দূরত্ব সব সময়েই বজায় রয়েছে। দ্বিতীয়ত, অভয়াকে আমরা শুধুমাত্র বাইরের দিক থেকেই দেখলাম। কিরণময়ীর মত তাকেও সমাজবিদ্রোহিণীরূপেই দেখলাম, কিন্তু কিরণময়ীর অন্তরে যে দহনজ্বালা ও প্রেমের হোমবহ্নিশিখা দেখেছি সে-সব অভয়ার মধ্যে কিছুই দেখা যায় নি। রোহিণীকে অভয়া

ভালোবেসেছে, হৃদয়ের সব কিছু দিয়ে ভালোবেসেছ, এ-কথা আমরা শুধু শুনেছি, কিন্তু এ-ভালোবাসার কোনো রূপ আমরা দেখলাম না। অভয়া-রোহিণীর ভালোবাসা শুধু নেপথ্যেই ঘটে গেল, তার মান-অভিমানজড়িত, অশ্রুবেদনাসিক্ত লীলা আমরা দেখতে পেলাম না। সে জন্য অভয়া লাঞ্ছিত নারীজীবনের সমস্যা সম্পর্কে আমাদের সচেতন ও সহানুভূতিশীল করে তোলে, কিন্তু আমাদের অন্তরে আনন্দবেদনামিশ্রিত কোনো স্থায়ী রস সৃষ্টি করতে পারে না।

শরৎচন্দ্রের যে লেখনী অন্নদাদিদিকে সৃষ্টি করেছিল তাই আবার অভয়াকে জন্ম দিয়েছে। অন্নদা পাষণ্ড স্বামীকেই অবলম্বন করেছিল, পাতিব্রত্যের আদর্শের কাছে যে আর সব বিবেচনা পরিহার করেছিল, কিন্তু পাতিব্রত্যের এই আদর্শের বিরুদ্ধে অভয়া বিদ্রোহ করেছে। সে বলেছে, 'একটা রাত্রির বিবাহ-অনুষ্ঠান যা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কাছেই স্বপ্নের মতো মিথ্যে হয়ে গেছে, তাকে জোর করে সারা জীবন সত্য বলে খাড়া রাখবার জন্যে এই এত বড় ভালবাসাটা একেবারে ব্যর্থ করে দেব? যে বিধাতা ভালোবাসা দিয়েছেন, তিনি কি তাতেই খুশি হবেন?' নারীর সতীত্ব তার পক্ষে সব অবস্থায় অত্যাজ্য ধর্ম কিনা এ-প্রশ্ন শরৎচন্দ্র অভয়া-চরিত্রের মধ্য দিয়ে উত্থাপন করেছেন। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব যে সতীত্বের চেয়ে বড় এ-দুঃসাহসিক মন্তব্য শরৎচন্দ্র বিভিন্ন স্থানে করেছেন। তিনি এক জায়গায় বলেছেন, 'পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়। এই কথাটা একদিন আমি বলেছিলাম।...সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়। পূর্বেও ছিল না পরেও হয়ত একদিন থাকবে না। একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, এ-কথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায় ত এ-সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়?' ('সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি')। অভয়া যেদিন শ্রীকান্তের কাছে নরপিশাচ স্বামীর বিরুদ্ধে তার জ্বালাময় অভিযোগ জানিয়েছে এবং রোহিণীদার প্রতি তার অকপট ভালোবাসা অকুণ্ঠিতভাবে ব্যক্ত করেছে, তার আগে বহুদিন ধরে হয়তো সে মনের মধ্যে এক তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের জ্বালায় দগ্ধ হয়েছে। সে-অন্তর্দ্বন্দ্বের বর্ণনা আমরা গ্রন্থমধ্যে পাই নি, কিন্তু তা অনুমান করে নিতে আমাদের কষ্ট হয় না। সে দেশে থাকতে রোহিণীদাকে ভালোবেসেছিল, কিন্তু তখন বিবাহিতা নারীর সংস্কারও একেবারে বর্জন করতে পারে নি। রোহিণীদাকে নিয়ে স্বামীর সন্ধানে সে ব্রহ্মদেশে এসেছিল। এ-সন্ধানে বোধ হয় তার কর্তব্যবোধের তাগিদ ছিল, হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল বলে মনে হয় না। শ্রীকান্তের সহায়তায় তার স্বামীর সন্ধান পেয়ে সেই কর্তব্যবোধের অসুখকর তাগিদেই সে স্বামীর কাছে গিয়েছিল। পাষণ্ড স্বামীর কাছে নির্দয় অত্যাচার লাভ করে সে যখন ফিরে এল তখন আর তার মনে কোনো দ্বিধা ও সংস্কারের বাধা নেই। তার হৃদয়ে দীর্ঘ দিন

লালিত গোপন ভালোবাসা অকাট্য যুক্তির বর্মে সুরক্ষিত ও প্রকাশ্য স্বীকৃতির আলোকে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। শ্রীকান্তকে সে বলেছে, 'রোহিণীবাবুকে ত আপনি দেখে গেছেন? তার ভালবাসা ত আপনার অগোচর নেই, এমন লোকের সমস্ত জীবনটাকে পঙ্গু করে দিয়ে আর আমি সতী নাম কিনতে চাইনে শ্রীকান্তবাবু!' একনিষ্ঠ প্রেম যে অর্থহীন, অপমানকর সতীত্ব অপেক্ষা অনেক বড়,—অভয়ার মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র সেই মতবাদই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। অভয়ার সঙ্গে কথোপকথনে শ্রীকান্ত যেন নিজেকে প্রতিপক্ষরূপে খাড়া করতে চেয়েছে, কিন্তু আসলে একটু খোঁচা দিয়ে অভয়ার মুখ থেকে এক লাঞ্ছিতা নারীর অকপট স্বীকারোক্তি ও অগ্নিময়ী বিদ্রোহ-বাণীই শুনতে চেয়েছে। অভয়ার কথাগুলি যে বিদ্রোহী শরৎচন্দ্রেরই কথা সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের শেষে শ্রীকান্ত যখন রাজলক্ষ্মীর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে তখন রাজলক্ষ্মীর মধ্যে বঙ্কুর মা-ই বড় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের গোড়ায় যখন তাকে দেখলাম, তখন বঙ্কুর মা আর নেই। তার মধ্যে আবার ফিরে এসেছে পিয়ারী বাইজী। রাজলক্ষ্মী 'শ্রীকান্ত'-এর পর্বের পর পর্বে বিচিত্র নারীরূপে প্রকাশমানা—সে কখনো পিয়ারী বাইজী, কখনো শ্রীকান্তের প্রণয়িনী মানসলক্ষ্মী, কখনো গৌরবময়ী বঙ্কুর মা, কখনো বিধবা ব্রহ্মচারিণী। সে যেন তার চারপাশে এক অমোচ্য রহস্যজাল বিস্তার করে রেখেছে. সেই রহস্যজাল ভেদ করে যখন সে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হচ্ছে তখন তাকে তাকে নব নব রূপে দেখছি। তাই তার সম্বন্ধে আমাদের জানার শেষ নেই। কৌতূহলের বিরাম নেই। শ্রীকান্ত যখন পাটনায় তার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হল তখন সে যথার্থই বাইজী, জমকালো ও বর্ণাঢ্য পরিবেশে সে তার মধুকণ্ঠ থেকে সঙ্গীতসুধা ঢেলে চলেছে আর মুগ্ধ ভ্রমরের দল সেই সুধা-আস্বাদে মগ্ন হয়ে রয়েছে। কিন্তু শ্রীকান্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পট-পরিবর্তন হয়ে গেল। সেই বহুবাঞ্ছিতা মক্ষিরাণী হঠাৎ যেন তপস্যারতা পার্বতীর মতো 'ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতম্' হয়ে পড়ল,—একনিষ্ঠ প্রেমের অকপট নিষ্ঠা ও অপরিমেয় ব্যাকুলতা কূলভাঙ্গা নদীর জলোচ্ছ্বাসের মতোই শ্রীকান্তের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। একদিন যে শ্রীকান্তকে স্বেচ্ছায় বিদায় দিয়েছিল সেই আবার শ্রীকান্তের দূরে প্রবাসে যাবার সময় করুণ কান্নাভরা মিনতি জানিয়ে তাকে ধরে রাখতে চাইল। শ্রীকান্ত যখন ব্রহ্মদেশ থেকে ফিরে এল তখন রাজলক্ষ্মীকে আমরা কিছুটা রূপান্তরিত মূর্তিতে দেখলাম। প্রণয়ের সেই প্রবল উচ্ছ্বাস আর নেই, তার সংযত ও পরিণত যৌবন যেন মাতৃত্বের আস্বাদের জন্য লালায়িত। বঙ্কুর মা হয়ে থাকার মধ্যে আর তার মাতৃত্বের ক্ষুধা পরিতৃপ্ত হতে চায় না, নিজ অঙ্গের মধ্যে সন্তান ধারণের সেই শাশ্বত জৈব কামনা,

রক্তের প্রতি বিন্দুর মধ্যে, শিরা-উপশিরার প্রতিটি স্পন্দনের মধ্যে এক স্বপ্নময় পুলক-আবেশ—তারই জন্য তার সমগ্র সত্তা অধীর হয়ে উঠল। সকল শিশুর মধ্যে সে নিজের কল্পিত সন্তানকেই দেখতে পেল, দরিদ্র কেরানীর মেয়েটির জন্য তার নবজাত অনিঃশেষ সন্তানস্নেহের ধারাই যেন বর্ষিত হল। সে তার সব ধনসম্পদ বিলিয়ে দিয়ে সর্বরিক্ততার মধ্যে মাতৃত্বের মহৈশ্বর্য লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। কিন্তু শ্রীকান্ত তার সম্ভ্রম ত্যাগ করে রাজলক্ষ্মীকে স্ত্রীর সম্মান দিতে প্রস্তুত ছিল না। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের সঙ্গে পশ্চিমে বেড়াতে যেতে চাইল, দুর্নামের ভয়ে শ্রীকান্ত সে-প্রস্তাবেও সাড়া দিতে পারল না। তার সীমাহীন প্রেমের উচ্ছ্বাস শ্রীকান্তের পুনঃ পুনঃ নিষেধের পাষাণপ্রাচীরে প্রতিহত হয়ে ব্যর্থ অভিমানে তার বাইজী জীবনের ক্ষণিক উত্তেজনার মধ্যে পলায়ন করতে চাইল। নিজেকে ভুলিয়ে রাখার এ এক নিষ্ফল চেষ্টা মাত্র। বাইজী জীবনে ফিরে যাওয়া এই সর্বত্যাগিনী প্রণয়িনীর পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। শ্রীকান্তের বিদায়-মুহূর্তে সে বিগলিত অশ্রুধারার সঙ্গে একনিষ্ঠ প্রেমের তেজ মিশিয়ে বলেছিল, 'কিন্তু তুমি আমাকে যাই ভাবো না কেন, আমার চেয়ে আপনার লোক তোমার আর নেই। সেই আমাকেই ত্যাগ করে যাওয়া দশের চক্ষে ধর্ম, এ-কথা আমি কখনো মানবো না।' শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে উপেক্ষা করে চলে গেলেও গ্রামের বাড়িতে অসুস্থ ও নিঃসম্বল হয়ে আবার তারই সাহায্য চেয়ে পত্র দিল। এর পর রাজলক্ষ্মী যখন শ্রীকান্তের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল তখন সে তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল। শ্রীকান্তের কাছে তার সর্বত্যাগী একব্রত প্রেম সাড়া পায় নি, কিন্তু সে বুঝে নিয়েছিল, শ্রীকান্ত ছাড়া তার কোনো গতিও নেই। তাই সর্বরিক্ততার গৌরবে ভূষিত হয়ে সে অসুস্থ শ্রীকান্তের শয্যাপার্শ্বে এসে উপস্থিত হল। পাটনার বিলাসবতী বাইজী, খ্যাতি ও ঐশ্বর্যের আসরে প্রমোদরঙ্গিণী বহুবাঞ্ছিতা পিয়ারী আজ একটি শ্রীহীন, নিরানন্দ পল্লীগ্রামে সহায়সম্বলহীন প্রিয়তমের কাছে এসে তার জীবন সমর্পণ করে দিল। প্রেমের এই অত্যুজ্জ্বল মহত্ত্বের তুলনা কোথায়?

প্রথম পর্বে শ্রীকান্তের মধ্যে যে ভাবুক, দার্শনিক ও কবিকে দেখেছিলাম দ্বিতীয় পর্বে তার রূপান্তর ঘটেছে। দ্বিতীয় পর্বে শ্রীকান্ত চলমান জীবনের দ্রষ্টা, ব্যাখ্যাতা ও সমালোচক। তার অন্তর্জীবনের কোনো গভীরতা এখানে প্রকাশ পায় নি, তার গাঢ় অনুভূতির কোনো রঙ কোথাও লাগে নি। এখানে সমাজজীবনের ভিতরে প্রবেশ করে সে যেন নানা মানুষের ভিড় থেকে কয়েকটি নির্বাচিত দৃশ্যের আলোকচিত্র গ্রহণ করেছে। যাদের সে নির্বাচন করেছে তারা ভগ্ন, বিকৃত, একপেশে ও অতিশয়িত। তাদের সে দেখেছে তার বক্র, কৌতুকদীপ্ত দৃষ্টি দিয়ে। কৌতুকের উপাদান সংগ্রহ করতে করতে সে

অভয়া ও তার রোহিণীদার জীবনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে। তার কৌতুক-তরল মেজাজ সমাজের বিতর্কিত সমস্যায় গম্ভীর ও চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছে। সমাজ সম্পর্কে আত্মগত ভাবনা প্রথম পর্বে আমরা দেখেছি, কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে অন্য চরিত্রের প্রতিবাদমুখর উক্তিতে, বিরোধী মতের সংঘাতে ও ভালো-মন্দের তাত্ত্বিক বিচারে এই ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। নিজস্ব বক্তব্য সে যেন একটু প্রচ্ছন্ন রাখতেই চেয়েছে। বিচিত্রের মধ্য দিয়ে চলার পথে শ্রীকান্তকে আমরা দেখলাম সকলের সম্পর্কে আগ্রহী কিন্তু নিরাসক্ত। মানুষের উপকারে সে এগিয়ে যায়। কিন্তু কোথাও বাঁধা পড়ে না, প্রত্যেকের দুঃখ তাকে বিচলিত করে কিন্তু সুখের সন্ধানে সে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে আচরণে তার চরিত্রের কৃপণ আত্মসর্বস্বতা ও হৃদয়ের কুণ্ঠিত প্রকাশ আমাদের পীড়িত করে। রাজলক্ষ্মীর কাছ থেকে সে শুধু নিয়েছে, কিন্তু দেয় নি কিছুই। আর্থিক প্রয়োজনে বারবার সে রাজলক্ষ্মীর দ্বারস্থ হয়েছে, অসুস্থ হয়ে তার প্রাণঢালা সেবা নিয়েছে। কিন্তু যখনই রাজলক্ষ্মী তার অন্তরের সবটুকু নিঙড়ে উপচার সাজিয়ে তার কাছে তুলে ধরেছে, তখনই সে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তার ছন্নছাড়া জীবনে এতখানি সূক্ষ্ম সম্ভ্রমবোধ এল কোথা থেকে? অপযশের মালা যে সব সময় কণ্ঠে ধারণ করে আছে, দুর্নামের ভয়ে সে এত স্পর্শকাতর কেন? রাজলক্ষ্মীর রূপে, তার হাস্যে, লাস্যে ও বিলোল কটাক্ষে সকলে যৌবনচঞ্চল হয়ে ওঠে, অথচ এই অসামান্য নারীকে অতি নিকটে পেয়েও শ্রীকান্তের চিত্তচাঞ্চল্য কোথাও প্রকাশ পায় না। দূর থেকে যাকে সে স্মৃতিতে, ধ্যানে, কল্পনায় অনুক্ষণ পেতে চেয়েছে, কাছে এসে তার এরূপ অনুত্তাপ, অচঞ্চল ভাব কেন? শ্রীকান্তের প্রকৃতিই এই। সে দূরে অলকাপুরীর দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার বিরহ লালন করবে, কিন্তু অমরাবতীর সম্ভোগে অংশগ্রহণ করতে সে কুণ্ঠিত ও নিরাসক্ত। পুরূরবার মতো সে শুধু অন্বেষণ করবে, প্রাপ্তিতে তার কোনো স্পৃহা নেই। সে চির পলাতক। রাজলক্ষ্মীর প্রেমের নিগড় তাই তাকে বাঁধতে পারে না।

## তৃতীয় পর্ব

'শ্রীকান্ত' (৩য় পর্ব) ১৯২০ ও ১৯২১ সালের 'ভারতবর্ষে' আংশিকভাবে মুদ্রিত হয়েছিল এবং পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৭ সালের ১৮ই এপ্রিল। অর্থাৎ, 'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হবার (২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৮) প্রায় নয় বছর পরে তৃতীয় পর্ব প্রকাশিত হল।

দ্বিতীয় পর্বের শেষে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের সামাজিক ও পারিবারিক

জীবনে এসে প্রবেশ করেছে এবং শ্রীকান্তও রাজলক্ষ্মীকে স্ত্রীরূপে প্রকাশ্য স্বীকৃতি দিয়েছে। মনে হল শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর সম্পর্ক অনুরাগ ও উদাসীনতার বহু টানাপোড়েনের পর, দ্বিধা ও সংশয়ের আঁকাবাঁকা ও অন্ধকার পথ পেরিয়ে যেন এক সমাজবন্ধনের সুনিশ্চিত আশ্রয়ে এসে সুপ্রতিষ্ঠিত হল। শ্রীকান্তের উদ্দেশ্যহীন ভবঘুরে জীবন পরমনির্ভরতায় রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে বাঁধা পড়ল। মনে হল রাজলক্ষ্মীও তার পিয়ারী বাইজীর নৃত্যগীতমুখরিত প্রমোদ আসর থেকে চিরবিদায় নিয়ে কল্যাণকঙ্কণ ধারণ করে যেন গৃহলক্ষ্মীর শান্ত সংসারে প্রবেশ করল। দ্বিতীয় পর্বের এই তৃপ্তিদায়ক পরিণতির সুখ-ঝঙ্কারই তৃতীয় পর্বের শুরুতে অনুরণিত। শ্রীকান্ত তার গ্রাম থেকে বিদায় নেবার সময় যে বেদনা অনুভব করেছে তা ছাপিয়ে নিশ্চিন্ততার এক প্রশান্ত আনন্দ তার অন্তর প্লাবিত করে দিয়েছে। সে রাজলক্ষ্মীকে বলেছে, 'আজ থেকে নিজেকে তোমার হাতে একেবারে সঁপে দিলাম, এর ভালমন্দের ভার এখন সম্পূর্ণ তোমার'। রাজলক্ষ্মীর বহুকাঙ্ক্ষিত প্রিয়তম তারই কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করছে,—ক্ষণকালের জন্য মনে হল সব সমস্যার বুঝি তৃপ্তিজনক সমাধান হয়ে গেল। কিন্তু সত্যিই যে তা হল না তা কিছু পরেই স্পষ্ট হয়ে উঠে।

শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী যদি শান্ত গৃহজীবনের মধ্যে সত্যিই ধরা দিত তা হলে তৃতীয় পর্বের প্রয়োজন হত না। তৃতীয় পর্বের ঘটনাবিস্তারের মধ্য দিয়ে এটাই বোঝা গেল যে, একত্রিত অবস্থান সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে পারিপূর্ণ মিলন ঘটল না। একটা সূক্ষ্ম, দুরতিক্রম্য ব্যবধান দুজনকে পরস্পরের কাছ থেকে আলাদা করে রাখল। যতদিন তারা দূরে ছিল ততদিন তারা তাদের কামনাকে ইন্দ্রধনু রঙে রাঙিয়ে কল্পনার আকাশে বিস্তৃত করে দিয়েছিল। দূরে থাকার ফলে কাছে পাবার আকাঙ্ক্ষা ছিল তীব্র। কিন্তু যখন তারা সত্য সত্যিই কাছে এল তখন তাদের দুজনের মনই যেন দূরে পালাতে চাইল। 'শ্রীকান্তে'র চারটি পর্বের মধ্যে মানবজীবনের এই ট্র্যাজেডিই ব্যক্ত হয়েছে। দূর থেকে যাকে পাবার জন্য নিরন্তর মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে, কাছে এলে তাকেই ভার ও বিড়ম্বনা মনে হয়। ভালোবাসা বন্ধন চায়, আবার বন্ধন থেকে মুক্তিও চায়, এই সত্যই শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর জীবনে আমরা দেখতে পেয়েছি। যে শ্রীকান্ত রাজলক্ষীর 'পরে তার সমস্ত ভার দিয়ে পরম নিশ্চিন্ত বোধ করেছিল, সেই আবার গঙ্গামাটির পথে যাত্রা করবার সময় ভেবেছিল, 'ইহাকে আমি কোনদিন ভালবাসি নাই। তবু ইহাকেই আমার ভালবাসিতেই হইবে, কোথাও কোন-দিকে বাহির হইবার পথ নাই। পৃথিবীতে এত বড় বিড়ম্বনা কি কখনো কাহারো ভাগ্যে ঘটিয়াছে?'

কুক্ষণে শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী গঙ্গামাটিতে এসেছিল। সেখানে একঘেয়ে,

বৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রার মধ্যে দূরে যাবার কি অন্যত্র পালাবার কোনো উপায় ছিল না, অপ্রশস্ত স্থানে একত্রিত বাসের গ্লানিকর বিড়ম্বনা উভয়কেই যেন ক্লান্ত করে তুলল, সেজন্য দুজনই দুজনের কাছ থেকে পালাতে চাইল। আর একটি কারণও উভয়ের মধ্যে একটি ক্রমবর্ধমান ব্যবধান রচনা করল, তা হল উভয়ের অবস্থার অসমতা। গঙ্গামাটিতে রাজলক্ষ্মী হল বহুবন্দিতা ভূম্যধিকারিণী, আর শ্রীকান্ত তারই সংসারে এক কর্মহীন, কর্তৃত্বহীন আশ্রিত ব্যক্তিমাত্র। শ্রীকান্ত তার গ্লানিকর পরনির্ভরতার জন্য মনে মনে কেবলই পীড়িত হতে লাগল এবং রাজলক্ষ্মীর উপেক্ষা ও উদাসীনতার আঘাত তাকে নীরবে প্রতিকারহীন বেদনার মধ্য দিয়েই সহ্য করতে হচ্ছিল বলে সে যেন আরও ক্লান্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। রাজলক্ষ্মীর দিক দিয়েও বলা যায় যে, শ্রীকান্ত একদিন ছিল পলাতক পথযাত্রী: তাকে বাঁধবার জন্য জয় করবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করতে হয়েছে। আজ শ্রীকান্ত তার কাছেই সমর্পিত, তাকে নিয়ে রাজলক্ষ্মীর কোনো ভাবনা ও উত্তেজনা নেই, সেজন্য উদ্যম ও উত্তেজনার নবতর ক্ষেত্র—ধর্মাচরণের দিকে সে এতখানি ঝুঁকে পড়েছে। পথের নেশায় চির চঞ্চল শ্রীকান্ত ও বহু আলোকময়ী রজনীর উৎসবসহচরী রাজলক্ষ্মী একত্রিত বাসের গ্লানিতে হাঁপিয়ে উঠেছে। জানি না নিভৃত রাত্রির কোনো তন্দ্রালস মুহূর্তে তাদের বিপরীতমুখী মন পরস্পরের উষ্ণ সান্নিধ্যের জন্য উন্মুখ হয়েছিল কিনা। কিন্তু ভোর হলেই দেখা যেত রাজলক্ষ্মী তার ধর্মসঙ্গিনী সুনন্দার সঙ্গে ধর্মাচরণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে আর শ্রীকান্ত তার নিঃসঙ্গ মনের ক্লান্তি নিয়ে প্রাণহীন, ধূসর মাটির বিজনপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফলে দুজনের মধ্যে দূরত্ব বেড়েই চলল এবং দুজনেই কোনো উত্তপ্ত মান-অভিমানের মধ্য দিয়ে বোঝাপড়ায় আসতে নিতান্তই নিস্পৃহ, তাই দূরত্ব আর ঘুচল না। রাজলক্ষ্মীর ধর্মের মাদকতার কাছে প্রেমের মত্ততা তুচ্ছ হয়ে গেল, এবং কর্মহীন নিঃসঙ্গ শ্রীকান্ত আত্মচিন্তা ও আর্তসেবায় তার অপ্রয়োজনীয় জীবনের লজ্জাকর গ্লানি কিছুটা ভুলে থাকার সুযোগ পেল। হীন পরবশ্যতার বিড়ম্বনা থেকে মুক্ত হবার জন্যই সে ব্রহ্মদেশের কর্মস্থলের বড়সাহেবের কাছে পুনর্নিয়োগের জন্য আবেদন করেছে এবং তার সেই আবেদন মঞ্জুরও হয়েছে। গঙ্গামাটি থেকে বিদায় নেবার পরও শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর ভিতরকার ব্যবধান দূর হল না। শ্রীকান্ত গেল কলকাতায় আর রাজলক্ষ্মী রওনা হল পাটনার দিকে। শ্রীকান্ত দূর বিদেশ-যাত্রার আগে রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য কাশী গেল, কিন্তু সেখানেও পুরোনো দিনের হৃদয়ের রক্তরাগমিশ্রিত কোনো রাগিণী বাজল না, বিরস সাক্ষাৎকারে শুধু কেবল কয়েকটি বেসুরো আওয়াজ উঠল মাত্র। দ্বিতীয় পর্বে বিদায় নেবার সময় রাজলক্ষ্মীর অবিরল চোখের জলে শ্রীকান্তের যাত্রাপথ ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল, আর আলোচ্য পর্বে

রাজলক্ষ্মীর উদাসীন চিত্তের নিরুত্তাপ বিদায়-সম্ভাষণ শ্রীকান্তের স্পর্শকাতর হৃদয়ের নীরব বেদনার উৎস উন্মুক্ত করে দিল। শ্রীকান্তের এই বেদনা ধর্মমোহান্ধ রাজলক্ষ্মীর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নি, কিন্তু ভৃত্য রতনের সহানুভূতিশীল দৃষ্টিতে তা ধরা পড়েছিল।

'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্বের অধিকাংশ ঘটনা ঘটেছে বীরভূমের গঙ্গামাটি গ্রামে। শরৎচন্দ্রের পল্লীকেন্দ্রিক গল্প-উপন্যাসের পটভূমি হল প্রধানত হুগলী-হাওড়ার গ্রামাঞ্চল, কিন্তু এই উপন্যাসে তিনি বাংলার একটি ভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও মানবিক পটভূমি গ্রহণ করেছেন। তারাশঙ্করের বেশির ভাগ গল্প-উপন্যাসে যে অঞ্চল জীবন্ত হয়ে উঠেছে, শরৎচন্দ্রও আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে সেই অঞ্চলটি চিত্রিত করেছেন। এই অঞ্চলের মাটি কোথাও লাল, কোথাও বা সূর্যদাহে কালো, দিগন্তবিস্তীর্ণ জলহীন, শস্যহীন মাঠে এক বিশুষ্ক, বিবর্ণ রুক্ষতা, চতুর্দিকের ধূসর শূন্যতার মধ্যে যেন রিক্ত ভৈরবের তাণ্ডবক্ষেত্র। গ্রামের মানুষগুলিও গ্রামের মাটির মতই যেন শ্রীহীন, ব্রাত্য ও বর্জিত। তারা বারুই-ডোম প্রভৃতি অস্পৃশ্য শ্রেণীভুক্ত। তারা তাদেব মাটি-মায়ের মতই বিরস, মলিন ও উলঙ্গ, সেই মায়ের মতই তাদের বুকে অসহ্য জ্বালা কিন্তু মুখে এক চির করুণ নীরবতা। এদের ক্ষেতখামার নেই, খাদ্য নেই, পানীয় জল নেই, ঘরের চালে খড় পর্যন্ত নেই। সকলের অভিশাপ নিয়ে, সকলের ঘৃণা কুড়িয়ে সমাজের একপ্রান্তে নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে এরা জীবনযাপন করে। এদের সমাজের আর একটি দিক মধু ডোমের মেয়ে মালতীকে কেন্দ্র করে প্রকাশ পেয়েছে। আদিম প্রবৃত্তির খেয়ালী রূপ, শৃঙ্খল ছেঁড়া কামনার অসংযত গতিবিধি, প্রেম ও ঘৃণার আশ্চর্য সহ-অবস্থান, অশান্ত ও অসামাজিক জীবনের মদিরা পানের জন্য এক অদম্য লালসা—এ -বৈশিষ্ট্যগুলিও এই সমাজের মধ্যে কতখানি সত্য শরৎচন্দ্র তা নিখুঁত বাস্তববাদী দৃষ্টি নিয়ে আলোচ্য উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। ডোম-ডোমনী সমাজের আচার-ব্যবহার, বিবাহপ্রথা ও সামাজিক বিধিনিষেধের খুঁটিনাটি বিবরণও শরৎচন্দ্র কোথাও কৌতুক এবং কোথাও বা করুণরসে নিষিক্ত তুলিকায় অঙ্কন করেছেন।

আলোচ্য উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবনারও কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। 'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্ব যখন লেখা শুরু করেছিলেন, তখন শরৎচন্দ্র বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি দেশনেতার সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। স্বাভাবিক কারণেই নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শ তিনি এই উপন্যাসে প্রকাশ করেছেন। এ-রাজনৈতিক আদর্শ দেশের মুক্তি বলতে দরিদ্র, নিরন্ন, রোগাক্রান্ত গ্রাম্য লোকেদের মুক্তিই বুঝেছে, আর দেশ-

সেবা বলতে সহায়সম্বলহীন আর্ত জনগণের সেবাই মনে করেছে। তাঁর এই আদর্শ মূর্ত হয়ে উঠেছে বজ্রানন্দের মধ্য দিয়ে। স্বামী বিবেকানন্দের মানব-সেবাধর্ম বজ্রানন্দও গ্রহণ করেছে। তবে সেই মানবসেবাধর্মের সঙ্গে স্বদেশ-মুক্তির আদর্শও যুক্ত হয়ে আছে। বজ্রানন্দ জানে মাতৃভূমির এই দারিদ্র্য ও দুর্গতির মূলে রয়েছে বিদেশী শোষণ। তার মুখেই প্রকাশ পেয়েছে, 'এই সোনার মাটি কেমন করিয়া ধীরে ধীরে এমন শুষ্ক এমন রিক্ত হইয়া উঠিল, কেমন করিয়া দেশের সমস্ত সম্পদ বিদেশীর হাত দিয়া ধীরে ধীরে বিদেশে চলিয়া গেল, কেমন করিয়া মাতৃভূমির সমস্ত মেদ-মজ্জা-রক্ত বিদেশীরা শোষণ করিয়া লইল, চোখের উপব ইহার জ্বলন্ত ইতিহাস ছেলেটি যেন একটি একটি করিয়া উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইতে লাগিল।' অর্থাৎ মূল সমস্যাটি হল অর্থনৈতিক। এই অর্থনৈতিক শোষণের একটি ভয়াবহ রূপ ফুটে উঠেছে মাটিকাটা কুলিদের জীবনযাত্রা বর্ণনার মধ্যে। মুমূর্ষু বন্ধু সতীশ ভরদ্বাজের সেবা করতে এসে শ্রীকান্ত দেখতে পেল ধনলোভী মানুষের বিকৃত লোভ উপায়হীন শ্রমিক শ্রেণীকে কিরূপে পশুর স্তরে নিক্ষেপ করেছে।

'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বে শ্রীকান্তের দৃষ্টি ছিল অনেকটা বস্তুময়। সেখানে চলমান জগতের ঘটনা ও চরিত্রই মুখ্য। কিন্তু তৃতীয় পর্বে শ্রীকান্তের দৃষ্টি প্রথম পর্বের মতোই আত্মময়। এখানে তাঁর অনুভূতির রঙে প্রকৃতি ও মানুষ রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ, প্রথম পর্বের রচনাভঙ্গি যেন তৃতীয় পর্বে অনেকখানি ফিরে এসেছে। তৃতীয় পর্বে রাজলক্ষ্মীর সান্নিধ্যে থাকা সত্ত্বেও শ্রীকান্ত অবসন্ন একাকিত্বের মধ্যেই তার সময় কাটিয়েছে। প্রথম পর্বে নব-যৌবনের অ্যাডভেঞ্চারের নেশা তাকে চঞ্চল করে রেখেছিল, রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে সদ্য পরিচয়ের ফলে তার হৃদয়তন্ত্রীতে অশ্রুত রাগিণীর ঝঙ্কার শুরু হয়েছে, অজানা পথের রহস্য-সন্ধানে সে অবিরাম পথে চলেছে। সেজন্য প্রথম পর্বের রচনায় আশঙ্কাকণ্টকিত ঘটনার সমারোহ, স্তরে স্তরে সৌন্দর্যের নয়নাভিরাম লীলা, সৃষ্টির মৌলিক রহস্যের গভীরে অনুসন্ধান। কিন্তু তৃতীয় পর্বের সর্বত্র যেন পরিণত যৌবনের ক্লান্ত ছায়া গোধূলির ঘনায়মান অন্ধকারের মতোই ছড়িয়ে আছে। নিরালম্ব ভালোবাসার নিভৃত ক্রন্দন শ্রীকান্তের সকল বাক্য ও বর্ণনার মধ্যে ঝঙ্কৃত। তার নিঃসঙ্গ মনের সজল স্পর্শে বাহ্য জগতের সব বস্তুই যেন স্নিগ্ধ ও মেদুর। তৃতীয় পর্বের প্রকৃতির মধ্যে অনাবিষ্কৃত রহস্য ও অতলান্ত কোনো সৌন্দর্যের পরিচয় পাওয়া যায় নি। কিন্তু তার একটা ক্লান্ত-করুণ রূপই ফুটে উঠেছে। একটি চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে,— 'অদূরবর্তী কয়েকটা খর্বাকৃতি বাবলা গাছে বসিয়া ঘুঘু ডাকিত, এবং তাহারি সঙ্গে মিলিয়া মাঠের তপ্ত বাতাসে কাছাকাছি ডোমেদের কোন্ একটা বাঁশ ঝাড় এমনি একটা একটানা ব্যথাভরা দীর্ঘশ্বাসের মতো শব্দ করিতে থাকিত

যে, মাঝে মাঝে ভুল হইত, সে বুঝি বা আমার নিজের বুকের ভিতর হইতেই উঠিতেছে!' এখানে শ্রীকান্তের মন ও বহিঃপ্রকৃতি যেন একাত্ম। তার গোপন বেদনা ও অবরুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস যেন প্রকৃতির মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্ব অন্যান্য পর্বের মত সরস ও আকর্ষণীয় নয়। তার কারণ এই পর্বে শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর পারস্পরিক অনুরাগের কোনো রক্তরাগ স্পর্শ নেই। পরস্পরকে পাবার, পরস্পরের কাছে ধরা দেবার কোনো ব্যাকুলতা এখানে নেই, কোনো মান-অভিমান, হৃদয়ের কোনো উত্তপ্ত জ্বালা-যন্ত্রণাও নেই। সেজন্য পাঠকের রসলিপ্সু চিত্ত এখানে বিরস ও অতৃপ্তই থেকে যায়। অন্যান্য পর্বের মতোই এই পর্বেও কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা শ্রীকান্তের মনের সূত্রে গেঁথে উপস্থাপিত করা হয়েছে। মধু ডোমের মেয়ে মালতী, সতীশ ভরদ্বাজ, চক্রবর্তী ও চক্রবর্তী-গৃহিণী প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে কতকগুলি ঘটনা-বৃত্ত রচনা করা হয়েছে। ঘটনাগুলির মধ্য দিয়ে অজ্ঞাত সমাজ-স্তরের এক-একটি দিক যেমন উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তেমনি বিরোধী ভাবের সমাবেশে এক-একটি জটিল মানব-চরিত্রও উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে। এ-সব ঘটনা ও চরিত্র-চিত্রণে লেখকের দৃষ্টি কখনো কৌতুকে দীপ্ত, কখনো বা কারুণ্যে ঈষৎ সিক্ত। এরা শ্রীকান্তের বিষণ্ন মনকে কোথাও একটু হাল্কা করেছে, কোথাও বা সমাজ-ভাবনায় উদ্দীপ্ত করেছে। আলোচ্য পর্বের কাহিনীতে অনেকখানি জুড়ে রয়েছে বজ্রানন্দ ও সুনন্দা। বজ্রানন্দ বন্ধনমুক্ত, সেবাব্রত সন্ন্যাসী। তার আদর্শের মহত্ত্ব ও কাজের দায়িত্ব তার হাস্যপরিহাস ও ভোজন-রসিকতার মধ্য দিয়ে সহজ ও ভারহীন হয়ে যায়। তার উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ও সরস বাক্যালাপ পার্শ্ববর্তী সকলের মনে প্রসন্নতার দীপ্তি ছড়িয়ে দেয়। তার দেশসেবার আদর্শ শ্রীকান্তের মনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। সুনন্দা সম্পর্কে শ্রীকান্ত বলেছে যে, সুনন্দা তার মনের উপর গভীর রেখাপাত করেছে। সুনন্দার সংগে শ্রীকান্তের সাক্ষাৎ খুব কমই হয়েছে, কিভাবে তার মনে সুনন্দা অতখানি রেখাপাত করল তা অবশ্য বোঝা গেল না। সুনন্দার জন্যই রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে, সেজন্য সুনন্দা সম্পর্কে তার মনে চাপা ক্ষোভ থাকাই তো স্বাভাবিক। তবে সুনন্দার আপসহীন ন্যায়বোধ ও সুকঠিন মনুষ্যত্ববোধ শ্রীকান্তের মনে নিশ্চয়ই সপ্রশংস শ্রদ্ধার উদ্রেক করে-ছিল। সুনন্দা ইস্পাতফলার মতো ঋজু ও ধারালো বটে, কিন্তু তার মধ্যে হৃদয়ের সুকোমল অনুভূতি, স্নেহ-ভালোবাসার কোনো বেদনাকরুণ স্পর্শ আমরা দেখতে পাই নি। বরং অন্যায়কারী পল্লী কুশারীগৃহিণীর বেদনাবিদ্ধ অন্তরের স্নেহাসক্ত অনুযোগ-বাক্যগুলির জন্য তাঁকে অনেক বেশি স্বাভাবিক ও মানবীয় মনে হয়।

লেখকের কৌতুকরস সৃষ্টির আর একটি পাত্র হল রতন। রতন প্রভুর

ও দ্বিতীয় পর্ব অপেক্ষা এখানে অনেক বেশি বিকশিত। অন্যান্য পর্বে রাজলক্ষ্মীর সার্বক্ষণিক আজ্ঞানুবর্তিতার জন্য রতন-চরিত্রের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে নি। কিন্তু এখানে ধর্মপথচারিণী রাজলক্ষ্মীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শ্রীকান্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর হবার সুযোগ সে পেয়েছে। শ্রীকান্তের নিঃসঙ্গ চিত্তের নিভৃত বেদনা সে হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছে। এজন্য সে মনে মনে রাজলক্ষ্মীর প্রতি বিরক্ত ও শ্রীকান্তের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েছে। তবে রতন-চরিত্রটি যখন শ্রীকান্ত পর্যবেক্ষণ করেছে তখন সে তার মধ্যে কৌতুকের উপাদানই সন্ধান করেছে। তার শহুরে মনোভাব, গ্রামের প্রতি নিদারুণ বিতৃষ্ণা, নিজেকে উচ্চজাতির অন্তর্ভুক্ত করে নীচজাতীয় লোকেদের প্রতি প্রবল ঘৃণা প্রকাশ, মাতব্বরি করবার দুর্নিবার প্রবণতা. অতিশয় বিজ্ঞের ভাব প্রদর্শন ইত্যাদি দিক শরৎচন্দ্র তাঁর টিপ্পনীরসাল লেখনীর দ্বারা বর্ণনা করে যথেষ্ট কৌতুকরস পরিবেশন করেছেন।

'শ্রীকান্তে'র পর্বগুলির মধ্যে তৃতীয় পর্বেই শ্রীকান্তের প্রতি রাজলক্ষ্মীর নিস্পৃহ উদাসীনতা সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পেয়েছে। এর আগেও সে শ্রীকান্তের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে, কিন্তু তার দূরে সরে যাওয়ার পিছনে ছিল নানা-বিধ মানসিক সংস্কার, অথচ সেই সংস্কারের সঙ্গে তার দুর্বশ প্রেমের দ্বন্দ্ব সর্বক্ষণ তার চিত্তকে দ্বিধাবিভক্ত করে রাখত। কিন্তু তৃতীয় পর্বে ধর্মাচরণের এক নূতন ধরনের মাদকতা শ্রীকান্তের কাছ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দিল। এই মাদকতা এত তীব্র যে এতে তার মন ও হৃদয় সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হয়ে গেল, প্রেম ও ধর্মনিষ্ঠার দ্বন্দ্বের স্থান আর রইল না। রাজলক্ষ্মী সব ছেড়ে দিয়ে শ্রীকান্তের গ্রামের বাড়িতে এসে নিজেকে নিঃশেষ নিবেদন করে দিয়েছিল। তখনও বুঝতে পারা যায় নি, যে শ্রীকান্তের জন্য সে সব কিছু ছাড়ল, সেই শ্রীকান্তকে ছাড়িয়েও সে আর কিছু পাবার জন্য কামনা করতে পারে। মানুষের চাওয়া কখনও শেষ হয়ে যায় না, চাওয়ার বস্তু পেলেই আরো কিছুর জন্য তার মন আকুল হয়ে ওঠে। শ্রীকান্তকে কাছে পেয়ে সেই আরো কিছুর জন্য রাজলক্ষ্মী তৃষিত হয়ে পড়ল। দ্বিতীয় পর্ব পর্যন্ত শ্রীকান্ত বাঁধন এড়াতেই চেয়েছে, আর রাজলক্ষ্মী শুধু কেবল বাঁধন দিয়ে তাকে ধরতেই চেষ্টা করেছে। কিন্তু তৃতীয় পর্বে এর বিপরীত দেখি। এখানে রাজলক্ষ্মীই কেবল বাঁধন আলগা করতেই চেয়েছে, আর শ্রীকান্ত শুধু ডানাভাঙ্গা পাখীর মতোই সংকীর্ণ মাটির সীমায় পড়ে ছটফট করেছে। তবে রাজলক্ষ্মীর মোহমুক্তি যেন অতি দ্রুত ঘটেছে, শ্রীকান্তকে নিয়ে ঘর করার আগেই শ্রীকান্ত সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েছে। শ্রীকান্তের কাছ থেকে রাজলক্ষ্মীর মন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার জন্য প্রধানত দায়ী দুটি চরিত্র,—বজ্রানন্দ ও সুনন্দা। বজ্রানন্দের জন্য রাজলক্ষ্মীর ভাগিনী-সত্তা উদ্বেলিত। এই নবলব্ধ ভ্রাতাটির জন্য স্নেহ-যত্ন-

উদ্বেগ এত বেশি পরিমাণে উপচে পড়েছে, যে বেচারা শ্রীকান্ত তো প্রায় অনাদর-উপেক্ষার স্তরেই নির্বাসিত হয়ে পড়েছে। অবশ্য শ্রীকান্ত তার কুণ্ঠিত মন নিয়ে ভ্রাতা-ভগিনীর স্নেহলীলার মধ্যে মাঝে মাঝে দর্শকের মতো প্রবেশ করেছে। সুনন্দার প্রতি রাজলক্ষ্মীর আকর্ষণ আরো তীব্র। সুনন্দা জপ-তপ, ব্রত-অনুষ্ঠানের কি কি গূঢ় রহস্য রাজলক্ষ্মীকে শিক্ষা দিয়েছিল জানি না। কিন্তু তার আকর্ষণে রাজলক্ষ্মী তার ঘরসংসার, দায়িত্ব-কর্তব্য এবং শ্রীকান্তের প্রতি ভালোবাসার আনুগত্য সব কিছুই ভুলে গেল। শ্রীকান্তের সঙ্গ আর তার কাম্য নয়, শ্রীকান্তের খাওয়া-দাওয়ার প্রতি আর তার সযত্ন দৃষ্টি নেই। এই পর্বে রাজলক্ষ্মীর কাছ থেকে শ্রীকান্ত দুবার বিদায় নিয়েছে। একবার সাঁইথিয়া স্টেশনে রাজলক্ষ্মী যখন শ্রীকান্তের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। আর একবার রাজলক্ষ্মীর কাশীর বাড়ি থেকে শ্রীকান্ত যখন দূরে প্রবাসযাত্রার আগে বিদায় নিয়েছে। দুবারই অত্যন্ত সহজ ও অবিচলিতভাবে শ্রীকান্তকে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়েছে রাজলক্ষ্মী। এ-যেন প্রণয়ের বৃন্তে ফোটা দুটি ফুলের পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া নয়। বোঝা গেল, সুরে বাঁধা বীণার তারটি ছিঁড়ে গেছে, সেই ছেঁড়া তারটি কিছুতেই যেন আর জোড়া লাগানো যাচ্ছে না।

শ্রীকান্তের মানসিকতা আগেই কিছু বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শ্রীকান্ত বারবার অসুখে পড়েছে এবং অসুখে পড়লে মানুষের যা হয়—আত্মবিশ্বাস কমে যায় এবং পরনির্ভরতা বেড়ে যায়। শ্রীকান্তেরও তাই ঘটেছে। সে ব্রহ্মদেশ থেকে চলে এসেছে, গ্রামের বাড়িতেও থাকতে পারল না, আবার অসুস্থ হয়ে অসহায় হয়ে পড়ল। তাই রাজলক্ষ্মীর উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করা ছাড়া তার আর কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু যখনই সে রাজলক্ষ্মীকে তার জীবনের সব স্বত্ব দান করতে চাইল, তখন সে বুঝতে পারল, দাতার আগ্রহ যতখানি গ্রহীতার আগ্রহ ততখানি নয়। সে আস্তে আস্তে বুঝতে পারল, স্বাধীন শ্রীকান্তের দাম রাজলক্ষ্মীর কাছে যতখানি, পরাধীন শ্রীকান্তের দাম ততখানি নয়। সে ছিল রাজলক্ষ্মীর ভূষণ, এখন হয়ে পড়েছে তার বোঝা। রাজলক্ষ্মী তার অতি নিকটেই আছে, চাকর-বাকরদের উপর তাকে যত্ন করবার নির্দেশ দেয়। মাঝে মাঝে বঙ্কুনন্দের সঙ্গে বসে কিছু বাড়তি লুচিমিষ্টির অংশও পায়, এমন কি কখনো কখনো রাজলক্ষ্মী তার শয্যায় এসে পায়ে-টায়ে হাত বুলিয়েও দেয়। তবুও শ্রীকান্ত বুঝতে পারে রাজলক্ষ্মী অনেক দূরে চলে গেছে। আজ সে রাজলক্ষ্মীর প্রেমের পাত্র নয়, করুণার পাত্র। তার সর্বস্বদান রাজলক্ষ্মী গ্রহণ করে নি। এই গ্লানিতে, লজ্জায়, পরিতাপে সে অহরহ পীড়িত হতে থাকল। সে রাজলক্ষ্মীকে ভালোবেসেছিল। এতদিন ধরে ভালোবাসার জয়ের নেশায় সে মত্ত ছিল। কিন্তু এখন সেই ভালোবাসার

পরাজয়ের গ্লানিতে তার হৃদয় এক অপ্রকাশ্য বেদনায় মথিত হতে লাগল। তৃতীয় পর্বে শ্রীকান্তকে আমরা স্বদেশ-হিতকামী ও দরদী সমাজসেবকরূপে দেখতে পেলাম। কিন্তু তার স্বদেশ-হিতাকাঙ্ক্ষা ও সমাজসেবার মধ্যে এক শূন্য হৃদয়ের নিষ্ফল ক্রন্দন মর্মরিত হয়ে উঠেছে।

## চতুর্থ পর্ব

'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্ব ১৩৩৮ সালের ফাল্গুন-চৈত্র ও ১৩৩৯ সালের বৈশাখ-মাঘ সংখ্যায় 'বিচিত্রা'য় প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশের তারিখ হল ১৩ই মার্চ ১৯৩৩। 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বে শ্রীকান্তের বয়স বত্রিশ এবং রাজলক্ষ্মীর বয়স সাতাশ বছর, কিন্তু 'শ্রীকান্তে'র লেখক শরৎচন্দ্রের বয়স তখন সাতান্ন বছর। 'শ্রীকান্ত' আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস, সেজন্য শরৎচন্দ্রের জীবনের ঘটনার সঙ্গে 'শ্রীকান্তে' বর্ণিত অনেক ঘটনার মিল দেখা যায়। তেমনি শরৎচন্দ্রের মানসিকতা ও জীবনভাবনাও শ্রীকান্তের মধ্যে অনেকখানি প্রতি-ফলিত। চতুর্থ পর্বে বর্ণিত ঘটনাস্থল একটি বিশেষ গ্রামাঞ্চল এবং সে-গ্রাম হল শরৎচন্দ্রেরই নিজস্ব গ্রাম দেবানন্দপুর। প্রকৃতপক্ষে, দেবানন্দপুরের গাছ-পালা, পথঘাট, নানা বর্ণ ও গন্ধের ফুলের মেলা, পরিচিত পাখীর সুমিষ্ট স্বর, কোমল মাটির আর্দ্রস্পর্শ, শীর্ণকায়া সরস্বতীর ক্ষীণ প্রবাহ, শরৎচন্দ্রের দেখা বাড়িঘর ও গ্রাম্য লোকজন সব 'শ্রীকান্তে'র মধ্যে স্মৃতির স্পর্শে মধুর এবং মমতার প্রলেপে স্নিগ্ধ হয়ে দেখা দিয়েছে। গ্রন্থের মধ্যে যে গলায় দড়ের বাগানের উল্লেখ রয়েছে সেটি যথার্থই দেবানন্দপুর গ্রামে রয়েছে। দেবানন্দপুরের দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মুন্সী লিখেছেন, '...কাছেই জমিদারবাবুদের যে গলায় দড়ের বাগান, সেই বাগানের ধারে ডোবায় শবের কাঁথা, মাদুর ফেলা হতো। এ জায়গা ছিল তখন খুব ভয়ের জায়গা।' দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মুন্সী আরো লিখেছেন যে, কৃষ্ণপুর গ্রামের রঘুনাথ গোস্বামীর আখড়া-বাড়ীর সঙ্গে মুরারি-পুরের আখড়ার হুবহু মিল রয়েছে। গ্রন্থের মধ্যে যে মজা নদীটির কথা বারবার বলা হয়েছে এবং যার ধারে মুরারিপুরের আখড়া অবস্থিত সেটি নিঃসন্দেহে সরস্বতী নদী। যে রেল স্টেশনটির কথা কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে সম্ভবত সেটি ব্যান্ডেল স্টেশন। চতুর্থ পর্বে শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী উভয়ের মুখেই গ্রামের বাল্য-স্মৃতিচারণ শুনেছি। রাজলক্ষ্মী এক জায়গায় বলেছে, 'এক গুরুমশায়ের পাঠশালায় পড়তুম—দুটিতে যেন ভাই-বোন এমনি ছিল ভাব। পাড়ার সুবাদে দাদা বলে ডাকতুম—বোনের মতো আমাকে কি ভালোই বাসতেন। গায়ে কখনো হাতটি পর্যন্ত দেননি।' দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত

মুন্সীর বিবরণে পাওয়া যায়, 'এই ছেলেটির কনিষ্ঠা ভগিনী—শরৎচন্দ্র যে সময়ে পাঠশালায় পড়িতেন সেই সময়ে—ঐ পাঠশালারই ছাত্রী ছিলেন এবং তখন হইতেই শরৎচন্দ্রের সহিত সর্বদাই সঙ্গিনীর ন্যায় খেলা করিয়া বেড়াইতেন—দুইজনের ভাবও ছিল যত, ঝগড়াও হইত তত। নদীর বা পুকুরের ধারে ছিপ লইয়া মাছ ধরা, ডোঙা বা নৌকা নিয়া নদীবক্ষে বেড়ানো, বৈঁচিফল পাড়িয়া মালা গাঁথা, বাগান থেকে গোপনে ফল সংগ্রহ করা, ঘুড়ির সুতা মাঞ্জা দেওয়া ও ঘুড়ি তৈরী করা, বনজঙ্গলে বেড়ানো প্রভৃতি সকল রকম বালক-সুলভ চাপল্যের কাজে এই মেয়েটিই ছিল শরৎচন্দ্রের সহচারিণী।' শরৎচন্দ্র তাঁর বাল্য ও কৈশোরে কোথায় কোথায় যেতেন, কাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন তা সব জানা তো সম্ভব নয়। হয়তো গহরের মতো কোনো মুসলমান বন্ধু তাঁর ছিল, হয়তো কমললতার মতো কোনো বৈষ্ণবীর স্মৃতি তাঁর মনের পটে উজ্জ্বল ছিল, হয়তো যশোদা বৈষ্ণবীর মতো কেউ তাঁর গ্রামে ছিল। তবে এ কথা সত্য যে, এ-সব চরিত্রের বাস্তব অস্তিত্ব থাকলেও বাস্তবের উপরে অনেক রঙ ফলিয়ে, কল্পনার রমণীয় বর্ণ এবং অনুভূতির গাঢ় রসের সহযোগে সেই বাস্তব চরিত্রকে শিল্পী শিল্পমূর্তিরূপে সৃষ্টি করেছেন।

'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্ব যখন লিখছিলেন তখন শরৎচন্দ্রের জীবনে গোধূলি-লগ্নের পূরবী রাগিণী বাজতে শুরু করেছিল। তর্ক-বিতর্ক, বিরোধ ও বিদ্রোহের প্রখর রৌদ্রজ্বালার পর তিনি ছায়ানিবিড় বিশ্রামের স্থান সন্ধান করছিলেন। 'শেষপ্রশ্ন' পর্যন্ত তাঁর অক্লান্ত যোদ্ধরূপ আমরা দেখেছি। সব্যসাচীর মতো দুই হাতে তিনি সমাজের অন্যায়, অবিচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে শানিত অস্ত্র প্রয়োগ করে চলেছেন। ক্লান্তিহীন, আপসহীন সংগ্রাম চালিয়ে তখন পর্যন্ত তিনি কেবল রাজ্যের পর রাজ্য জয় করে সম্মুখের দিকে অপ্রতিহত বেগে এগিয়ে চলেছেন। কিন্তু 'শেষপ্রশ্নে'র পর সেই অক্লান্ত যোদ্ধা তাঁর যুদ্ধ থামালেন। আর বিরোধ ও বিদ্রোহ নয়, চোখে অগ্নিজ্বালার পরিবর্তে নেমে এল শান্তির স্নিগ্ধ বর্ষণ, কঠোর রেখায়িত মুখ করুণায় কমনীয় হয়ে উঠল এবং আঘাতে উদ্যত হাত আলিঙ্গনের আশায় প্রসারিত হল। যুদ্ধপর্বের পর শুরু হল শান্তিপর্ব। অপরাহ্ণ বেলাকার শেষ আলোয় যে লেখাগুলি প্রকাশ পেল, যথা 'শ্রীকান্ত' (৪র্থ পর্ব), 'বিপ্রদাস', 'শেষের পরিচয়' (আংশিকভাবে) ইত্যাদি—সেগুলির মধ্যেই অসীম স্নেহ, অনন্ত ক্ষমা ও অপার করুণা মিশে রয়েছে।

'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বে শ্রীকান্তের বয়স ছিল পনেরো এবং শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্বে তার বয়স হল বত্রিশ। আর শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব রচনার সময় শরৎচন্দ্রের বয়স ছিল চল্লিশ এবং চতুর্থ পর্ব রচনার সময় সাতান্ন। সুতরাং শ্রীকান্তের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বয়সের ব্যবধান অনেকখানি। শরৎচন্দ্র যখন শ্রীকান্তের মধ্যে

নিজের সত্তা প্রতিফলিত করেছেন তখন তাঁর প্রৌঢ় বয়সের মানসিকতা তাঁর যুবক চরিত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। গোড়া থেকেই শ্রীকান্তের মধ্যে যৌবনের উত্তাপ ও উত্তেজনা কোনো স্থানেই দেখা যায় না, পরিণত বয়সের ভাবুকতা ও অন্তর্মুখীনতাই তার মধ্যে সর্বত্র দৃশ্যমান। চতুর্থ পর্বে শ্রীকান্তের মনে আসন্ন মৃত্যুর ছায়াপাত এক অশ্রুসিক্ত বিষণ্নতা ও জীবন সম্পর্কে করুণ মমতা জাগিয়ে তুলেছে। এ যেন অস্তগামী সূর্যের মত বিদায়-মুহূর্তে বেদনায় রাঙা আংগুল দিয়ে জগৎকে শেষবারের মত ছুঁয়ে যাওয়া। বত্রিশ বৎসর বয়সের যুবকের পক্ষে এরূপ বিদায়ভাবনা হয়তো ঠিক স্বাভাবিক নয়। আসলে সাতান্ন বছরের বিদায়ী স্রষ্টা যে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে চেতনায়িত হয়ে উঠেছেন, সে জন্য বয়সের সংগে ভাবনার এই অসংগতি।

শ্রীকান্ত নিজেকে বলেছে ভবঘুরে। সে সতেরো বছর ধরে বন্ধনহীন গ্রন্থি বাঁধতে বাঁধতে পথে চলেছে। সেই পথে কত মানুষের আনাগোনা হয়েছে, পথের দুধারে বিচিত্ররূপিণী প্রকৃতির ভয়াল-সুন্দর, রুক্ষ-কোমল কত না রূপ ও রহস্য। শ্রীকান্তের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে সব কিছু সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁর দৃষ্টি আলোকিত, তারই রসে তাঁর মানস অভিষিক্ত। প্রথম পর্বে তিনি দুঃসাহসী। অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় চঞ্চল এবং অপরিচিত জীবনপথের উদাসী বাউল, দ্বিতীয় পর্বে সুদূর ব্রহ্মদেশের যাত্রী, তৃতীয় পর্বে রুক্ষ মাটির পথে প্রান্তরে নিঃসংগ পথিক এবং চতুর্থ অথবা শেষ পর্বে তিনি ভ্রমণশেষে নিজের জন্মভূমিতে প্রত্যাগত। এতদিন ধরে তিনি অতৃপ্ত মন নিয়ে শুধু নিরুদ্দেশের পথে ঘুরেছেন, অবশেষে তিনি সব ঘোরার শেষে শ্রান্ত চিত্তে যেন ঘরে ফিরেছেন। একদিন অজানার ডাকে ঘর ছেড়েছিলেন। তারপর অচেনার হাতছানিতে বিহ্বল হয়ে ঘুরেছেন, অসম্ভবের নেশায় মেতে সহজ ও কাছের জগৎকে হারিয়েছেন। কিন্তু নেশা কেটে গেলে আবিষ্কার করলেন যে, কাছের পাওয়ার মধ্যেই সকল সুধা, সকল সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে। সেই আম্রমঞ্জরী ও বকুলগন্ধে উতলা উপবন, বেতস ও বেণুকুঞ্জে দোয়েল, বুলবুল ও শ্যামা পাখীর মনমাতানো গান, সেই ছায়াঢাকা আঁকাবাঁকা গ্রামের পথ, সেই মজা নদীর ক্লিষ্ট কলতান, সেই নাম-না-জানা বৃক্ষলতা, ঝোপঝাড়ের অযত্ন-বর্ধিত সমারোহ—এ সবের মধ্যেই প্রকৃতিরানীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ উজাড় করে দেওয়া হয়েছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছিলেন, সামান্যতম ফুল তাঁর মনে গভীরতম অশ্রুসজল ভাব উদ্রেক করে। শরৎচন্দ্রও এই পর্বে সামান্যের মধ্যে অসামান্যকে আবিষ্কার করেছেন, তুচ্ছ বস্তুর মধ্যে অভাবনীয়ের দীপ্তি সন্ধান করে পেয়েছেন, পরিচিত সুন্দরের মধ্যে পরম সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রথম পর্বে শ্রীকান্ত দার্শনিক, দ্বিতীয় পর্বে

সমালোচক, তৃতীয় পর্বে নিঃসঙ্গ দেশপ্রেমিক এবং চতুর্থ পর্বে তিনি কবি—তাঁর স্বপ্নালু দৃষ্টি নিবন্ধ সৌন্দর্যের মায়ালোকে।

অন্যান্য পর্বের ন্যায় চতুর্থ পর্বেও নানা বিচ্ছিন্ন বৃত্তান্ত অবলম্বনে শ্রীকান্তের কাহিনী অগ্রসর হয়েছে। তৃতীয় পর্বের শেষে শ্রীকান্ত কাশীতে গিয়ে রাজলক্ষ্মীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছে. তারপরেই তার ব্রহ্মদেশের দিকে রওনা হবার কথা। কিন্তু তার ব্রহ্মদেশযাত্রা আর হয়ে উঠল না। একটির পর একটি ঘটনার সঙ্গে সে এমনিভাবে জড়িয়ে পড়ল যে, যাত্রার কথা আর সে ভাবতেই পারল না। প্রথমেই সে আকস্মিকভাবে পুঁটুর বর নির্বাচিত হয়ে এক অভাবনীয় ঝামেলার মধ্যে জড়িত হয়ে পড়ল। দশচক্র ভগবানের ভূত হবার মত আত্মীয়স্বজনের ক্রমাগত চাপ এবং সরব ঘোষণার ফলে শ্রীকান্তও প্রায় অনিবার্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসেছিল। পালাবার উপায় নেই, নিষ্কৃতির পথ নেই. শুধু রাজলক্ষ্মীর একটা সম্মতি বাকি। সেই সম্মতিও যে সহজ হবে সে বিষয়ে শ্রীকান্ত নিশ্চিত ছিল, কারণ তৃতীয় পর্বের শেষে রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে শ্রীকান্তের সম্পর্ক একেবারেই আলগা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই আলগা হয়ে যাওয়াই যে তাদের সম্পর্কের শেষ পরিণতি নয় তা বোঝা গেল পুঁটুর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবে। সে বিষয়ে পরে আলোচনা করা হচ্ছে। পুঁটুর বিবাহ উপলক্ষে পণপ্রথার নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে কিছু ভাবনা আছে, কিন্তু শরৎচন্দ্র এখানে সামাজিক সমস্যার গভীরে ঢুকতে চাননি। কৌতুকপ্রসন্ন মেজাজেই সমস্ত বৃত্তান্তটি বর্ণনা করেছেন। ধূর্ত, কপট ও কুটিল ঠাকুর্দা চরিত্রটি ঈষৎ শ্লেষমিশ্রিত কৌতুকের তুলিকাতেই অঙ্কিত হয়েছে।

পুঁটুর ব্যাপার থেকে মুক্ত হবার আগেই শ্রীকান্ত তার বাল্যবন্ধু গহরের সঙ্গে নতুনভাবে জড়িত হয়ে পড়ল। শ্রীকান্ত তার চার পর্বে দুজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর কথা বলেছে. একজন তার কৈশোর-বন্ধু ইন্দ্রনাথ এবং অপরজন তার বাল্যবন্ধু গহর। বোধ হয় বাল্য ও কৈশোরের পর যথার্থ প্রাণের বন্ধু আর মেলে না. শ্রীকান্তের জীবনেও পরবর্তীকালে আর বন্ধু জোটেনি। তৃতীয় পর্বে সতীশ ভরদ্বাজকে দেখেছিলাম. কিন্তু সেও তার ছোটবেলাকার বন্ধু। ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তের কিশোর বয়সকে নাড়া দিয়েছিল তার বেপরোয়া ও দুঃসাহসিক ক্রিয়াকর্ম এবং নিরাবরণ পৌরুষদীপ্ত মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়ে। কিন্তু বাল্যবন্ধু গহরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার পরিণত যৌবনের ধূসর সায়াহ্নে। তখন উভয়ের হৃদয়ই অচরিতার্থ ভালোবাসার বেদনায় মর্মরিত। শ্রীকান্তের পক্ষে বীণার তারটি ছিঁড়ে গেছে এবং গহর বীণার তারটি বাঁধতেই পারল না। দুজনেই তাই ব্যর্থ বর্তমান থেকে গীতভরা অতীতের স্বপ্নে বিভোর। গহরের ভালবাসা তার মনের গহনে চিরমৌন রয়ে গেছে। তার অনন্ত বিরহের মর্মমূল থেকে কাব্যসৃষ্টির ধারা উৎসারিত হয়েছে এবং তার

নিষ্ফল ভালোবাসা বিশেষ লক্ষ্য ছাড়িয়ে প্রকৃতির সকল বস্তুর মধ্যে, সকল মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। তার জীবনে কোনো জ্বালা নেই, কোনো ক্ষোভ নেই, কোনো নালিশ নেই। সকলকে ক্ষমা করে, সকলকে ভালো বেসে সে শান্ত প্রকৃতির কোলে একদিন চিরশান্তি লাভ করল।

গহরকে সন্ধান করতে গিয়ে শ্রীকান্ত গহরের হৃদিবৃন্দাবনে অবস্থিতা শ্রীরাধার সন্ধান পেল। মুরারিপুরের আখড়ায় শ্রীকান্ত যে দশদিন ছিল সেই দশদিন যেন শ্রীকান্তের জীবনে এসেছিল একটি মধুময় বৈষ্ণবকবিতার মত। সেই কবিতার সুরে ছন্দে, রূপে রসে তার জীবন ভরে ছিল। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকান্তের চার পর্বের মধ্যে এরূপ মাধুর্যময়, সৌন্দর্যময় ও সংগীতময় অংশ আর নেই। যে মুহূর্তে শ্রীকান্ত মুরারিপুকুরের আখড়ায় প্রবেশ করল তখন যেন পার্থিব সংসারের সীমানা ছাড়িয়ে সে এক নববৃন্দাবনে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে গোপীপ্রেমের যমুনাধারা দুকূল ভাসিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। সেখানে শুধু প্রেম, শুধু গান, শুধু রসের হিল্লোল। শ্রীকান্ত যেদিন সেই বৃন্দাবনে গিয়ে আবির্ভূত হল, সেদিন গোপীপ্রধানা শ্রীরাধার বিরহসাধনা যেন পূর্ণ হল। শ্রীকান্তকে দেখেই সে যেন তাকে প্রাণের মাঝে বরণ করে নিল। তারপর চলল পূর্বরাগের চঞ্চলতা, অনুরাগের গাঢ়তা, পুষ্পবনে অভিসার এবং মৃদু মান-অভিমানের অস্ফুট গুঞ্জন। রাজলক্ষ্মীর প্রেমও শ্রীকান্তকে এরূপ বিবশ বিভ্রান্ত করতে পারেনি। সে কমললতার প্রতি বিরূপ হতে চেয়েছে, কিন্তু পারেনি, সে আখড়া থেকে পালিয়ে যেতে চেয়েছে, কিন্তু তার পা চলেনি। কমললতা তার কলঙ্কিত জীবনকে উৎসর্গ করেছে সকলকলঙ্কভঞ্জন শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—'আত্মসুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার। কৃষ্ণসুখ হেতু করে নানা ব্যবহার॥ কৃষ্ণলাগি আর সব করি পরিত্যাগ। কৃষ্ণসুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥' কমললতাও সব ত্যাগ করে কৃষ্ণের 'প্রিয়া শিষ্যা সখী দাসী'রূপে আত্মনিয়োগ করেছে। দিনরাত 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি'তে তার চিত্ত মগ্ন, তাই সকলের প্রতি তার প্রেমের উৎস ছিল অবারিত। তার আরাধ্য অখিলরসামৃতমূর্তি শ্রীকৃষ্ণকে সে শ্রীকান্তের মধ্যেই দেখতে পেয়েছিল, তাই শ্রীকান্তকে দেখেই আত্মার পরম আত্মীয়রূপে মনে করেছিল। শ্রীকান্তকে সে হৃদয়ের সবটুকু নিঙড়ে ভালো-বেসেছিল, সব দিয়ে নির্ভর করেছিল। কিন্তু এ-প্রেমের কোনো বন্ধন নেই, ভার নেই, দাবী নেই, অভিযোগ নেই। শ্রীকান্তকে যেমন একদিন সমগ্র হৃদয় দিয়ে সে ভালোবেসেছিল, তেমনি আর একদিন অত্যন্ত সহজভাবেই শ্রীকান্তকে ছেড়ে গেল। আশ্রমের সকলকে সে অতিশয় আপনার করে নিয়েছিল, আবার আশ্রম থেকে একদিন কাউকে না বলেই সে বিদায় নিল। সকল অগতির গতি, সকল অনাশ্রয়ের আশ্রয় পরম প্রেমময়ের চরণে সে শরণ নিয়েছিল, তার জন্য

কোথায়, ভাবনাই বা কোথায়? পার্থিব সকল বন্ধন ছিন্ন করে কলঙ্কের হার গলায় পরে কমললতা একদিন দূর বৃন্দাবনের পথে অভিসারে রওনা হল। হয়তো সেখানে তার সকল জ্বালা, সকল যন্ত্রণার অবসান ঘটেছিল।

'শ্রীকান্তের শেষ পর্বে শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর ভালোবাসা কাছে টেনে আনা আর দূরে ঠলে দেওয়ার বিষম দ্বন্দ্ব থেকে এক নিশ্চিন্ত সমাধানের মধ্যে পরিণতি লাভ করল। তৃতীয় পর্বে রাজলক্ষ্মীর দুশ্চর ধর্মসাধনা শ্রীকান্ত ও তার মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধান রচনা করেছিল। শ্রীকান্ত যখন কাশীতে রাজলক্ষ্মীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এল, তখন সে বুঝেছিল যে তাদের দেনা-পাওনা সব চিরদিনের জন্য চুকে গেছে। তাই পুঁটুর সঙ্গে তার বিবাহে রাজলক্ষ্মীর দিক থেকে কোনো আপত্তি আসবে না। কিন্তু সে বোঝেনি যে, ভালোবাসার শেষ কথাটি তখনও অনুচ্চারিত। শ্রীকান্তের প্রতি রাজলক্ষ্মীর চির-অনুগতা, চির-অনুরক্তা সত্তা তার শুষ্ক ধর্মাচরণ, তার জপ-তপ ও ব্রত-উপবাসের নীচে পরম নির্ভরতায় শ্রীকান্তকেই অবলম্বন করেছিল। শ্রীকান্তের প্রতি নিস্পৃহ আচরণ, উপেক্ষা ও অনাদর তার সাময়িক মোহ ও বিভ্রান্তির ফলে ঘটেছিল। কিন্তু যখন শ্রীকান্ত পুঁটুর সঙ্গে তার বিবাহে রাজলক্ষ্মীর সম্মতি চাইল তখনই রাজলক্ষ্মীর আসল সত্তা তার সাময়িক ধর্মাচরণের অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এসে আত্মঘোষণা করল। তার নিশ্চিন্ততার ভিত্তি যখন একটু নড়ে উঠল তখনই শ্রীকান্তের উপর তার স্থায়ী অধিকার অক্ষুণ্ন রাখবার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠতে হল। অপরিমেয় ভালোবাসার সঙ্গে অত্যাজ্য অধিকারবোধ যুক্ত হয়ে থাকে, সে জন্য রাজলক্ষ্মীর পক্ষে তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। পুঁটুর সঙ্গে শ্রীকান্তের বিবাহ-সম্ভাবনায় রাজলক্ষ্মীর আত্মবিস্মৃত সত্তা যে পুনরায় আত্মসচেতন হয়ে উঠল শুধু তাই নয়, সেই সত্তা যেন তার দূরে সরে যাওয়া প্রিয়তমের বড় কাছাকাছি আসতে চাইল। 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বে সর্বত্র এই ফিরে আসার স্নিগ্ধ ও প্রীতিপ্রদ কাহিনী। শুধু শ্রীকান্তের গ্রামে ফিরে আসা নয়, রাজলক্ষ্মীরও শ্রীকান্তের কাছে ফিরে আসা। রাজলক্ষ্মী তার জীবনের অনেকগুলি স্তর পেরিয়ে অবশেষে শ্রীকান্তের কাছে এসে ধরা দিয়েছে। সে কখনো পিয়ারী বাইজী, কখনো বঙ্কুর মা, কখনো কৃচ্ছ্রধর্মচারিণী—সব শেষে সে কল্যাণী গৃহবধূ। শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মী সম্পর্কে বলেছে, 'সকলের সকল শুভচিন্তায় অবিশ্রাম কর্মে নিযুক্ত—কল্যাণ যেন তাহার দুই হাতের দশ অঙ্গুলি দিয়া অজস্রধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে। সুপ্রসন্ন মুখে শান্তি ও পরিতৃপ্তির ছায়া।' রাজলক্ষ্মীর এই শান্ত, পরিতৃপ্ত কল্যাণী রূপ এসেছে জীবনের এক নিশ্চিন্ত কেন্দ্রে সুস্থিত হওয়ার ফলে। সে অনেক দেখেছে, অনেক ঘুরেছে, অনেক অস্থিরতা ও মাদকতার আবর্তে দিশাহারা হয়েছে, কিন্তু অবশেষে শ্রীকান্তকে

নিয়ে শান্তির নীড় রচনা করেছে। শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর সম্পর্ক এই পর্বে সবচেয়ে মধুর, সবচেয়ে স্নিগ্ধ, সবচেয়ে উপভোগ্য। প্রেমের লাবণ্যধারায় অভিষিক্ত, রঙ্গরসালাপে রমণীয়, বিশ্বাসে নির্ভরতায় গাঢ় এই সম্পর্ক এক অবিচ্ছিন্ন পরিতৃপ্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। শ্রীকান্ত এই পর্বে মহা ভাগ্যবান ব্যক্তি সন্দেহ নেই। এতদিন তার ভবঘুরে জীবন কেটেছে এক-প্রকার উপেক্ষিত নিঃসঙ্গতার মধ্য দিয়ে, কিন্তু এই পর্বে তার একদিকে রাজলক্ষ্মী অন্যদিকে কমললতা—দুই নারীর কূলছাপানো প্রেমে সে হাবু-ডুবু খাচ্ছে। তারপর আবার মৃত বন্ধুর এক বাক্স টাকা! শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীকে নিয়ে চার পর্ব ধরে পাঠকদের উদ্বেগ ও অস্বস্তির অন্ত ছিল না। এই তারা কাছে আসে, এই দূরে সরে যায়, প্রত্যাশিত মিলন আর ঘটে না। চতুর্থ পর্বের শেষে কমললতার নিরুদ্দেশ যাত্রা তাদের চিত্তে বেদনার করুণ রাগিণী জাগিয়ে তুললেও শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর মিলিত জীবনযাত্রা মধুর আনন্দরসে তাদের অন্তর অভিষিক্ত করে।

'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বের রচনার মধ্যে সর্বত্র একটা প্রীতিপ্রসন্ন, সৌন্দর্য-রসিক ও মমতাকরুণ দৃষ্টি ব্যাপ্ত হয়ে আছে। জীবনের শেষ পর্বে শরৎ-চন্দ্রের মনে যে ক্ষমাসুন্দর ও করুণাস্নিগ্ধ ভাব জন্মলাভ করেছিল তার প্রকাশ হয়েছে এই পর্বের মধ্যে। আর একটি প্রেরণার ফলেও এই পর্বের রচনার মধ্যে এক অপূর্ব কোমলতা ও লাবণ্যের সৃষ্টি হয়েছে। সমস্ত চতুর্থ পর্বে বৈষ্ণব রসের অমৃতধারা প্রবহমান, সেই বৈষ্ণবরসে শরৎচন্দ্রের চিত্ত অভিস্নাত। বৈষ্ণব পদের সুললিত মাধুর্য, ভক্তিধর্মের রসসাধনা, সুমধুর কীর্তনের ভাব-মত্ততা চতুর্থ পর্বের রচনাকে এক অপরূপ সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে তুলেছে। বৈষ্ণবধর্মের প্রেমরসে লেখকের চিত্ত অনুসৃত হওয়ার ফলে তিনি সর্বত্র প্রেম-ময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। চতুর্থ পর্বে বাংলার পল্লীপ্রকৃতির কোমল ও করুণ রূপ তিনি যেমন দরদ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন এমন আর তাঁর সাহিত্যের কোথাও দেখিনি। অনেকদিন পরে নিজের মাটিতে ফিরে এলে পরিচিত গাছপালা, লতাগুল্ম, পথঘাট সব যেন এক মায়াময় সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে ধরা পড়ে। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতেও পল্লীপ্রকৃতি সেভাবে ধরা পড়েছে। ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের মত তিনিও যেন সব অচেতন বস্তুর মধ্যে এক প্রাণশক্তি আবিষ্কার করেছেন এবং সর্বত্রই 'An appetite, a feeling and a love'-এর যেন সন্ধান পেয়েছেন। সব কিছু আজ তাঁর চোখে সুন্দর, কারণ সবকিছু থেকে বিদায় নেবার সময় আসন্ন। মৃত্যুর যবনিকার অন্তরালে অদৃশ্য হবার আগে মানুষ বেদনাকরুণ আলোকে জীবনকে কত সুন্দর দেখে, এই পর্বে তার পরিচয় আমরা পেলাম।

'বেতার জগৎ'-এর সৌজন্যে পুনমুদ্রিত।

# শরৎচন্দ্র ও গুজরাতী উপন্যাস

**শিবকুমার যোশী**

শরৎচন্দ্র কি গুজরাতী ঔপন্যাসিকদের প্রভাবিত করেছিলেন? এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন, এর সবদিক খুঁটিয়ে না দেখে এ-প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া আরো কঠিন।

শরৎচন্দ্রকে অন্তরঙ্গভাবে জানতে গেলে তাঁর সমাজপটভূমি, সেই সময় যা তাঁর মানসিক গঠনের জন্য দায়ী—সেগুলি বিশ্লেষণ করা দরকার। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তো তখন ইতিহাসের অঙ্গ, বঙ্কিমচন্দ্র ঋষিরূপে সম্মানিত, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ অবতার-পর্যায়ে উন্নীত, শ্রীঅরবিন্দ নিভৃত ঈশ্বরচিন্তায় নিবিষ্ট, তখন রবীন্দ্রনাথই সর্বব্যাপী এবং বাংলা সাহিত্যে তিনিই চূড়ান্ত।

প্রাচীন সাহিত্যের দিন চলে গেছে এবং ভারতীয় রেনেশাঁস তার দিগন্ত পার হয়েছে—এমন সময় শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। গুজরাতী সাহিত্যের ব্যাপারও অনুরূপ। গোবর্ধনরাম ত্রিপাঠী, কানাইয়ালাল মুন্সী, ঝাভেরহান্ড মেঘানী এবং সর্বশেষে রমনলাল দেশাই গুজরাতী উপন্যাসজগতে আধিপত্য করে গেছেন। তখনো শরৎচন্দ্র গুজরাতী পাঠকদের কাছে পরিচিত নন। যদিও তিনি ধীর-ভাবে চল্লিশের দশকের গোড়া থেকেই গুজরাতী সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করছিলেন, কিন্তু তখনো তাঁর প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। নতুন উদীয়মান উপন্যাস-লেখকেরা নতুন ভাষারীতি, উপন্যাস-লেখার নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন।

এমন সময় শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। শরৎচন্দ্রের মতো গুজরাতী ঔপন্যাসিকরাও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাষা, এমনকি নিম্নশ্রেণীর কথ্যভাষাতেও লিখতে শুরু করেছিলেন। সাধারণ মানুষের দিনানুদৈনিক ঘটনাবলী এবং অনুভূতিগুলিকেই শরৎচন্দ্র সুন্দর শিল্পসম্মত রূপ দিলেন। পাণ্ডিত্যের গুরুভারে বা অফুরন্ত চিত্রকল্পের চাপে তাঁর উপন্যাস আচ্ছন্ন হয়নি।

শরৎচন্দ্রের এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, এমন কি যখন রবীন্দ্রনাথ ক্ষমতার তুঙ্গে, আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালী পাঠকের চিত্ত জয় করেছিল এবং তাঁর দিগ্বিজয় বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী পাঠকদের সীমা অতিক্রম করেছিল।

আরেকটি লক্ষণে শরৎসাহিত্য বিশেষিত, সে হল তাঁর অবহেলিত মানুষদের প্রতি সহানুভূতি। তিনি অনুভব করেছিলেন, এই সব মানুষ সর্বস্ব দিয়েও কিছু পায় নি। যারা দুর্বল, প্রপীড়িত, সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, তাদেরই বেদনা তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে। যারা জীবনের সূক্ষ্ম সুকুমার জিনিসগুলি থেকে বঞ্চিত, তাদের বিষয়ে লিখতেই তিনি উৎসুক হয়ে উঠলেন।

তাদের বেদনাই দিলে তাঁর মুখ খুলে এবং বস্তুত জনগণহৃদয়ে তার প্রতিবাদ সঞ্চারিত করতেও তিনি উৎসাহী হন।

তাঁর সাহিত্যচর্চার এই দিকটি সম্বন্ধে আমি একটু বিশদ আলোচনা করতে চাই। প্রসঙ্গত আমি গুজরাতী উপন্যাসের সমকালীন আন্দোলনগুলিরও উল্লেখ করব।

শরৎচন্দ্র স্পষ্ট ঘোষণা করেছিলেন যে, যে-বিষয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই সে-বিষয়ে তিনি কিছু বলবেন না। 'সাহিত্যে ফাঁকি চলে না'।

আমাকে আরো একটা প্রশ্ন তুলতে দিন। শরৎচন্দ্র কি জীবনের সব দিক সম্বন্ধে জানতেন? তাঁর সমকালীন বাঙালী জীবন সম্বন্ধে? তাঁর অনূদিত রচনাবলীর পাঠকেরা বিশ্বাস করতে চেয়েছিল—হ্যাঁ, তা তিনি জানতেন। অন্যেরাও শরৎচন্দ্রের রচনা সম্বন্ধে এ-ধরনের বিশ্বাস রাখতেন; কারণ তাঁর সৃষ্ট পরিস্থিতি ও চরিত্রগুলি কমবেশি সারা দেশের কাছেই পরিচিত; অন্তত তাঁর গুজরাতী পাঠকদের অভিজ্ঞতা হয়েছিল যে লোকেরা এইভাবে চলুক—তিনি চাইতেন।

শরৎচন্দ্রের লেখা অনেকে গুজরাতীতে অনুবাদ করেছেন। বাপুর একান্ত সচিব স্বর্গত মহাদেব দেশাই—প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে বিরাজ বৌ এবং আরো কয়েকটি গল্প অনুবাদ করেন। সঙ্গে সঙ্গে মনোযোগী পাঠকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল এই অসাধারণ ঔপন্যাসিকের প্রতি—যাঁর ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে একটি কল্পপুরাণ রচিত হয়েছিল। তাঁর অনুরাগীরা তাঁর চরিত্রের সঙ্গে তাঁকে মিলিয়ে দেখতে লাগল।

তারপরে এল নিউ থিয়েটার্সের স্বর্গত প্রমথেশ বড়ুয়ার দেবদাস চলচ্চিত্র; ঐ চিত্র সারা দেশে যেন শরৎসাহিত্যের প্লাবন-দরজা খুলে দিল। তাঁর উপন্যাসগুলির চাহিদা ভীষণ বেড়ে গেল। ঘরে ঘরে তাঁর নাম।

এই সময় গুজরাতী সাহিত্যে মুন্সী-যুগ শেষ হয়ে আসছে। ঝাভেরহান্ড মেঘানির কিছু ভালো উপন্যাস বেরিয়েছে, সার্থক আঞ্চলিক রঙ নিয়ে; কিন্তু তখনো রমনলাল বসন্তলাল দেশাই রাজত্ব করছেন। শরৎচন্দ্রের পক্ষে যা স্বাভাবিক, সেই শিল্পকর্ম বা গভীরতা কোনটাই দেশাইর ছিল না। অবশ্য চার খণ্ডে সমাপ্ত সুবিশাল গ্রামলক্ষ্মী উপন্যাস ছাড়া তিনি কখনোই গ্রামীণ গুজরাতকে স্পর্শ করেন নি. এই পর্যন্ত কাণ্ডজ্ঞান তাঁর ছিল। সেখানে আমরা দেখি পল্লীসমাজের রমেশের সমস্যাগুলিরই যেন সম্মুখীন হচ্ছে আশ্বিন। কিন্তু দেশাই সেখানে স্বপ্নদ্রষ্টা হয়ে উঠেছেন. তিনি সমাজসংস্কারক. আর শিল্পী নেই।

কিন্তু পরোক্ষভাবে আমাদের সব কজন প্রধান ঔপন্যাসিক—পান্নালাল প্যাটেল. ঈশ্বর পেটলিকার এবং চুনীলাল মেডিয়া—যে তিনজন শীর্ষস্থানীয়

লেখক গুজরাতের গ্রামজীবনের পটভূমিকায় লিখেছেন, তাঁদের শরৎবাবু প্রভাবিত করেছেন। তাঁরা খুব বিশ্বস্তভাবেই গুজরাতের পল্লীপরিবেশ চিত্রিত করেছেন। তবে তাঁদের সৃষ্ট নরনারী শরৎচন্দ্রের চরিত্রের মতোই কর্দমাক্ত গেঁয়ো পথের, অথবা গুজরাতী ক্ষেতখামারের বাস্তব নরনারী থেকে কয়েক ইঞ্চি বেশি লম্বা।

কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। শরৎবাবুর কাছে তাঁরা অনেকেই প্রেরণা পেয়েছিলেন যে, এইভাবেই ভারতবর্ষের বিশাল পরিধিকে তাঁরা ঠিকমত ফুটিয়ে তুলতে পারবেন। কখনো কখনো রঙ হয়েছে চড়া, একটু বেশি ঝকমকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছবিটা ভারতবর্ষীয় সকলের কাছেই স্বাদু হয়েছে। পুরো ব্যাপারটারই পরিণতি হয়েছে স্বদেশের মাটিতে। ভারতীয় পুরাণ, তার ধর্মীয় আবেদন, সামাজিক রীতি-প্রথার দৈনন্দিন আচার-অনুষ্ঠান, ভারতীয় সমাজের আদর্শ তাঁর রচনায় বিশ্বস্তভাবে চিত্রিত হয়েছে। তাঁর সৃষ্টি ছিন্নমূল বৈদেশিক নয়, চরিত্রগুলি এমনই পরিবেশে নিক্ষত যে পাঠক-সাধারণের পক্ষে তারা খুবই পরিচিত বলে প্রতিভাত হয়। সাহিত্য তার সৌকুমার্য নিয়ে পাশ্চাত্য রীতিতে শিক্ষিত এবং স্বল্পশিক্ষিত-সাধারণ মানুষের হৃদয়ে পেঁছায়, যেভাবে রামায়ণ-মহাভারত যুগে যুগে গৃহীত হয়ে এসেছে।

অনেকে বলেছেন, শরৎবাবুর উচ্চ আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারীচরিত্রগুলি রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনীর দ্বারা অনুপ্রাণিত, এমন কি ঘরে-বাইরের বিমলা হয়তো দত্তার বিজয়া চরিত্রের মূলে। শরৎচন্দ্রে রবীন্দ্রনাথের সেই কল্পনাগ্রাম নেই, কিন্তু তিনি অত্যন্ত সাবলীলভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করেন। সেজন্যই তিনি লোকপ্রিয় গল্প-কথক।

বুদ্ধিদীপ্ত কল্পনার অভাব সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র অন্তরের সংক্ষোভ বর্ণনা করতে পারতেন, তার প্রমাণ বিরাজ ও ললিতা। আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারি যোগাযোগের কুমুদিনীর সঙ্গে কোথায় ললিতার পার্থক্য; কিন্তু গুজরাতী পাঠক এবং ঔপন্যাসিকদের কাছে ললিতাই অনেক কাছের মানুষ; বরং তাকে দিয়েই কুমুদিনীকে চেনা যায়। কুমুদিনীর আন্তর সংক্ষোভ বোঝার জন্য উমাশংকর-পর্যায়ের সমালোচকের জন্য তাঁদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল। শরৎবাবুর বিপ্রদাস গুজরাতী পাঠকের কাছে সহজবোধ্য, কিন্তু কুমুদিনীর বড়ভাই, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট অপর বিপ্রদাসের সঙ্গে বোঝাপড়া করাই কঠিন। কেন? শরৎবাবু নারীর স্নেহ-ভালবাসা, ভালবাসায় তার জন্মগত অধিকার। বস্তুত নারীহৃদয়ের এই সুকুমার বৃত্তিগুলি এরকম গভীর সহানুভূতি দিয়ে আর কখনো দেখা হয় নি। হতে পারে যে, এই সহানুভূতি কোন কোন সময় অভিলাষী চিন্তা বা বিশুদ্ধ চিত্রকল্প বা দুয়ের সমন্বয়; কিন্তু এই ধরনের বিবৃতিকে ঠিক রোমান্টিক বলা যায় না। এই রকম হবার কারণ—তাঁর উপজীব্য বিষয়

সম্বন্ধে তাঁর গভীর এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ অভিজ্ঞতা ছিল; তিনি প্রায়ই ফিরে গেছেন অভিজ্ঞতার সেই বিশাল জলাধারে এবং সেখান থেকে কিছু-না-কিছু নিষ্কাশন করেছেন। হতে পারে, তাঁর সেই অভিজ্ঞতা কখনো খুবই অস্বচ্ছ এবং বিশৃঙ্খল।

শরৎচন্দ্রের এই দৃষ্টিভঙ্গি পান্নালাল অথবা মডিয়ার মতো ঔপন্যাসিকদের অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত নারীচরিত্র অংকনে অজ্ঞাতসারে সাহায্য করেছিল। এগুলিকে আমরা শরৎ-প্রভাব না বলে বলতে পারি প্রেরণাশক্তি, সাহস সঞ্চার করেছেন একজন 'মহৎ জনপ্রিয়' ঔপন্যাসিক। প্রায়ই দেখি, পান্নালাল বা মডিয়ার নারী-চরিত্রগুলি যেন উদ্দেশ্যহীন, যেমন শরৎচন্দ্রে দেখা যায়, এক বিশেষ গোত্রীয় 'অহং' এবং নারীজীবনের দুঃখবহ পরিণাম—কিন্তু তাদের অনুশোচনার পিছনে গভীর সত্য নিহিত আছে।

এই অভিজ্ঞতাই হচ্ছে সবচেয়ে মূল্যবান। এমন একজন ব্যক্তির অভিজ্ঞতা যিনি অত্যন্ত শান্ত-সংযত, যিনি অনেকের বিস্ময়কর উদার হৃদয় এবং অনেকের অন্ধকার সংকীর্ণচিত্ততার পরিচয় পেয়েছেন, এমন কি দুয়ের মাঝামাঝি মানুষের শূন্যতাকেও চিনেছেন। কখনো কখনো মনে হয় মানুষের মধ্যে 'ভালোত্ব' দেখাটা শরৎবাবুর ক্ষেত্রে একটা অবসেশনে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু আমি তাঁর এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন দোষ দেখি না। তাতেই তাঁর শিল্পদৃষ্টি পুরোপুরি ভারতীয় হয়ে উঠেছে। অভিজ্ঞতা ও এই অবসেশনের যোগেই তিনি পাঠকদের হৃদয় জয় করেছেন। প্রায়ই পাঠকচিত্ত ধারণা করে যে, অমুক অমুক চরিত্রের মুক্তি নেই; কিন্তু না, সেটা খুবই ভুল ধারণা; তিনি কেবল পথ দেখান; মুক্তি আর কোথাও নেই, আছে নিজের নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে, হয় সর্বাত্মক আত্মসমর্পণ নতুবা বিশেষ সংকটমুহূর্তের আত্মবিসর্জন।

আমাদের আধুনিক উপন্যাস প্রসঙ্গে মুক্তির কথা ওঠে। হয় তাঁদের জীবন সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা নেই, নতুবা তাঁরা এর থেকে পালানোই বেশি পছন্দ করেন। তাঁরা নিজেরা কোন জীবনদর্শন সৃষ্টি করতে পারেন না, সুতরাং তাঁরা অপরের তৈরি ধ্যান-ধারণা আমদানি করেই তৃপ্ত। তাঁদের দুটি মহাযুদ্ধ পার হয়ে আসতে হয় নি, তাঁরা কল্পনাও করতে পারবেন না 'ঘেটো' বা কনসেন-ট্রেশন ক্যাম্প কাকে বলে অথবা ভিয়েনামের যুদ্ধে জড়িত হওয়ার দুঃস্বপ্ন কাকে বলে। অথচ তাঁদের মুখে শোনা যায় নৈরাশ্য, বিচ্ছিন্নতা, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির অনন্বয়; তাঁরা ঈশ্বর মানেন না, ধর্মের বা নীতির ঔচিত্যগুলিকেও ঘৃণা করা আজকাল তাঁদের মধ্যে একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ একজন কট্টর কমিউনিস্টকেও দেখা যায় তাঁর এলাকায় দুর্গাপূজা মণ্ডপের তদারক করছেন এবং কুলপুরোহিতের ঝাড়ফুঁক মাথা পেতে নিচ্ছেন। প্রত্যেকটি

মানুষেরই জীবনে নিজের সঙ্গে নিজের একটা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আছে; কিন্তু নতুন-দেখা সার্বভৌমিকতার নামে অজ্ঞাত দিগন্তের দিকে ঠেলে দেওয়াতেও কোন চিরস্থায়ী শিল্পসৃষ্টি হয় না।

বিভূতিভূষণ, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তত কিছু কিছু উপন্যাস বিশ্বসাহিত্যেও স্থান পেতে পারে। তাঁরা সকলেই ভারতীয় জীবনযাপনের ভঙ্গি, ভারতীয় দর্শন ও মননচিন্তনকেই তাঁদের লেখায় প্রকাশ করেছেন। শরৎচন্দ্র কেবল তিরিশের থেকে পঞ্চাশের দশকের বাংলাদেশের জন্যই একটা বিশেষ ছক তৈরি করে দিয়েছিলেন, তাই নয়, সারা দেশের সম্পর্কেই কথাটা প্রযোজ্য। মানুষের জীবনাচরণের নানা দিককে তিনি ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরলভাবে দেখেছেন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বেশি রকম অভিজাত। যেমন ছিলেন আমাদের প্রাক-শরৎ জনপ্রিয় গুজরাতী লেখকরা—সরস্বতীচন্দ্রের (চার খণ্ডে সম্পূর্ণ) লেখক গোবর্ধনরাম ত্রিপাঠী অথবা কে এম মুন্সী।

সারা দেশেই উত্তর-শরৎ পর্বের লেখকদের প্রভূত অভিজ্ঞতা আধুনিক ভারতীয় উপন্যাসে একটা নতুন ব্যাপ্তি এনে দিয়েছে। এ'রা পাঠকদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে লজ্জা বোধ করেন না; অথচ এ'দের পক্ষে দাবি করা হয় যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মানবসমাজে বহুকালপোষিত ও সংরক্ষিত মূল্যবোধগুলি নষ্ট হয়ে গেছে, দেশভাগের পর ভারতের গ্রামাঞ্চলের চেহারা পালটে গেছে, সাধারণভাবেই মানুষ হতাশা-জর্জরিত, মানসিক শক্তি-প্রেরণা উদ্দীপনা হারিয়ে গেছে। ভবিষ্যতে এক শ্রেণীর সঙ্গে আর-এক শ্রেণীর সম্বন্ধ কীরূপ হবে সে ছবিটাও অস্পষ্ট। কোন কিছুর প্রতি বিশ্বাস, কোন কিছুর সঙ্গে একাত্মতা দুরূহ, কখনো কখনো ব্যর্থশ্রম মাত্র। নতুন লেখক-গোষ্ঠী সেই মানুষটির সন্ধানে বেরিয়েছেন, যে সব বিশেষণের তাৎপর্য হারিয়েছে। অসংগতি, অসামঞ্জস্যই হচ্ছে জীবনের বাস্তব সত্য—এই কথা এ'রা প্রমাণ করতে চান।

কিন্তু তাঁরা সম্ভবত জানেন না যে অসামঞ্জস্য, অসঙ্গতি সত্ত্বেও মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। শত শতাব্দীর অভিজ্ঞতা ও নিরীক্ষা থেকে মানুষ যে-সব চিরন্তন আদর্শ পেয়েছে, তার থেকেই আশা, শক্তি এবং দৃঢ় মনোবল সংগ্রহ করে।

# 'শেষ প্রশ্ন'

## মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'শেষপ্রশ্ন' লিখলে লোকে আমার প্রতিভায় অবাক হয়ে যেত। কারণ তা হলে 'শেষপ্রশ্নের' বিচারই লোকে করত, লেখকের পূর্বতন সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে বইখানার সর্বাঙ্গীণ অমিলটা অপরাধ বলে গণ্য করত না।

বাস্তবিক, 'শেষপ্রশ্ন' সম্বন্ধে যেখানে যত বিরুদ্ধ সমালোচনা পড়েছি এবং শুনেছি তার মধ্যে এই অভিযোগটিই প্রধান হয়ে উঠেছে যে, শরৎবাবু এ বই লিখলেন কেন? 'শেষপ্রশ্নের' অভিনবত্বে এঁদের বিস্ময় নেই, বইখানায় পরিচিত শরৎচন্দ্রকে খুঁজে না পেয়ে এঁরা ক্ষুব্ধ। বড় লেখকদের এই এক মুশকিল। তাঁদের লেখার মধ্যে যে জিনিসগুলি কনস্ট্যাণ্ট অর্থাৎ লিখনভঙ্গী, চরিত্র-চিত্রণপদ্ধতি, রসপরিবেশন-রীতি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য,—এগুলি পাঠকের মনে স্থায়িভাবে মুদ্রিত হয়ে যায়। 'শেষপ্রশ্ন' পড়তে বসার আগে আমরা ভাবি, 'চরিত্রহীন'. 'গৃহদাহে'র শরৎচন্দ্রের লেখা পড়তে বসলাম, 'শেষ প্রশ্ন' পড়বার সময় আমরা মনে রাখি 'শরৎচন্দ্রের লেখা পড়ছি'। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় এ ধারণা আহত হতে থাকলে বইখানার বিরুদ্ধে অভিযোগের আমাদের অন্ত থাকে না।

অথচ, সারাজীবন একভাবে বই লিখে এসে স্টাইল টেক্‌নিক সমস্ত বদলে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ভাল বই লেখা বড় প্রতিভারই পরিচয়। 'ভারতবর্ষে' টুকরো টুকরো শেষ প্রশ্ন পড়ে ব্যাপারটা আমারও ভাল বোধগম্য হয়নি। তারপর একসঙ্গে সমগ্র বইখানা পড়লাম। সবিস্ময়ে ভাবলাম, এত নাম ও প্রতিষ্ঠার বোঝা বয়ে নতুন লেখক হবার সাহস শরৎচন্দ্র পেলেন কোথায়?

ভাবনাটা মাঠে মারা গেল না। নতুন লেখকের ভাল বইয়ের মতো 'শেষপ্রশ্ন'ও অযথা নিন্দিত হল।

কবিতার মতো ছবি এঁকে রবীন্দ্রনাথ পেলেন প্রশংসা, আর একেবারে নতুন কিছু করে শরৎচন্দ্র হলেন অপরাধী।

কথা উঠবে—নতুনত্বই সব নয়। কিন্তু নতুনত্ব শুধু চটক অথবা গুণ—সেটা বিচারসাপেক্ষ। চমক-দেওয়া অনেক কিছু মানুষকে ঠকিয়েছে বলেই সর্বত্র অভিনবত্ব মেকী নয়।

'শেষপ্রশ্নে'র রস-সংযম থেকে রস সংগ্রহ করা সকলের পক্ষে সহজ নয়। যে বই কাঁদিয়ে ছাড়ে তার করুণ রসের অসংযম প্রত্যেকটি অশ্রুবিন্দুতে প্রমাণিত হয়ে যায়। শরৎবাবুর অনেক বইয়ে দেখা যায় তাঁর দরদ মানুষের প্রতি, বিশেষ করে এই বাংলাদেশের মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা, আর্টকে

ছাপিয়ে উঠেছে। কিন্তু তিনি যে দরদ-সর্বস্ব লেখক নন, আর্টের মর্যাদাও যে তিনি বোঝেন, 'শেষপ্রশ্ন' তা নিঃসংশয়রূপে প্রমাণ করেছে।

শেষপ্রশ্নের রসসৃষ্টি সম্পূর্ণ কলাসম্মত ও গভীর।

উপন্যাসের চরিত্র পাঠকের ইচ্ছা ও ভাল লাগাকেই সমীহ করে পরিণতির দিকে চলবে না, তার গতির মধ্যে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে, এমনকি লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রভাব পর্যন্ত এড়িয়ে নিজের ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলবে। হামসুনের 'গ্রোথ অব সয়েল' ভিন্ন আর কোন বইয়ে এ নিয়ম যথাযথ পালিত হতে দেখিনি! বাংলা সাহিত্যে এ গুণ যদি উল্লেখযোগ্যভাবে কোন বইয়ে থাকে সে বই 'শেষপ্রশ্ন'। এদিক দিয়ে 'শেষপ্রশ্নে'র শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করবার উপায় নেই।

এই গুণের জন্য কমল 'গোরা'র নারী-সংস্করণ নয়। সে নিজের ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ করেছে—সেজন্য পাঠক, লেখক, উপন্যাস রচনার প্রথা কোন কিছুরই মুখ চেয়ে থাকে নি। তার জীবনের ঘটনাস্রোত, তার সঞ্চিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, সংস্কার প্রভৃতি যেখানে তাকে ঠেলে এনেছে সেইখানে দাঁড়িয়ে নিজেকে সে ঘোষণা করেছে, সে স্থানটি তার পক্ষে বিপজ্জনক কিনা সে হিসাব করে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাবার চেষ্টা করে নি।

কমলের বিরুদ্ধে অভিযোগ শোনা যায়, সে নাকি একটি বান্ডল্ অব স্পীচেস। 'শেষপ্রশ্ন' নাকি এদেশের সঙ্গে ওদেশের যুদ্ধের মহাভারত, কমল ওদেশের হয়ে একাই যুদ্ধ করেছে। মতের লড়াই 'শেষপ্রশ্নে' নেই এমন নয়, কিন্তু সেটা প্রধান নয়। তর্ক করা কমল-চরিত্রের একটা প্রধান দিক্, এদেশ ওদেশ সমস্যাটা তার তর্কের বিষয়বস্তু মাত্র। আধুনিক মানুষের মনের দুয়ারে আজ সমস্যার ভিড়, মানুষকে আজ অত্যন্ত মাথা ঘামাতে হয়, মস্তিষ্কের পরিচয় না দিলে আজকের মানুষের অর্ধেক পরিচয়ের বেশী দেওয়া যায় না। কমল যা বলে তা সত্য কি মিথ্যা, সেটা তাই বড় কথা নয়। অত কথা সে কেন বলে, এ প্রশ্নও অচল। তার বলার মধ্যে তার চরিত্রের যতখানি মস্তিষ্কের অধিকার ততখানি পরিষ্কার ফুটে উঠেছে কিনা সেইটুকুই বিচার্য।

অর্থাৎ তর্ক বড় নয়, বড় কমল নিজে। এই কারণেই 'শেষপ্রশ্নে' কমলের উপযুক্ত প্রতিপক্ষ নেই, যে অক্ষয়ের মতো শুধু লাফালাফি না করে সমানভাবে তর্ক চালাতে পারে। এই কারণেই কমল হবিষ্য করে, তার কথায় ও কাজে যে অসামঞ্জস্য তা বহু সমালোচককে বিচলিত করেছে। নইলে কমলের মতো সংস্কার-বর্জিতা রূপসীর দারিদ্র্যে আমিও বিশ্বাস করতাম না।

কিন্তু কমলের হৃদয়কে শরৎচন্দ্র ভুলে থাকেন নি, 'শেষপ্রশ্নের' অন্যান্য নর-নারীর মতো কমলের মর্মকোষের পরিচয় যথারীতি অভিব্যক্তি লাভ করেছে। না হলে 'শেষপ্রশ্নে' রসাভাব ঘটত। কিন্তু পূর্বেই বলেছি 'শেষপ্রশ্নে'র রস-সংযম অসাধারণ, ফেনিল উচ্ছ্বাসের মধ্যে সে রসসৃষ্টি নিজেকে সস্তা করেনি।

আপনার কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে অজিত আর কমল যখন কাছাকাছি এসে পড়েছে, আপনারা তখন তাদের লক্ষ্য করেছেন?

টেকনিক বলুন, লেখকের রসবোধের গভীরতা বলুন, আর অবস্থা চরিত্র ও প্রকাশভঙ্গীর উপর লেখকের সহজ কর্তৃত্বই বলুন,—এইগুলি ছায়ার লিটারেচারের লক্ষণ ও ধর্ম। 'শেষপ্রশ্নে' এ-সমস্তের সমাবেশ যদি আবিষ্কৃত ও প্রশংসিত না হয়, যদি অর্থহীন নিন্দা ও যুক্তিহীন প্রশংসার মধ্যে 'শেষ-প্রশ্নে'র সমালোচনা সীমাবদ্ধ থাকে, বাংলার সাহিত্যরসিকদের পক্ষে সে বড় লজ্জার কথা হবে। নির্মম বিশ্লেষণ ও নিরপেক্ষ বিচার সহ্য করবার ক্ষমতা 'শেষপ্রশ্নে'র আছে।

'শেষপ্রশ্ন' সম্বন্ধে আমার যা বলার ছিল তার কিছুই বলা হল না, উপরন্তু সংক্ষেপে বলার অপরাধ হল। কিন্তু 'শেষপ্রশ্নে'র বিশদ আলোচনা ভবিষ্যতে করা চলবে। 'শেষপ্রশ্ন' যে ভাল বই, আসধারণ ভাল বই, শরৎ-বন্দনা উপলক্ষে এই কথাটি বলে নেবার সুযোগ আমি ছাড়তে পারলাম না।

# শরৎচন্দ্র—ক্রমোপলব্ধিতে

**সজনীকান্ত দাস**

বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের পরে তথাকথিত 'অতি-আধুনিক সাহিত্য' লইয়া যে কোন্দলের সৃষ্টি হয়, তাহারই একটা মীমাংসার জন্য রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য-ধর্ম' প্রবন্ধ লেখেন। শরৎচন্দ্র প্রতিবাদে অতি-আধুনিকদের সমর্থনে 'সাহিত্য-ধর্মে'র জের টানেন ও ফলে শনির কোপদৃষ্টিতে পতিত হন। আমি যৌবনের হঠকারিতাবশে শরৎচন্দ্রের বিরোধিতা করিয়াছিলাম। পুরা ইতিহাস আমার 'আত্ম-স্মৃতি'তে দিয়াছি। এই সাময়িক বিরোধিতা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের প্রতি আমার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল এবং তাহা শরৎচন্দ্রও অনুভব করিতেন। আমি বিশ্বাস করিতাম, বাঙলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব আকস্মিক হইলেও স্থায়ী ফলপ্রসূ, তাঁহার ভাষ্য অনবদ্য এবং তাঁহার সৃষ্ট নারী-চরিত্রগুলি অসাধারণ। তবে ইহাও মনে ভাবিতাম যে, তাঁহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল, তাঁহার সৃষ্ট জগতের পরিধি খুব বড় ছিল না; প্রধানত হাওড়া-হুগলী জেলার নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত রাঢ়ী ব্রাহ্মণসমাজের জীবনরহস্য উদ্‌ঘাটনেই তিনি পটুতা দেখাইয়াছেন; কলিকাতার শিক্ষিত বিলাতফেরত অথবা ব্রাহ্মসমাজ লইয়া যেখানেই কারবার করিতে গিয়াছেন সেখানেই তাঁহার অনধিকারচর্চার ত্রুটি ধরা পড়িয়াছে।

একথা আজ অস্বীকার করিব না যে, শরৎচন্দ্রের জীবনদর্শন বা শরৎ-সাহিত্যের মূল তত্ত্বকথা লইয়া আমি তখন একেবারেই মাথা ঘামাই নাই। এ বিষয়ে আমাকে প্রথম সচেতন করেন স্বর্গত কবি মোহিতলাল মজুমদার। শরৎচন্দ্রের জীবনদর্শনের একটা রূপ তিনি নিজে মনে মনে স্থির করিয়া লইয়াছিলেন এবং আমাকেও সেই রূপের প্রতি শ্রদ্ধাবান করিতে চেষ্টা পাইতেন। এ বিষয়ে তাঁহার বিশদ আলোচনা অবশ্য বহু পরে তৎসম্পাদিত নব 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তবে তিনি 'শনিবারের চিঠি'তে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য বিশ্লেষণ করিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার 'নারী-স্তোত্র' কবিতাতেও শরৎচন্দ্রের রাজলক্ষ্মী চরিত্রকে খুব উচ্চ স্থান দিয়াছিলেন। আমি এই সকল বাগ্‌জালের মধ্যে তখন দার্শনিক শরৎচন্দ্রকে খুঁজিয়া পাই নাই, তবে কথাকার শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির অনেক সূক্ষ্ম রস মোহিতলালের দৃষ্টিতে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলাম। সবকিছু সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রকে মনে হইত কথা ও ভাষার জাদুকর মাত্র। যতক্ষণ সামনে থাকেন একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখেন, কিন্তু তাঁহার প্রভাব এড়াইয়া একটু চিন্তা করিতে বসিলেই মনে হয়

তিনি ইন্দ্রজালের আম খাওয়াইয়া সকলকে তাজ্জব বানাইয়াছেন। আসল আম তাঁহা হইতে বহু দূরে।

এইরূপ অবস্থায় ১৯৩৮ সনের ১৬ জানুয়ারি, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ২রা মাঘ রবিবার তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তখন তাঁহার সম্বন্ধে নূতন করিয়া চিন্তা করিবার অবকাশ পাই। আমার সেই চিন্তাধারা ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'র 'প্রসঙ্গ কথা'য় বিধৃত হইয়া আছে। উদ্ধৃত করিয়া শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আমার ধারণার ক্রমবিকাশ দেখাইতেছি ঃ

"বিগত কিছুদিন শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর জন্য দেশবাসী একরূপ প্রস্তুত হইয়াই ছিল ; ১৬ই জানুয়ারি তারিখে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু তাঁহাকে আমাদের মধ্য হইতে সরাইয়া লইয়াছে। বাঙলা-ভাষাভাষী জনগণের অন্তরের মধ্যে তিনি কতখানি রহিলেন এবং কতখানি বিদায় লইলেন, অতঃপর তাহার একটি সঠিক হিসাব-নিকাশ হইবে। তাঁহার নশ্বর দেহটাই গিয়াছে—বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে তাঁহার যাহা দেয় তিনি নিজের তাগিদে তাহা দিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যের ইতিহাসের অঙ্গীভূত হইয়া সেগুলি চিরদিন আপন মর্যাদায় রহিয়া গেল। তাঁহার সাহিত্যিক উত্তরাধিকারী হিসাবে আমাদের শোক করিবার কারণ নাই। তাঁহার স্বল্পপরিসর সাহিত্যজীবনে তিনি যেমন আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া যাইতে পারেন নাই, অনাগত অনন্ত ভবিষ্যৎ পর্যন্ত আমরা তেমনই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে বাধ্য থাকিব।

"শরৎচন্দ্রের পূর্বগামীদের তুলনা করিলে তাঁহার একটি বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে—তাঁহার আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠার আকস্মিকতা; তিনি দিগ্বিজয়ী বীরের মতো ভিনি ভিডি ভিসি বলিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; অন্য সকলের মতো তিলে তিলে খ্যাতি ও যশের দুর্গম দুরারোহ পথে তাঁহাকে আমরা অগ্রসর হইতে দেখি না। তাঁহার গোপন অধ্যবসায় এবং নিভৃত ঐকান্তিক সাধনা আজিও গোপন আছে : মাসিক পত্রিকা বা পুস্তকগত ইতিহাসে তাহা লিপিবদ্ধ নাই। সে হিসাবে তাঁহার সাহিত্যসাধনার ইতিহাস অনন্যসাধারণ ; বৃন্তহীন পুষ্পের মতো তিনি আপনাতে আপনি বিকশিত হইয়া সহসা একদিন রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের পরিপূর্ণতায় জনগণের সম্মুখে প্রকাশ পাইয়াছেন এবং সেই দিনই দেশের চিত্ত জয় করিয়াছেন। তাঁহার সেই প্রথম দিনের খ্যাতি শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল বলিয়াই মনে হয়, তাঁহার নিভৃত সাধনার মধ্যে ফাঁকি ছিল না। এই জন্য এই অতীত এবং বিস্মৃত ইতিহাস জানিবার জন্য আমাদের এত লোভ। তাঁহার দু-একজন আত্মীয়বন্ধু মাঝে মাঝে এই রহস্য-যুগের দ্বারোদ্ঘাটনের চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ সুষ্ঠু ইতিহাস আজিও আমাদের অজ্ঞাতে থাকিয়া রহস্যের উদ্রেক করিয়া থাকে।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যপ্রতিভার পরিধি খুব বিস্তৃত নয়। তিনি একতারা হাতে

বাঙালী গৃহস্থের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত দরদ দিয়া আজীবন সেই একতারাটিই বাজাইয়া গিয়াছেন; এত ভাল বাজাইয়াছেন যে, অর্ধনিমীলিত নেত্রে শুনিতে শুনিতে আমাদের মনে বারংবার সন্দেহ জাগিয়াছে, বুঝি বহুতার বীণাধ্বনি শুনিতেছি। তাঁহার অপরিসর পরিধির গভীরতা স্থানে স্থানে এমন ব্যাপক ও দুরবগাহ যে বিভ্রান্ত শ্রোতা বিমুগ্ধচিত্তে অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্যের অনেক কম বা অধিক দিয়া বসিয়াছে, ফলে তাঁহার জীবিতকালে তাঁহার সাহিত্যিক দানের যথার্থ মূল্য বিচারে অনেক বাদানুবাদ ও ভুল-ভ্রান্তি ঘটিয়াছে। কিন্তু সকল ভুল-ভ্রান্তি, বাদানুবাদ এবং বৈঠকী কচকচি সত্ত্বেও তিনি দেশের মর্মস্থলে ধীরে ধীরে আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন এবং সেখানে এমন একটি স্নেহের ও প্রেমের আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন যেমনটি আর কোনও বাঙালী লেখকের ভাগ্যে ঘটে নাই। সে হিসাবে শরৎচন্দ্র বাঙালী সাহিত্যিক সমাজে সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান।

"বাঙলাদেশে এমন একদিনও গিয়াছে যে-দিন তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে শরৎচন্দ্র অপাংক্তেয় ছিলেন—কালেজী শিক্ষিত ভদ্রলোক তাঁহার নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন ; রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একসঙ্গে তাঁহার নাম করাও দোষের ছিল। পৃথিবীর সর্বত্র সাধারণত দেখা যায়, উচ্চ সাহিত্যিক-প্রতিভা উচ্চতর হইতে ধীরে নিম্নস্তরপ্রসারী। শরৎচন্দ্রের বিপরীত প্রতিভা বিপরীত মুখে কাজ করিয়াছে—নিম্নস্তর হইতে তিনি ধীরে ধীরে উচ্চস্তরকে সংক্রামিত করিয়াছেন এবং তাঁহার জীবিতকালেই তিনি প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন, যে দেশের উচ্চশিক্ষিত ভদ্রসমাজ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, এমন কি, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাঁহাকে সমাদরে স্বীকার ও গ্রহণ করিয়াছেন। নিছক সাহিত্যপ্রতিভার এমনতর অবিমিশ্র সম্মান বাঙলাদেশের বহু পতিত সাহিত্যিকের মনেই অপরিসীম আশার উদ্রেক করিয়াছে এবং আজও করিতেছে। সাহিত্যকে এমন মর্যাদা আর কেহ দিতে পারে নাই। তাই রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সেদিন শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয়রহস্যে। সুখে-দুঃখে মিলনে-বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন, বাঙালী যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তাঁর অফুরান আনন্দে, যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা সুখী হয়েছে এমন অন্য কারো লেখায় তারা হয় নি। অন্য লেখকেরা অনেক প্রশংসা পেয়েছে ; কিন্তু সর্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায় নি।'

"এই বহু নিন্দিত এবং বহুপ্রশংসিত সাহিত্যপ্রতিভা শরৎচন্দ্রের আকস্মিক বিয়োগে আজ বাঙালীসমাজ মুহ্যমান। অদূর ভবিষ্যতে নিন্দা ও প্রশংসার অতিবাদমুক্ত শরৎচন্দ্র বাঙলার সাহিত্যগগনে আপনার যথার্থ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত

হইবেন এ সম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয় বলিয়াই সেই মৃত প্রতিভার উদ্দেশে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া ধন্য হইতেছি।”

ইহার পরবর্তী কালে শরৎচন্দ্রের যে-সকল রচনা পড়িয়াছি, বিশেষ করিয়া শরৎচন্দ্রের যাবতীয় চিঠিপত্র ও গদ্য-প্রবন্ধ সংকলনকার্যে স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহায়তা করিতে গিয়া তাঁহার সাহিতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক মতবাদের সঙ্গে আমার যে পরিচয় ঘটিয়াছে, তাহাতে তাঁহার সাহিত্যের মূল্যবিচারে আমাকে নূতন করিয়া ভাবিতে হইয়াছে। আমার ক্রমশ এই উপলব্ধি জন্মিয়াছে যে, শরৎচন্দ্র ধূমকেতুর মতো বাঙলার সাহিত্যাকাশে আবির্ভূত হইয়া বিস্মৃত বা অজ্ঞাতলোকে বিদায় লইবার জন্য আসেন নাই। বাঙলাদেশ ও সাহিত্য ব্যাপারে তাঁহার বিধাতৃনির্দিষ্ট একটা ভূমিকা ছিল, তিনি একটা ‘মিশন’ লইয়া আসিয়াছিলেন। সে ‘মিশন’ কি তাহা মনে মনে দীর্ঘকাল আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু প্রবন্ধাকারে কখনই লিপিবদ্ধ করিতে পারি নাই।

ইতিমধ্যে মোহিতলাল শরৎচন্দ্রের ‘শ্রীকান্ত’ লইয়া তাঁহার ধারণামত বিশ্লেষণ মাসের পর মাস নবতম পর্যায় ‘বঙ্গদর্শনে’ করিতে থাকেন। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে নানা গবেষণামূলক, তথ্যানুসন্ধী চিন্তার উদ্রেককারী গ্রন্থও প্রকাশিত হইতে থাকে। আবার আজগুবি গাল-গল্প ও তাঁহার জীবনের সম্পূর্ণ কল্পিত কাহিনী জীবনী হিসাবে কয়েকটি প্রকাশিত হয়। সেইগুলি পাঠে শরৎচন্দ্রের আসল সত্তা উদ্ভাসিত হওয়া দূরে থাকুক, আরও জটিল হইয়া উঠে। তবে এই ধারণাটা স্পষ্ট হয় যে শরৎচন্দ্র, অর্থাৎ মানুষ শরৎচন্দ্রের প্রকৃতি অতিশয় জটিল ছিল। সাধারণ কথায়-বার্তায় তাঁহার মনের ভাব তিনি গোপন করিবারই প্রয়াস করিতেন এবং সেই ব্যপদেশে তাঁহার জীবনের সহিত জড়াইয়া এমন সব গাল-গল্পের অবতারণা স্বয়ং করিতেন, যাহা সম্পূর্ণ স্বকপোলকল্পিত, তাহাতে বাঙলার ব্যঙ্গ-রহস্য সাহিত্য সমৃদ্ধ হইতে পারে কিন্তু জীবনী-সাহিত্য নয়।

আমার নিজস্ব অনুভূতি শেষ পর্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের ৩১শে ভাদ্র তারিখে তাঁহার জন্মদিনে অর্থাৎ পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্যের প্রায় বারো বৎসর পরে তিনটি চতুর্দশপদী কবিতার আকারে আত্মপ্রকাশ করে। তখন শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু লিখিবার কোনও তাগিদই কোন দিক হইতে ছিল না : ইহা আমার শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে দীর্ঘ একযুগের মানসিক অনুশীলনের পরিপূর্ণ ফল। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আমার ক্রমবিকশিত আত্মোপলব্ধির পরিচয়স্বরূপ সেই সনেট তিনটিও উদ্ধৃত করিতেছি :

প্রেমের কাঙাল তুমি, পাও নাই প্রাণের দোসর—
তাই ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে যাহা কিছু এসেছে সম্মুখে
ব্যগ্র তব ভালবাসা ; বাঁধিতে পারনি তুমি ঘর,
অমৃতের ভাণ্ড হাতে চিত্ত তব মরিয়াছে ভুখে।

নিজে যাহা পাও নাই, পাইয়াছ তাহারি সন্ধান
এ বঙ্গের ঘরে ঘরে ; রোগজীর্ণ পল্লীর কুটীরে
নগর-প্রাসাদে—হেরি বিধাতার এই শ্রেষ্ঠ দান
করিয়াছ ধন্য ধন্য, তিতিয়াছ নয়নের নীরে।

রাজলক্ষ্মী বিন্দু রমা—তোমারি সে অমৃত-চয়ন,
সাবিত্রী অভয়া শৈল নারায়ণী কুসুম পার্বতী—
মর্ত্য হতে পারিজাত তুলি মালা করিলে বয়ন :
সে মালা পরিয়া গলে ধন্য হল বঙ্গের ভারতী।
ঐশ্বর্যের মাঝখানে নিজে তুমি রহিলে ভিখারী,
গৃহহীনে দিয়ে ঘর আপনি রহিলে পথচারী॥

বৃহতে সুন্দর করি দেখায়েছে বহু মহাকবি,
মহত্ত্বের পদতলে করেছে প্রণাম নিবেদন :
এঁকেছে সযত্নে তাই সহজে যা চোখে পড়ে ছবি
হৃদয়-রঞ্জন করি আছিল যা নয়ন-রঞ্জন।
সূক্ষ্মদৃষ্টি কবি, তুমি দেখাইলে ক্ষুদ্রের মহিমা,
পাতার আড়ালে কোথা ফুল হয়ে ফুটিয়াছে প্রেম :
দেখালে ব্রাহ্মণে শূদ্রে উচ্চে-নীচে স্নেহে নাই সীমা,
পতিতার বুকে তুমি খুঁজে পেলে নিকষিত হেম।

কোথায় মাছের শোকে কে দিল ধুলায় গড়াগড়ি,
গরুরে বাসিয়া ভাল ধন্য যে-বা কি জাত তাহার,
ভালবাসে তবু সে কে মনে তা জানে না ভাল করি,
নিরুপায় হাহাকারে বুক ফাটে কোথা বিধবার,
তুমিই দেখিলে কবি। দেখাইলে দৃষ্টিহীন জনে
ওঠে লক্ষ দীর্ঘশ্বাস শাস্ত্রে-বাঁধা বঙ্গের প্রাঙ্গণে॥

মধ্যবিত্ত বাঙালীর কবি তুমি তোমারে প্রণাম :
বাঙালীর গৃহকবি, তোমারে জানাই নমস্কার—
রচিলে তাদের গাথা, ইতিহাসে নাই যার নাম,
নিঃশব্দে মরিছে যারা তারা ধন্য কৃপায় তোমার।

আমাদের হিংসা-দ্বেষ আমাদের প্রেম-ভালবাসা,
নীচতা ক্ষুদ্রতা আর মহত্ত্ব মিলিয়া সব-কিছু
আমরা যা সত্য, নিয়ে সুখ-দুঃখ হতাশা ও আশা
কেহ বা উচ্চেতে রই কেহ মোরা পড়ে থাকি নীচু—

সাহিত্যের রাজপথে আমাদের মুক্তি দিলে আনি,
দেখালে মানুষ সত্য—তার চেয়ে সত্য কিছু নাই ;
সে সত্য প্রকাশ করে যুগে যুগে সে শাশ্বত বাণী
তুমিও অমর হলে সে বাণীর সেবা করিয়াই।
তব শুভ জন্মদিনে তোমারে স্মরণ করিলাম,
বিলম্বিত বন্দনা এ, লহ কবি, ভক্তের প্রণাম ॥

৩১ ভাদ্র, ১৩৫৬

ইহার পরও দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে. আজ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দের ৩১শে ভাদ্র শরৎচন্দ্রের জন্মদিন। আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে শরৎচন্দ্রের যে জীবন-দর্শন এই সনেট তিনটিতে প্রকাশ পাইয়াছিল, এই দশ বৎসরে তাহা আমার মনে আরও নির্দিষ্ট আকার লইয়াছে। শ্রীমান গোপাল ভৌমিক তৎসম্পাদিত এই 'শরৎ-স্মরণী' সংকলনে তাহা লিপিবদ্ধ করিবার সুযোগ আমাকে দিলেন বলিয়া তাঁহাকে এবং এই 'দিশারী' প্রতিষ্ঠানকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

শরৎচন্দ্র বাঙালী পাঠকসমাজের হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বর। কেন? অগাধ পাণ্ডিত্য, নিপুণ বিশ্লেষণী প্রতিভা. ফোটোগ্রাফিক বাস্তব দৃষ্টি তাঁহার ছিল না। হিত, মনোহারী ও দুর্লভ বচন তিনি বলিতে পারেন না। তাঁহার শালীনতাবোধ উচ্চশিক্ষিত শহুরে ড্রইং রুম-বিলাসীদের অস্বাভাবিক শালীনতা নয়। তাঁহার রুচি অত্যন্ত দুরূহ ও বিপজ্জনক পরিবেশে তাঁহার বর্ণনাকে সাঙ্কেতিক ইঙ্গিতমাত্রে পর্যবসিত করে নাই, যতটুকু না বলিলে সাধারণ মানুষের মর্মগ্রাহী হয় না, ততটুকু তিনি অবাধে পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন ; তাঁহার সাহিত্যজীবনের গোড়ার দিকে এই কারণেই রুচিবাগীশেরা তাঁহাকে রুচিহীনদের দলে ফেলিয়াছিলেন।

জ্যামিতিক ও আঙ্কিক বিচারে তাঁহার কাহিনী নিখুঁত নহে। তাঁহার পুরুষ-চরিত্র শৌর্যে-বীর্যে মহিমান্বিত হইয়া উঠে নাই। তিনি সর্বত্র পরকে আপন করিবার কৌশলই দেখাইয়াছেন, আপনাকে আপন করিয়া রাখিবার পথ তিনি দেখাইতে পারেন নাই। তিনি বারবার একই নারী-চরিত্রের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।

এ সকলই সত্য, তথাচ তিনি বাঙালীর হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বর। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীর উচ্চশিক্ষাভিমানী নাস্তিক মানুষদের সহজ আত্মনিবেদনের পথ-সন্ধান দিয়া তাহাদের অন্তরের জ্বালা ও হাহাকার নিবারণ করিয়াছিলেন; যে অত্যুচ্চ জ্ঞানমার্গে রামমোহন, কৃষ্ণমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, রাজেন্দ্রলাল, ভূদেব, বঙ্কিম বাঙলাদেশের যুবসম্প্রদায়কে লইয়া গিয়াছিলেন, সেখানকার বায়ু-প্রবাহহীন নির্জনতা ও নৈঃশব্দের মধ্যে যাঁহারা হাঁপাইয়া উঠিয়াছিলেন, পরমহংসদেবের বাণী তাঁহাদিগকে যেমন সাধারণ মানব-ভূমিতে নামাইয়া সান্ত্বনা, আশা ও আনন্দের সন্ধান দিয়াছিলেন, শরৎচন্দ্রও তেমনি বাঙলাসাহিত্যকে মস্তিষ্কের অভ্রংলিহ নিরালম্ব লোক হইতে আশা-আনন্দ-পুলক-বিস্ময়-হিংসা দ্বেষ এবং সর্বোপরি মান-অভিমান ও ভালবাসার সমাজ-ভূমিতে নামাইয়া সেখানেই প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছেন। ইহাই তাহার বাঙালী পাঠকের হৃদয়-জয়ের একমাত্র কারণ। সে দিক দিয়া তাঁহাকে বাঙলার নবযুগের সাহিত্যের অবতার বলা চলে।

আর-এক কথা, শরৎচন্দ্রের খ্যাতি দিনে দিনে বাড়িয়া চলিয়াছে। আধুনিক যুগের কৃতী কথাকারেরা এখনও তাঁর সমকক্ষ হইয়া উঠিয়া তাঁহার যশোভাতি ম্লান করিতে পারেন নাই। ইহার প্রধান কারণ ইঁহাদের মস্তিষ্ক ও হৃদয় এখনও পরস্পর সংঘর্ষ করিতেছে, সামঞ্জস্যবিধানের একটি ফরমুলা তাঁহারা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। শরৎচন্দ্র পারিয়াছিলেন, যদিও তাঁহার ফরমুলায় হৃদয়ের ভাগ একটু বেশিই ছিল। পৃথিবীর সাহিত্যে একটা লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে যাঁহারা উচ্চস্তর হইতে ধীরে ধীরে সমাজের নিম্নভূমিতে অবতরণ করেন, অর্থাৎ যাঁহাদের যশ পণ্ডিতজনের সমর্থনে অপণ্ডিত সমাজে প্রচারিত হয়, কালপ্রবাহ তাঁহাদের সেই যশ খানিকটা ধুইয়া-মুছিয়া যায়। কিন্তু নিম্নস্তরের অর্থাৎ সমাজের ভিত্তিভূমির হৃদয় জয় করিয়া যাঁহাদের যশ ঊর্ধ্বগামী হয় তাঁহাদের মার নাই। আগে তাঁহারা জনসাধারণের মনে প্রবেশ করেন পরে তাঁহাদের লইয়া পণ্ডিতেরা বিশ্লেষণ-বিচারাদি করিয়া তাঁহাদের প্রতিষ্ঠাকে ব্যাকরণসম্মত করিয়া তোলেন। বিচারে ব্যাকরণ-লঙ্ঘনের অপরাধও যদি প্রমাণিত হয় তাহাতে ইঁহাদের খ্যাতির কমতি হয় না। শরৎচন্দ্র এই শেষোক্ত শ্রেণীর জনগণহৃদয়হারী স্রষ্টা—পণ্ডিতদের হাতে মার খাইবার ভয় আর তাঁহার নাই।

# শরৎচন্দ্র

**সোমনাথ মৈত্র**

সাহিত্য খেলা নয়, শৌখীনতা তো নয়ই। সাহিত্য জীবনেরই প্রকাশ, আবার নবজীবনেরও ভিত্তি। বড় লেখক তিনিই যিনি দেন জীবন গড়ার উপাদান, আর তিনি ধন্য যিনি নিজের চোখে দেখে যান তাঁর দেওয়া উপাদান জীবন-গঠন কাজে লাগল।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসাধনা তাই ধন্য, কেননা বাংলাদেশে আজকের দিনে শরৎচন্দ্রের প্রভাব অপ্রতিহত, শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, বাঙালীর জীবনেও। যাঁর প্রভাব শুধু লিটারারি নয়, নিছক সাহিত্যের গণ্ডী পেরিয়ে যাঁর লেখা দেশের জীবনধারার সঙ্গে এসে মিশেছে, সে-স্রোত যেখানে ক্ষীণ তাকে স্ফীত করেছে, যেখানে অবরুদ্ধ তাকে নূতন পথে চালিয়ে গতি দিয়েছে, সে লেখকের দান ব্যক্তিগত ভালোলাগা মন্দলাগার উপরে তো বটেই, সমালোচনার চুলচেরা বিচারও এ ক্ষেত্রে আর খাটে না।

শরৎচন্দ্রকে এখন আর যাচাই করা চলবে না, তাঁকে মেনে নিতে হবে। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, হাজার হাজার বাঙালী নরনারীকে তিনি আনন্দ দিয়েছেন। আর সে আনন্দ কেবল মুহূর্তমাত্রের নয়, তা গভীর, তাই বাঙালীর জীবনকে তা স্পর্শ করেছে, তার কথায় কাজে নিজেকে প্রকাশ করেছে, আবার কখনও বা তার চোখের ঠুলি দিয়েছে ছিঁড়ে।

এইখানেই তাঁর শক্তি: তিনি বাঙালীকে যখন আঘাত করেছেন তখনও তার মন কেড়েছেন। জনপ্রিয় হবার জন্যে তিনি সত্যকে খাটো করেন নি। বাংলার পল্লীকে তিনি সৌন্দর্য আর স্বাস্থ্যের আবাস বলে আঁকেন নি, বাঙালীর সামাজিক ব্যবস্থাকে অনাদি, অনন্ত, সনাতন মনে করে কোথাও ভক্তিগদগদ হয়ে ওঠেন নি। লোকে যাদের বড় করেছে তিনি তাদের বড় বলেই সর্বদা মেনে নেননি, যাদের লোকে করেছে ঘৃণা, তারা সেইজন্যে যে তাঁর কাছেও ঘৃণিত হয়েছে, তা নয়। লাঞ্ছিত, অবজ্ঞাত মানুষেরও মনুষ্যত্ব তিনি দেখেছেন, তাঁর প্রতিভা পাঁকেও পদ্ম ফুটিয়েছে।

অথচ তিনি জনপ্রিয়। এইটেই বিস্ময়ের কথা, এবং এইটেই আনন্দেরও কথা। যাকে ভালোবাসি না, তার কথাও আমরা শুনি না, ভালো কথা হলেও। শরৎচন্দ্রকে বাঙালী ভালোবেসেছে, তাই তাঁর ভর্ৎসনায় সে রাগেনি, সে লজ্জিত হয়েছে, নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে, তার আত্মসর্বস্ব সবজান্তা ভাব পরিহার করেছে, জগৎটাকে নূতন চোখে দেখতে চেষ্টা করেছে।

কী দিয়ে, তবে, তিনি দেশের মনোহরণ করলেন? আমার মনে হয়, জন-সাধারণ তাঁকে তাদেরই একজন বলে গোড়া থেকেই চিনল, তাই আত্মীয়তার মধুর বন্ধনে অল্প সময়েই তাঁর কাছে ধরা দিল, তিনি যে-কথা বললেন তা তাদেরই পরিচিত, ঘরোয়া জীবনের কথা, তারা দেখলে তাঁর পাত্রপাত্রী তাদেরই ভাই, বোন, স্বামী, স্ত্রী। অপরিচিত কোনো বিশাল জগতের, বা অননুভূত কোনো বিরাট সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার আভাসে তাদের ধাঁধা লেগে গেল না। তারা পেল তাদেরই আপন জীবনকাহিনী, সহজ করে সরল করে বলা। যে-সব মনের দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সন্দেহ, আবেগের বিশ্লেষণ তারা পেল, সে কোনো অসাধারণ সূক্ষ্ম মন নয়, তাই কোথাও তাদের কিছু অবোধ্য বলে ঠেকল না। যে অন্যায় ও অত্যাচারে তাঁর দেশবাসী নিত্যপীড়িত, যুগসঞ্চিত যে ধূলিমালিন্যে তাদের সামাজিক ব্যক্তিজীবন অন্ধকার, শরৎচন্দ্র যখন তারই ব্যথা তাদের মনে নূতন করে জাগিয়ে দিলেন, অসাড় মনও যেন সাড়া দিল। সুতরাং শরৎচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিপত্তি তাঁর একান্ত সাধারণত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

সাধারণ অভিজ্ঞতাকে তাঁর প্রতিভা যেমন অপূর্ব করে তুলেছে, তাঁর ভাষাকে তেমনি করেছে বিষয়ের উপযোগী। এ-ভাষা যেমন সরল তেমনি সবল, যেমন স্বচ্ছ তেমনি মধুর। শব্দ বা বাক্যযোজনায় কোথাও কোনো চাতুরী নেই, চমকপ্রদ হবার চেষ্টামাত্র নেই; নূতন শব্দসৃষ্টি, কিংবা লেখার কোনো অভিনব ভঙ্গী বা কায়দা কোথাও চোখে পড়ে না। প্রকাশের জন্য যেন কোনো প্রয়াস নেই, তাই বুঝতেও কোনো পরিশ্রম হয় না। তাঁর ভাষার পথে পদে পদে পাঠককে হোঁচট খেতে হয় না, সে-পথ দুর্গমও নয় বন্ধুরও নয়, যে চলতে গেলে হতে হবে গলদঘর্ম। এই অতি সহজ ভাষা লোকের হৃদয়ে তাঁকে অতি সহজেই প্রবেশাধিকার দিয়েছে।

কিন্তু জনমনের মধ্যে প্রবেশ পাওয়া এক কথা, আর সেখানে চিরদিনের আসন পাতা আরেক কথা। শরৎচন্দ্রের বিষয় ও ভষা তাঁর প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ। প্রধান কারণ নয়। ওগুলো তাঁর পরিচয়পত্র, যা দিয়ে লোকে জানল তিনি শত্রু নন মিত্র, পর নন ঘরেরই। কিন্তু আত্মীয়তার দাবি তিনি পাকা করেছেন তাঁর ভালোবাসা দিয়ে। তিনি যাদের কথা বলেছেন, যাদের তুচ্ছ জীবনের হাসিকান্নাকে তাঁর লেখায় অমরতা দিয়েছেন, তাদের যে তিনি শুধু জেনেছেন তাই নয়, তাদের তিনি ভালোবেসেছেন। শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের সর্বপ্রধান লক্ষণই এই সমবেদনা। যার মনের এই প্রসার নেই, এই সহজ ঔদার্য নেই, শ্রেণীবিশেষের বা জাতিবিশেষের উপর যার মনে নির্বিচার বিরূপতা, সে আমাদের বিস্মিত করতে পারে বুদ্ধির উজ্জ্বলতায়, চমৎকৃত করতে পারে লিপিকৌশলে, কিন্তু কোনোদিন আমাদের মন তাকে আপন বলে

অন্তরঙ্গ বলে মানবে না। শরৎচন্দ্র বাংলাদেশের হৃদয় অধিকার করেছেন তাঁর এই সমবেদনা দিয়ে মূঢ় দুর্বল মানুষের প্রতি তাঁর এই অপরিসীম করুণা দিয়ে।

# মানুষ শরৎচন্দ্র

জলধর সেন

পরম প্রীতিভাজন শ্রীমান্ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বয়স ছাপ্পান্ন পূর্ণ হয়ে আজ সাতান্নয় পড়ল। এই শুভদিনে, শুভ উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করবার জন্য শরৎ ভক্ত সাহিত্যিকগণ এই শরৎ-বন্দনার আয়োজন করেছেন। এই উৎসবে যোগদান করবার জন্য এই রোগজীর্ণ বৃদ্ধকে বন্দনা-সমিতি আহ্বান করেছেন। তাঁরা যদি আমাকে আহ্বান নাও করতেন, তা হলেও আমি, যেখানে থাকি না কেন ছুটে আসতাম--আমি যে শরৎচন্দ্রকে ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি; এবং আর কারও চাইতে কম করিনে, এ কথা স্পর্ধার সঙ্গে বলতে পারি। তাই আমি আজ এখানে উপস্থিত হয়েছি।

যিনি যখন শরৎচন্দ্রের কোন লেখা পড়েন, যেখানেই যে উপলক্ষে শরৎচন্দ্রের কথা ওঠে, সেখানেই তো তাঁর বন্দনাগীতি মুখর হয়ে ওঠে। তা হলেও আজ আর একবার, তাঁর এই জন্মদিনে বন্দনাগীতি গাইতে হয়—এ আমাদের চিরন্তন ব্যবস্থা।

আজ ষোল সতের বৎসর ধরে 'শরৎ-সাহিত্য' সম্বন্ধে অনেক আলোচনা গবেষণা হয়েছে, এখনও হচ্ছে, আজও হবে; অনেক বিশ্লেষণ ব্যবচ্ছেদ হয়েছে, আরও হবে। দুই-চার বার তুফানও উঠেছে। আমি নেপথ্যে দাঁড়িয়ে এ সবই সমভাবে উপভোগ করেছি, এবং হাতে তালি দিয়ে বলেছি "বাহোবা, বাহোবা, বাহোবা নন্দলাল!" আমার দৃঢ়বিশ্বাস, যা সত্য, যা শিব, যা সুন্দর, তার জয় হবেই,—শরৎচন্দ্র শরৎচন্দ্রই থাকবেন—নষ্টচন্দ্র হবেন না।

সুতরাং, শরৎ-সাহিত্য, তার সমালোচনা, তস্য সমালোচনা, বাদ-প্রতিবাদ, এ সকল থেকে আমি একেবারে দূরে দাঁড়িয়ে আছি। এ অবস্থায় আজ 'শরৎ-বন্দনায়' আমি কী বলব তা প্রথমে ভেবেই উঠতে পারিনি। তারপরে মনে হলো, সাহিত্যরথী শরৎচন্দ্রকে সাহিত্যিক ও সমালোচকগণের হাতে ছেড়ে দিয়ে মানুষ শরৎচন্দ্রের কথাই একটু বলি না কেন? তাই আমার এই প্রয়াস।

শরৎচন্দ্র যখন শিবপুরে থাকতেন, তখন, এবং এখন যে রূপনারায়ণতীরে দুর্গম স্থানে আছেন, সেখানেও অনেক সাহিত্যিকের সমাগম দেখেছি। আমাকেও প্রায়ই শরৎ-আলয়ে যেতে হতো,—সাহিত্যালোচনার জন্য নয়, অন্য উদ্দেশ্যে, ও-সব আলোচনা আমার ধাতে সয় না। সেখানে দেখতাম, কেউ জিজ্ঞাসা করছেন, "হাঁ মশাই, আপনি কিরণময়ীকে পাগল করলেন কেন?" কেউ কৈফিয়ত চাচ্ছেন, "আপনি অন্নদাদিদির আর খোঁজ-খবর নেননি কেন?" আবার হয়তো এক অর্বাচীন প্রশ্ন করলেন, "শেষপ্রশ্নের সমাধান কৈ?"

ইত্যাদি ইত্যাদি নানাবিধ প্রশ্নে শরৎচন্দ্রকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছেন। আমি দূরে বসে প্রসন্নবদন শরৎচন্দ্রের দিকে চেয়ে থাকতাম, আর ভাবতাম এ লোকটার সহিষ্ণুতা কী অসীম!

ও-সব কথা থাকুক, অন্য কথা বলি। শরৎচন্দ্রের একটা কুকুর ছিল—তিনি বিলাতী নহেন, খাঁটি দিশী। তার নাম ছিল ভেলু। শরৎচন্দ্র কুকুরটির এ নামকরণ কেন করেছিলেন, তা জানিনে। কুকুরটি দেখতে ছিল কদাকার, আর তার আচরণ ছিল অতি অভদ্র। যে কেউ শরৎচন্দ্রের শিবপুরের বাসায় গিয়েছেন, তিনিই জানেন যে, অভ্যাগতকে কী বিপুল গর্জনে ভেলু অভ্যর্থনা করত; শরৎ-দর্শনপ্রার্থিবৃন্দ ভেলুর এই সম্ভাষণে আত্মরক্ষার্থ দশ হাত পিছিয়ে পড়তেন। ভেলুর গর্জন শুনে শরৎচন্দ্র ঘরের মধ্য থেকে যেই বলতেন "এই ভেলু!" আর অমনি ভেলু মেষশাবকের মতো দৌড়ে গিয়ে প্রভুর কোলে চড়ে বসত। শরৎচন্দ্র তাঁর এই ভেলুকে যে কী ভালোবাসতেন, তা আর বলতে পারিনে। মনে হয় তাঁর শ্রীকান্তও রাজলক্ষ্মীকে অত ভালোবাসতেন না। শুধু ভেলু নয়, সমস্ত জীবজন্তুর উপর শরৎচন্দ্রের যে কী টান ছিল এবং এখনও আছে, তা অনির্বচনীয়।

সেই ভেলু একবার অসুস্থ হয়ে পড়ল। বাড়িতে যতরকম চিকিৎসা করা যেতে পারে, শরৎচন্দ্র তা করালেন, দু'হাতে অর্থব্যয় করতে লাগলেন। শেষে অনন্যোপায় হয়ে ভেলুকে বেলগেছিয়ার পশু-চিকিৎসালয়ে নিয়ে গেলেন—পাঠিয়ে দিলেন না। ভেলু যে কয়দিন সেখানে বেঁচে ছিল, শরৎচন্দ্র প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠে সেই চিকিৎসালয়ে গিয়ে ভেলুর পিঞ্জরপ্রান্তে বসতেন; সারাদিন স্নান আহার ত্যাগ করে ভেলুরদিকে সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে থাকতেন। রাত্রিতে যদি সেখানে থাকতে দেওয়ার আদেশ থাকত, তা হলে শরৎচন্দ্র অনাহারে অনিদ্রায় তাঁর ভেলুর পিঞ্জরপার্শ্বেই বসে থাকতেন। কিছুতেই তিনি ভেলুকে বাঁচাতে পারলেন না. তার মৃতদেহ শিবপুরে নিয়ে সমাধিস্থ করলেন। আমি সংবাদ পেয়ে সেইদিনই শিবপুরে গেলাম। আমাকে দেখে দৌড়ে এসে শরৎচন্দ্র আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন, "দাদা, আমার ভেলু আর নেই!" তাঁর মুখ দিয়ে আর কথা বের হলো না। এই আমার শরৎচন্দ্র! এই শরৎচন্দ্রকেই আমি চিনি, আমি জানি। এই শরৎচন্দ্রকে আজ আমি বন্দনা করছি!

আর-একটি ঘটনার কথা বলি। শরৎচন্দ্র তখনও শিবপুরে বাস করেন। একদিন প্রাতঃকালে আমি শিবপুরে শরৎচন্দ্রের কাছে গিয়েছিলাম। সেদিন রবিবার। আমি প্রায় প্রতি রবিবারেই শরতের বাসায় যেতাম, সারাদিন সেখানে কাটিয়ে রাত আটটা-নটায় কলিকাতায় ফিরে আসতাম।

সেদিন প্রাতঃকালে গিয়ে দেখি, ঘরের মধ্যে একরাশি ছোটবড় কলের ধুতি শাড়ি ছড়ানো রয়েছে। শরৎচন্দ্রের ভৃত্য সেগুলি গুছিয়ে বাঁধবার আয়োজন

করছে। শরৎ একখানি চেয়ারে বসে সম্মুখের টেবিলে আনি দুয়ানি, সিকি গনে গনে গোছাচ্ছেন। আমাকে দেখে বললেন, "দাদা, আমি এই দশটার গাড়িতে দিদির বাড়ি যাব। তা বলে আপনি চলে যাবেন না। যাবেন রাত সেই দশটায়।"

আমি বললাম, "দিদির বুঝি কোন ব্রত-প্রতিষ্ঠা আছে? তাই এত কাপড় নিয়ে যাচ্ছ, আর কাঙালী বিদায়ের জন্য ঐ আনি-দুয়ানি?"

শরৎ আমার দিকে চেয়ে বললেন "না দাদা, দিদির ব্রত-প্রতিষ্ঠা নয়।" এই বলেই তিনি চুপ করলেন, আসল কথা গোপন করাটাই তাঁর ইচ্ছা।

আমি বললাম, "ব্রত-প্রতিষ্ঠা নয়, তবে এত নূতন কাপড়ই বা নিয়ে যাচ্ছ কেন? অত সিকি-দুয়ানিরই বা কী দরকার।"

শরৎ অতি মলিনমুখে বললেন, দাদা, দিদির গাঁয়ের আর তার চা'রপাশের গাঁয়ের গরীব-দুঃখীদের যে কি দুর্দশা! তাদের পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, চালে খড় নেই। সে যে কি—" শরৎ আর কথা বলতে পারলেন না; তাঁর দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

এই আমার শরৎচন্দ্র! এই শরৎচন্দ্রকে আমি ভালোবাসি, ভক্তি করি। এই শরৎচন্দ্রকে আজ আমি বন্দনা করছি।

# শরৎচন্দ্রের 'চন্দ্রনাথ'

**ধীরেন্দ্র দেবনাথ**

## (১)

বাংলা কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাব চমকপ্রদ ঘটনা। যদিও পৈতৃক উত্তরাধিকার-সূত্রে তিনি গভীর সাহিত্যানুরাগ লাভ করেছিলেন এবং প্রথম জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আপন সাহিত্যরসসম্ভোগের তৃষ্ণা মিটিয়েছেন, অন্তরের অদম্য তাড়নায় নিজেও কিছু কিছু লিখতে শুরু করেছেন, তবু তখনও পর্যন্ত সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভের কথা ভাবতে পারেন নি। সম্ভবত দারিদ্র-লাঞ্ছিত পারিবারিক জীবনের প্রতিকূল পরিবেশ, উচ্চশিক্ষার অভাবজনিত সংকোচ, কলকাতার অভিজাত সাহিত্যিকমহলের সঙ্গে অপরিচয় প্রভৃতি কারণ এর পেছনে ছিল। তাই দেখি, সেকালের একটি বিশিষ্ট সাহিত্য-পত্রিকার মাধ্যমে এই নবীন লেখকের প্রথম আত্মপ্রকাশকে বাঙালী পাঠক যখন সাদরে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে, তিনি কিন্তু তখন সুদূর ব্রহ্মদেশে—নিছক জীবিকার্জনে ব্যাপৃত। এমন সম্ভাবনার ছবি তাঁর কল্পনায়ও ছিল না।

শরৎচন্দ্র সাহিত্যচর্চা শুরু করেন ষোল-সতের বৎসর বয়সে। কয়েকজন সমধর্মী বন্ধু মিলে এক সময়ে একটি হাতে-লেখা পত্রিকাও বের করেন। এর প্রধান লেখক ছিলেন শরৎচন্দ্র। ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসর বয়সে ভাগ্যান্বেষণে ব্রহ্মদেশ যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর রচিত গল্প-উপন্যাসের সংখ্যা পনেরোর কম নয়। কোনো রচনাই অবশ্য তখনও পর্যন্ত মুদ্রিত হয়নি। 'চন্দ্রনাথ' এই পর্বের রচনা।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প-উপন্যাসের সঙ্গেও শরৎচন্দ্রের পরিচয় ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের স্নিগ্ধ গার্হস্থ্য রস, নষ্টনীড়-চোখের বালি শ্রেণীর গল্প-উপন্যাসের অন্তর্মুখীন রচনারীতি তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। আপন রচনায় নিজস্ব শক্তি ও প্রবণতা অনুযায়ী এর প্রভাবও তিনি অঙ্গীকার করে নিয়েছেন। ১৯০৭ সালে যখন তাঁর অনুরাগী স্বজন-বন্ধুদের প্রচেষ্টায় 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর 'বড়দিদি' প্রকাশিত হতে শুরু করে, তখন লেখকের নামহীন সে রচনা রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে অনেকে প্রথমে ভেবেছিলেন। অবশ্য একটু খুঁটিয়ে দেখলেই রবীন্দ্র-রচনার মেজাজের সঙ্গে এর পার্থক্য ধরা পড়ে। কিন্তু একজন অজ্ঞাতপরিচয় লেখক প্রথম আবির্ভাবেই যদি কিছু-সংখ্যক পাঠকের মনেও এরূপ ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করতে পেরে থাকেন, সে গৌরব কিছু কম নয়।

'চন্দ্রনাথ' শরৎচন্দ্রের প্রথম যৌবনের রচনা। তাঁর বয়স তখন চব্বিশ-পঁচিশ। এটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় অনেক পরে। ইতিমধ্যে 'বড়দিদি'তে প্রতিষ্ঠালাভের পর বিভিন্ন পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের আরও কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়ে গেছে। তার মধ্যে 'বোঝা', 'কাশীনাথ', 'বাল্যস্মৃতি' প্রভৃতি প্রথম পর্বের রচনাও যেমন আছে, তেমনি 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে', 'পথনির্দেশ' প্রভৃতি নূতন রচনাও আছে। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসও অনেকটা লেখা হয়ে গেছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের অভিজ্ঞতা বেড়েছে, অনুভবশক্তিতে গভীরতা এসেছে, অন্যদিকে লিখতে লিখতে রচনারীতিও পরিণত হয়ে উঠছে। তাই পরবর্তী কালে পত্রিকায় প্রকাশের পূর্বে অল্প বয়সের রচনা 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসটির বহুল সংস্কার সাধনের প্রয়োজন শরৎচন্দ্র অনুভব করেছেন। যে সাহিত্যিক খ্যাতি তিনি অর্জন করেছেন, বাল্যরচনার দ্বারা তা যেন ক্ষুণ্ণ না হয়, সে বিষয়ে তাঁকে সতর্ক হতে হয়েছে।

'চন্দ্রনাথ' প্রকাশিত হয় 'যমুনা' পত্রিকায়। প্রথম রচনার প্রায় বার-তের বৎসর পরে পরিমার্জিত হয়ে ১৩২০ সনের (১৯১৩ খ্রীঃ) বৈশাখ থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত এটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। লেখা প্রকাশের ব্যাপার নিয়ে গোড়ায় বেশ গোলমাল হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের এক মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'যমুনা' পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করে 'চন্দ্রনাথ'-এর ধারাবাহিক প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাঁর অপর মাতুল সুরেন্দ্রনাথের এতে আপত্তি ছিল—তিনি পাণ্ডুলিপি দিতে রাজী হন নি। শরৎচন্দ্র তখন রেঙ্গুনে। ১৯১৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী যমুনা-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেনঃ—"'চন্দ্রনাথ' নিয়ে কি একটা বোধ করি হাঙ্গামা আছে, তাই বলি ওতে আর কাজ নেই।...চন্দ্রনাথ আর চাইবেন না। যদি দরকার হয় আমি আবার লিখে দেব। সে লেখা ভাল বই মন্দ হবে না।" ২৮শে মার্চ আর একটি চিঠিতে লিখেছেনঃ—"'চন্দ্রনাথ' ছাপাবেন না, কারণ যদি ছাপানই মনে হয় ত একটু নূতন করে দিতে হবে।" শেষ পর্যন্ত শরৎ-চন্দ্রের মধ্যস্থতায় একটি সুরাহা হয় এবং শরৎচন্দ্র মূল পাণ্ডুলিপির প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দিলে উপন্যাসটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ৩রা মে-র চিঠিটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্যঃ—"চন্দ্রনাথের যাহা পরিবর্তন উচিত মনে করিয়াছি, তাহাই করিয়াছি এবং ভবিষ্যতে এইরূপ করিয়াই দিব। চন্দ্রনাথ গল্প হিসাবে অতি সুমিষ্ট গল্প, কিন্তু অতিশয্যে পূর্ণ হইয়া আছে। ছেলেবেলা অন্ততঃ যৌবনে ঐরূপ লেখাই স্বাভাবিক বলিয়াই সম্ভব হইয়াছে। যাহা হউক, এখন যখন হাতে পাইয়াছি তখন এটাকে ভাল উপন্যাসেই দাঁড় করান উচিত। অন্ততঃ দ্বিগুণ বাড়িয়া যাওয়াই সম্ভব।...এই গল্পটির বিশেষত্ব এই যে কোন-রূপ immorality-র সম্ভব নাই। সকলেই পড়িতে পারিবে।"

শরৎচন্দ্রের এ চিঠিতে কয়েকটি সূত্রের ইঙ্গিত মেলে।

(ক) বাল্যরচনা 'চন্দ্রনাথ'-এর মধ্যে শরৎচন্দ্র বহু স্থলে আতিশয্য-দোষ দেখতে পেয়েছেন এবং সেগুলি যথাসাধ্য সংশোধন করেছেন।

(খ) 'চন্দ্রনাথ'-এর কাহিনীকে শরৎচন্দ্র পরবর্তী কালেও 'সুমিষ্ট' বলে মনে করেছেন এবং রচনাটি সম্পর্কে তাই তাঁর আগ্রহ বজায় রয়েছে।

(গ) অল্প বয়সের রচনাটিকে সংস্কার করে শরৎচন্দ্র 'ভাল উপন্যাসে' দাঁড় করাতে চেয়েছেন। সুতরাং পরিমার্জিত 'চন্দ্রনাথ' তাঁর দৃষ্টিতে একটি ভালো উপন্যাস।

(ঘ) সংশোধনের ফলে 'চন্দ্রনাথ'-এর আয়তনবৃদ্ধি ঘটেছে।

(ঙ) সাহিত্যে নীতি-দুর্নীতির প্রশ্নটি শরৎচন্দ্রের সামনে রয়েছে এবং 'চন্দ্রনাথ' যে কোনোরূপ দুর্নীতি প্রচার করছে না, এটি তাঁর পক্ষে স্বস্তিকর।

(চ) বৃহত্তর পাঠকসম্প্রদায় সম্পর্কে শরৎচন্দ্র যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। সুতরাং প্রথম যৌবনের রচনা হলেও 'চন্দ্রনাথ' যেহেতু লেখকের পরিণত মন ও শিল্পদৃষ্টির দ্বারা বিশোধিত, একে সেই হিসাবেই বিচার করতে হবে।

( ২ )

বাঙালীর সামাজিক-পারিবারিক জীবনের বস্তুনিষ্ঠ আলেখ্য অঙ্কনে শরৎচন্দ্রের অনায়াস-নৈপুণ্য অবিসংবাদিত সত্য। সাহিত্যের মধ্যে বিষয়টিকে গ্রাহ্য করে তুলতে গিয়ে কিছু কিছু অতিরঞ্জনের আশ্রয় তিনি নিয়েছেন, কিন্তু তাতে সামগ্রিকভাবে রচনার বস্তুগত ভিত্তি শিথিল হয় নি। বাঙালীর সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বহুবিধ সমস্যাকে শরৎচন্দ্র খুব নিকট থেকে দেখে-ছিলেন এবং আপন বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে তাঁর রচনার বিষয়ীভূত করেছিলেন। একটি বিশেষ যুগের বাংলাদেশের সামাজিক-পারিবারিক জীবনের ইতিহাস রচনা করতে গেলে তাঁর সাহিত্য থেকে বহু উপকরণ মিলবে।

সমাজের নিষ্ঠুর পাষাণবেদিমূলে কত অসহায় মানবজীবনের করুণ অপ-চয় শরৎচন্দ্র দেখেছেন এবং সেই বেদনায় তিনি প্রবলভাবে আলোড়িত হয়েছেন। সমাজশক্তির সে নিপীড়ন কোথাও সবলকর্তৃক দুর্বলের নিষ্পেষণরূপে দেখা দিয়েছে, কোথাও ধনী-কর্তৃক নির্ধনের উপর শোষণরূপে, কখনও উচ্চবর্ণ-কর্তৃক নিম্নবর্ণের উপর অথবা হিন্দু-কর্তৃক মুসলমানের উপর অত্যাচাররূপে, কোথাও বা পুরুষ-কর্তৃক নারীর নির্যাতনরূপে। এখানে কুলত্যাগিনী মায়ের অপরাধে কন্যার লাঞ্ছনা ঘটে, নারীর সাময়িক পদস্খলন তার চরিত্রবিচারে শেষ কথা হয়ে থাকে, নারীত্ব বা মনুষ্যত্বের চেয়ে তথাকথিত সতীত্বের মূল্য বড়ো হয়ে দেখা দেয়। এ সমাজকে শরৎচন্দ্র দেখেছেন। তাঁর প্রথম পর্বের রচনার মধ্যে 'চন্দ্রনাথে'ই সমাজ-সমস্যার দিকটি তুলনামূলকভাবে সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে।

পরবর্তী 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটিও প্রায় একই সময়ে লেখা শুরু হয়েছিল এবং এতে সমাজ-সমস্যার ব্যাপ্তি ও গভীরতা আরও বেশি। 'চন্দ্রনাথে' শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন, ব্যক্তি-মানুষের বিচার করে যে-সমাজ, সে-সমাজ যেমন হৃদয়হীন, তেমনি পক্ষপাতদুষ্ট। কোনো নৈতিক ও নিরপেক্ষ মানদণ্ড তার নেই। তাই একই অপরাধে পুরুষ ও নারীর, ধনী ও দরিদ্রের পৃথক ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থাকে সমাজ সযত্নে লালন করে এসেছে। তার মনে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি, অন্যকেও প্রশ্ন তুলতে দেয়নি। চরিত্রবিশেষের মুখ দিয়ে শরৎচন্দ্র স্পষ্ট করেই বলিয়েছেন —'সমাজ আমি, সমাজ তুমি।...যার অর্থ আছে সেই সমাজপতি। আমি ইচ্ছা করলে তোমার জাত মারতে পারি, আর তুমি ইচ্ছা করলে আমার জাত মারতে পার। সমাজের জন্য ভেব না।' কথাগুলি মণিশঙ্কর বলেছেন চন্দ্রনাথকে—এক জমিদার আর এক জমিদারকে বলেছেন। এ থেকে সমাজশক্তির স্বরূপটি বোঝা যায়। শরৎচন্দ্র এ উপন্যাসে সমাজশক্তির এই বিকৃত রূপটিকে উদ্‌ঘাটনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। পরবর্তী উপন্যাসধারায় তাঁর এই সমাজচেতনা আরও প্রখর রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসের উপসংহারের চিত্রে শিল্পগত ত্রুটি আছে, কিন্তু অসহায়া নিরপরাধা সরযূকে শরৎচন্দ্র সমাজশক্তির আঘাত থেকে যে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে চেয়েছেন এ সত্যটি সুস্পষ্ট এবং এর মধ্য দিয়ে তাঁর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

আপন অভিজ্ঞতা-উপলব্ধির প্রেরণাতেই শরৎচন্দ্র এ উপন্যাস লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'ত্যাগ' গল্পটিরও (বৈশাখ ১২৯৯) কিছু পরোক্ষ প্রভাব থাকা সম্ভব।

( ৩ )

'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসের গঠন অত্যন্ত সরল। ঘটনা-অংশ খুবই সংক্ষিপ্ত। চন্দ্রনাথ-সরযূর মূল কাহিনীতে কোনো উপকাহিনী সংযোজন করে একে বিস্তারের চেষ্টা নেই। মণিশঙ্কর, হরকালী, হরদয়াল, রাখাল ভট্টাচার্য ও কৈলাস—ঘটনাধারায় এদের কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, কিন্তু অত্যন্ত সংক্ষেপেই ঔপন্যাসিক সে-সব কথা বলেছেন। চন্দ্রনাথ-সরযূর দাম্পত্য জীবনের একটি সমস্যা তিনি এখানে দেখাতে চান—তাঁর দৃষ্টি সেদিকেই নিবদ্ধ। প্রথম পর্বে সমস্যাটিকে তিনি অল্প আয়োজনে এবং সরাসরি উপস্থাপন করেছেন। সে উপস্থাপনায় তাঁর শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় মেলে, কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে যেখানে সমাধানের চিত্র আঁকা হয়েছে, সেখানে তাঁর সাফল্য অনুরূপ নয়। চন্দ্রনাথ-সরযূর দাম্পত্য সম্বন্ধের স্বরূপটি নিপুণতার সঙ্গে ঔপন্যাসিক উদ্‌-ঘাটন করেছেন। স্ত্রীর প্রতি চন্দ্রনাথের মনোভাবে সমবেদনা ও করুণার অনু-ভূতি মিশে আছে—এ মনোভাব প্রকৃত প্রেমের বোধে রূপান্তরিত হয়নি। ঔপ-ন্যাসিকের বিশ্লেষণে—"দুঃখীকে দয়া করিয়া যে গর্ব, যে তৃপ্তি বালিকা

সরযূকে বিবাহ করিবার সময় একদিন আত্মপ্রসাদের ছদ্মবেশে চন্দ্রনাথের নিভৃত অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল, এখন শত চেষ্টাতেও চন্দ্রনাথ তাহার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিতে পারে না।" অন্যদিকে মায়ের কুলত্যাগের ইতিহাস পিছনে রেখে সরযূও সহজভাবে স্বামীর কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেনি। তাছাড়া, স্বামীর প্রতি তার কৃতজ্ঞতাবোধ এতই প্রবল যে একে অতিক্রম করে তার ভালোবাসা কখনই বাইরে মুখর হয়ে ওঠেনি। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ভিতর একটি ফাঁক রয়ে গেছে—'একটা দূরত্ব একটা অন্তরাল' কিছুতেই ঘোচেনি। পারস্পরিক প্রেমে যদি তাদের দাম্পত্য সম্বন্ধটি গড়ে উঠত, তাহলে সমাজশক্তি এত সহজে বিজয়ী হতে পারত না। শরৎচন্দ্র তাঁর নায়ক-নায়িকার দুর্ভাগ্যকে এভাবে মনস্তত্ত্বসম্মত ব্যাখ্যার উপর দাঁড় করিয়েছেন।

এই করুণসপ্রধান কাহিনীতে লেখক সর্বত্রই বেশ সংযম দেখিয়েছেন—ঘটনা ও চরিত্র-ব্যাখ্যায়, পরিস্থিতি-নির্মাণে তাঁর পরিমিতিবোধের পরিচয় মেলে। এর সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ-দৃশ্যটি। অত্যন্ত সংযত ভঙ্গিতে দুটি নর-নারীর বেদনা, ক্ষোভ ও অভিমানকে শরৎচন্দ্র সার্থক রূপদান করেছেন। বিশ্বাসভঙ্গের আকস্মিক আঘাতে বিমূঢ় চন্দ্রনাথ প্রবঞ্চনার দাহ, আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনা নিয়ে এ দৃশ্যে অবিস্মরণীয় মূর্তিতে উপস্থিত। তার বিপরীতে সরযূও তার প্রেম, মাধুর্য ও অবিচল সহিষ্ণুতায় মহিমার প্রতিচ্ছবি।

স্নিগ্ধ গার্হস্থ্য রসের চিত্র অঙ্কনে শরৎচন্দ্রের স্বাভাবিক নৈপুণ্য এ উপন্যাসেও চোখে পড়ে। কৈলাস, সরযূ ও বিশেশ্বরকে নিয়ে বেশ সহজেই পারিবারিক জীবনের এক টুকরো মধুর ছবি পাঠককে উপহার দিয়েছেন। কৈলাস চন্দ্রের মৃত্যু-দৃশ্যটিও পৃথকভাবে দেখলে অত্যন্ত সার্থক শিল্পগুণান্বিত সৃষ্টি, তবে দৃশ্যটি নিতান্ত অনিবার্য নয়—এ আতিশয্যটুকু উপন্যাসে রয়ে গেছে। সম্ভবতঃ নায়ক-নায়িকার পুনর্মিলনের পরেও ঔপন্যাসিক এমন একটি চরিত্রকে ভুলে থাকতে পারেননি, তাই উপসংহারে তাঁর পরিণতির চিত্রও এঁকেছেন। চিত্রটি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত ছোটগল্প 'সম্পত্তি-সমর্পণে'র শেষ দৃশ্যটি স্মরণ করিয়ে দেয়।

উপন্যাসের ঘটনাধারায় মিলনান্তক পরিণামই একমাত্র দুর্বল অংশ। সামাজিক বিধানের কাছে যে চন্দ্রনাথ একদা নতি স্বীকার করে স্ত্রীকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল, প্রেমের শক্তিতে বলীয়ান হয়েই সে আর-একদিন তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে, স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনবার মতো সাহসী হতে পারে। কিন্তু সেই সত্যোপলব্ধির দিকটি চরিত্রে পরিস্ফুট নয়। ফলে সমস্যার সমাধান সরলীকৃত ও আকস্মিক মনে হয়। সরযূকে ত্যাগ এবং সরযূকে পুনর্গ্রহণ—এ দুটি ঘটনার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়নি। পুরাণকাহিনীর পতি-পরিত্যক্তা সীতা ও

শকুন্তলার জীবনে সন্তানকে কেন্দ্র করে যে ভাবে স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলনের সুযোগ এসেছিল, সেই ভাবসত্য 'চন্দ্রনাথে'র লেখককেও প্রভাবিত করে থাকতে পারে, কিন্তু চরিত্র-ব্যাখ্যায় প্রয়োজনীয় গভীরতার অভাব অনুভূত হয়। উপন্যাসের মিলনান্তক পরিণতিকে লেখক অনিবার্য ও গভীর করে তুলতে পারেননি। সমস্যাটি তিনি যেভাবে তুলে ধরেছিলেন, তাতে সমাজ-ভাবনার ক্ষেত্রে এ উপন্যাসের কাছে অনেক বড়ো প্রত্যাশা ছিল।

শিল্পরীতির অন্যক্ষেত্রে—পরিস্থিতি নির্মাণে, সংলাপ রচনায় ঔপন্যাসিকের শক্তিমত্তার পরিচয় মেলে। নাটকের মতো সংক্ষিপ্ত, তীব্র ও জোরালো সংলাপের সাহায্যে ঔপন্যাসিক চরিত্রকে উদ্‌ঘাটন করেছেন। আবার বর্ণনার ক্ষেত্রে ভাষায় যথোচিত পার্থক্যও রক্ষা করেছেন।

( ৪ )

চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রেও শরৎচন্দ্রের এ উপন্যাসে সাফল্য যথেষ্ট। নায়ক চন্দ্রনাথ-চরিত্রটি প্রথম পর্বে সুবিশ্লেষিত। সরযূকে সে সহানুভূতির বশে বিবাহ করেছে সত্য, কিন্তু তাকে সে ভালোবাসতেও চেয়েছে। বালিকাবধূর কাছ থেকে যে আবেগ ও উচ্ছ্বাস সে প্রত্যাশা করেছিল, তা পায়নি। সরযূ দূরে দূরে থাকে, ভয়ে ভয়ে থাকে। প্রেমিকের হৃদয় তাই শূন্য রয়ে গেছে। গভীর বেদনায় সে সরযূকে বলেছে, "আমার ঘুমন্ত মুখে ভাল ক'রে চেয়ে দেখো—এ মুখে ভয় করবার মত কিছু নেই। বুকে শুয়ে আছ, ভিতরের কথাটা কি শুনতে পাও না ? তাই বড় দুঃখ হয় সরযূ, আমাকে তুমি বুঝতেই পারলে না।" কিন্তু এই ক্ষোভ ও বেদনাকে চন্দ্রনাথ কখনও প্রবল হতে দেয়নি। সে এই বলে নিজেকে প্রবোধ দিয়েছে যে সকলের স্ত্রী-ভাগ্য একরূপ নয়। তার ভাগ্যে 'একটি পুণ্যবতী পবিত্রা, সাধ্বী এবং স্নেহময়ী দাসী' মিলেছে এবং একে নিয়েই সে সুখী হতে চেষ্টা করবে। সে বিশ্বাস করে সরযূ তার 'জন্ম-জন্মান্তরের পতি-ব্রতা স্ত্রী'। সরযূর প্রতি তার স্নেহ, সহানুভূতি ও মমত্ববোধে এতটুকু ফাঁক নেই।

তারপর যেদিন সরযূর মায়ের কলঙ্ক-কাহিনী তার কানে এসেছে, সেদিন সে পুরুষোচিত দৃঢ়তায় সমাজের আঘাতের বিরুদ্ধে সরযূকে রক্ষা করতে কৃতসংকল্প হয়েছে। সমাজপতি পিতৃব্য মণিশঙ্করকে সে বলেছে—সরযূকে সে কোনোমতেই ত্যাগ করতে পারবে না। কিন্তু সমাজে বাস করে এভাবে যে সরযূকে রক্ষা করা সম্ভবও নয় সে কথাও ক্রমে তার মনে হয়েছে। দীর্ঘকালের সংস্কার জয় করা সহজ নয়। তবু সরযূ-হীন একক জীবনের ভার অতঃপর বয়ে বেড়াতে হবে, একথা ভাবতেও তার ভয় হয়। তখনও মনের মধ্যে একটি বিশ্বাসের আশ্রয় জাগিয়ে রাখে—সরযূ এ-সব কথা জানে না, সুতরাং সরযূর

তরফে কোনো অপরাধ নেই। কিন্তু এ বিশ্বাসটুকুও যখন ভেঙে গেছে তখন চন্দ্রনাথ উন্মাদপ্রায়। সরযূ সব জেনেও এ ইতিহাস গোপন করে রেখেছে তার কাছ থেকে যে আবেগ ও উচ্ছ্বাস সে প্রত্যাশা করেছিল, তা পায়নি। সরযূ দূরে এখন কি করলে সে শান্তি পায় তা নিজেও সে বোঝে না। সরযূ বিষপানে আত্মহত্যার কথা বলেছে—চন্দ্রনাথ বলেছে সে-ই ভালো। বিষপানের সময় সরযূ ঘরের দরজা-জানালা যেন বন্ধ করে দেয়, একটুকুও শব্দ যেন বাইরে না আসে। আবার গভীর রাত্রিতে স্ত্রীর কক্ষে প্রবেশ করে উন্মত্ত আবেগে তাকে কাছে টেনে নিয়ে বলেছে—এমন কাজ কোরো না সরযূ, কখনো না। চন্দ্রনাথের এ মূর্তি লেখকের অসামান্য সৃষ্টি।

কিন্তু এর পববর্তী অধ্যায়ে চরিত্রটি নিষ্প্রভ। বিশেষ করে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনবার মুহূর্তে তার মনোভাব স্পষ্ট নয়। উপন্যাসের ঘটনাধারা অনুসরণ করলে দেখা যায়, অস্থির মন নিয়ে সে কাশী গেছে—সরযূকে দেখতে। সেখানে গিয়ে স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছে এবং তখনই সে এদের সঙ্গে নিয়ে আসার সংকল্প গ্রহণ করেছে। যে কলঙ্কের জন্য একদিন সে সরযূকে ত্যাগ করেছিল সে সম্পর্কে এখন তার মনোভাব কি? যে সমাজের ভয়ে সরযূকে নির্বাসনে পাঠাতে হয়েছিল, তার বিরুদ্ধেই বা এখন কোন্ শক্তিতে সে দাঁড়াবে? অথচ এ ভয় যে সম্পূর্ণ সে জয় করেছে তাও নয়। ভয় তার ছিল ছিল, বাড়ি ফিরে এসে মণিশঙ্করের আশ্বাসে সে ভয় দূরে গেছে। সুতরাং উপসংহারে প্রেমের শক্তির জয় ঘটেছে একথা বলা যায় না। ঔপন্যাসিক তাঁর নায়ক-চরিত্রে সম্ভবতঃ একটি আদর্শের প্রতিষ্ঠা দেখাতে চেয়েছিলেন—পরিণতি-নিয়ন্ত্রণে তার ভূমিকাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। নায়ক-চরিত্রের নামে উপন্যাসের নামকরণে এর পরোক্ষ সমর্থনও মেলে। কিন্তু চরিত্র-ব্যাখ্যা এদিক থেকে অসম্পূর্ণ।

সরযূ-চরিত্রটি সুপরিকল্পিত। চন্দ্রনাথের স্ত্রী হবার সৌভাগ্য সরযূর পক্ষে কল্পনাতীত। স্বামীর অপরিমিত স্নেহে-ভালোবাসায় সে পূর্ণ। কিন্তু মনের ভিতর সর্বদাই একটি ভয় লুকিয়ে আছে—মায়ের কলঙ্ক-কাহিনী যদি প্রকাশ পায় তাহলে এ সৌভাগ্য মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। স্বামীর কাছে কিছুতেই তাই সে সহজ হতে পারে না। স্বামীর প্রেমাবেগের প্রতিদানের ভাষা তার অজানা নয়, কিন্তু সে প্রকাশ উচ্ছ্বাসহীন। একদিকে স্বামীর প্রতি তার কৃতজ্ঞতাবোধ প্রেমবোধের চেয়েও প্রবল, অন্যদিকে মায়ের কলঙ্কিত ইতি-হাসের পশ্চাৎপটে তার ভীরু মন আকস্মিক বিপর্যয়ের আশঙ্কায় সর্বদাই সংকুচিত। তার প্রেমানুভূতি অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো লোকচক্ষুর আড়ালে নিত্যবহমান, কিন্তু চন্দ্রনাথ তার সন্ধান পায়নি। সরযূ যেমন স্বামীকে

সম্পূর্ণরূপে চিনতে পারেনি, চন্দ্রনাথও তেমনি সরযূকে সম্যক বুঝতে পারেনি। স্বামী স্ত্রী—উভয়েরই দুর্ভাগ্য!

অন্যত্র—যেখানে সরযূর মনে কোনো আশঙ্কা বা উদ্বেগ নেই, সেখানে সে তার স্বাভাবিক গৌরবে অধিষ্ঠিতা। সাংসারিক ক্ষেত্রে চন্দ্রনাথের মাতুলানী হরকালী তাকে অঘোষিত 'চ্যালেঞ্জ' আহ্বান জানিয়েছেন—সরযূ অত্যন্ত সহজে সেখানে বিজয়িনী। হরকালী যতই কর্ত্রীত্ব করুক, সরযূই যে এ সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী, এ কথা সরযূ তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে। আর স্বামীর ব্যাপারে হরকালীর অনধিকার প্রবেশ তো কোনমতেই ঘটতে দেয়নি। সংসারের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বালিকা সরযূ ধীরে ধীরে পরিণত নারীতে রূপান্তরিতা হয়েছে। আশ্চর্য নয়, যেদিন সযত্ন-রক্ষিত অতীতের গ্লানিময় অধ্যায়ের যবনিকা উন্মোচিত হয়েছে সেদিন আর তার মধ্যে ভীরুতা নেই। সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভাগ্যকে বরণ করে নেবার সাহস সে দেখিয়েছে। স্বামীর সম্মান রক্ষায় সে সব-কিছু করতে পারে। স্বামীর প্রতি তার অভিযোগ নেই, কিন্তু স্বামীকে ছেড়ে যেতে বেদনা আছে। সে বিষপানে আত্মহত্যা করতে প্রস্তুত—স্বামীর যাতে কোনো বিপদ না ঘটে, এ জন্য সে স্বীকারোক্তিমূলক পত্রও লিখে রেখে যাবে, কিন্তু তবু মনের গোপনে আশা করেছে স্বামীর ভালোবাসা অভেদ্য বর্মের মতো তাকে সমাজের আঘাত থেকে যদি রক্ষা করে। এভাবে যেখানে চরিত্রের হৃদয়রাজ্যের গভীরে শরৎচন্দ্র প্রবেশ করেছেন, সেখানে তাঁর অসামান্য অধিকারের পরিচয় রেখেছেন।

স্বল্প রেখায় শরৎচন্দ্র গৌণ চরিত্রগুলি উজ্জ্বলরূপে এঁকেছেন। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক।

> দয়াল লোকটার মুখের পানে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। মনে হইল, যেন ইহারই নাম রাখাল। বলিলেন, তুমি কি ব্রাহ্মণ?
>
> লোকটা মলিন উড়ানির ভিতর হইতে অধিকতর মলিন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন যজ্ঞোপবীত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, না, গোয়ালা!
>
> দয়াল একটুখানি সরিয়া বসিয়া বলিলেন, তোমাকে দেখে চামার বলে মনে হয়েছিল। যা হোক্, নমস্কার।
>
> সে ব্যক্তি রাগ করিল না। বলিল, নমস্কার। আপনার অনুমান মিথ্যা নয়, আমাকে চামার বলাও চলে, মুসলমান খৃষ্টান বলাও চলে। আমি জাত মানিনে—আমি পরমহংস।
>
> তুমি অতি পাষণ্ড।
>
> সে বলিল, সে কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন দেখচি না, কেননা, ইতিপূর্বে অনেকেই অনুগ্রহ করে ও কথা বলেছেন। কি ছিলাম, কি হয়েচি, তা এখনো বুঝিনি। কিন্তু আমিই রাখাল দাস।

শুধু রাখাল নয়, অন্যান্য অপ্রধান চরিত্রগুলিও যথাযথ। ভালোমানুষ ব্রজকিশোর ও তার স্বার্থপর বিষয়বুদ্ধিসম্পন্না স্ত্রী হরকালী, খলস্বভাব পাষণ্ড রাখাল ভট্টাচার্য, আত্মকেন্দ্রিক সংস্কারান্ধ হরিদয়াল, সংস্কারমুক্ত উদারপ্রাণ কৈলাস, দোষেগুণে জড়িত জমিদার মণিশঙ্কর, সুরসিকা স্নেহশীলা ঠানদিদি হরিবোলা—সব ক'টি চরিত্রই স্বল্প পরিসরের মধ্যেও উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত। এদের মধ্যে কৈলাস বিশেষভাবে উল্লেখ্য। চরিত্রটির মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্রের মানবিকতার আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে। এজন্য উপন্যাসের চরিত্রের স্বাভাবিকতা তাকে বর্জন করতে হয়নি। রক্তমাংসের সাধারণ বাস্তব মানুষরূপেই তাকে চেনা যায়। লোকপ্রচলিত সংস্কার নয়, হৃদয়ধর্মই কৈলাসের কাছে বড়ো। রাখাল ভট্টাচার্য যখন কুলত্যাগিনী বিধবাকে আশ্রয় দেওয়ার ঘটনা নিয়ে হরিদয়ালকে ভয় দেখিয়েছে, তখন জাতি ধর্ম ও জীবিকা রক্ষার ভাবনায় হরিদয়াল অস্থির হয়ে উঠেছেন। কৈলাস তাঁকে অত্যন্ত সহজেই বলেছেন—"এতটা বয়স জাত ছিল, বাকী দু'চার বছর না হয় নাই রইল. বাবাজী, এতই কি তাতে ক্ষতি?" আর সমাজের চোখে জাতি ধর্ম রক্ষার চেয়েও একজন অনাথাকে আশ্রয় দেওয়া তাঁর ধারণায় অনেক বড়ো কাজ। তা ছাড়া, সমাজের বিচারের মানদণ্ডকেও তিনি অভ্রান্ত বলে মনে করেন না। মানুষ মাত্রেরই দোষ-গুণ থাকে, পাপ-পুণ্য থাকে। সাময়িক স্খলন দেখেই তার সম্পর্কে শেষ বিচার করা যায় না। দেবতার পূজারী হয়েও হরিদয়াল যে সত্য দেখতে পাননি, আপন হৃদয়ানুভবের পথে কৈলাস সে সত্যকে লাভ করেছেন। মানবমহিমায় বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করে চরিত্রটি যেমন পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, তেমনি তার সরল. আত্মভোলা. স্নেহপ্রবণ স্বভাব নিয়ে মুহূর্তে পাঠকের অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। এ-শ্রেণীর চরিত্রে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত অনায়াসে সফল।

'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের পরিণত শক্তির স্পর্শ অনেক স্থলেই অনুভব করা যায়। বিষয়বস্তু হিসাবে সমাজশক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তির অসহায়তা ও দুর্গতির চিত্রাঙ্কনে শরৎচন্দ্রের আগ্রহের কথা সুপরিজ্ঞাত। এখানেও তিনি সেই বিষয়-পরিধির মধ্যে বিচরণ করেছেন। তবে এ-সব ক্ষেত্রে সমাজের রক্ষণশীলতাকে তিনি সাধারণত যেভাবে নাড়া দিয়ে থাকেন, এখানে তা পারেননি। উপন্যাসের কাহিনীটি 'সুমিষ্ট' সন্দেহ নেই. কিন্তু পরিণতির চিত্রে ব্যক্তির মহিমা প্রতিষ্ঠিত হয়নি—সমাজ বনাম ব্যক্তির সম্পর্কটি অস্পষ্ট রয়ে গেছে। স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলনের ঘটনায় কিছু গোঁজামিল এড়ানো যায়নি।

এ ত্রুটি উপেক্ষণীয় নয়। তবু এ দুর্বলতাটুকু বাদ দিলে 'চন্দ্রনাথ' মোটামুটি উপভোগ্য রচনা। বাঙালীর সাধারণ সংসারজীবনের মাধুর্য ও উদারতা, আবার কুৎসিত ইতরতা ও স্বার্থলোলুপতা দুই-ই শরৎচন্দ্র চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন। এ-জাতীয় চিত্রে কিছু আতিশয্য থাকে এবং পাঠক তা মেনে

নেয়। শরৎচন্দ্র পাঠকের হৃদয়জয়ের এ কৌশলটি ভালোই জানেন। 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসটিকে সামনে রেখে শরৎচন্দ্র ভালো উপন্যাস বলতে কি বোঝেন তার মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, ভালো উপন্যাস ও মহৎ উপন্যাস এক নয়। মহৎ উপন্যাস দেশকালাতিশায়ী একটি বৃহৎ জীবনের বোধে পাঠককে উদ্দীপ্ত করে। 'চন্দ্রনাথ'-এ শরৎচন্দ্রের এরূপ কোনো অভিপ্রায়ও ছিল না। পাঠকের হৃদয়াবেগ তিনি পরিতৃপ্ত করতে চেয়েছেন এবং তা তিনি পেরেছেনও।

# স্মৃতিচিত্র

গোপালচন্দ্র রায়

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহে তাঁর বাজে শিবপুরের প্রতিবেশী ও পরম স্নেহাস্পদ অমরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে আমি অসংখ্যবার গেছি। অমরবাবুও অকৃপণভাবেই আমাকে শরৎচন্দ্রের বহু কথা বলেছেন। অমরেন্দ্রবাবুর জবানিতে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

শরৎচন্দ্র বাজে শিবপুরে আসার কয়েক বছর পরেই যখন তাঁর আরও নাম হল, তখন দেখেছি কত মাসিক পত্রিকার সম্পাদক তাঁদের কাগজের জন্য তাঁর কাছে লেখা চাইতে, কত সভাসমিতির উদ্যোক্তা তাঁদের সভায় তাঁকে সভাপতি করবার অনুরোধ নিয়ে, আর অমনিও কত লোক যে তাঁকে শুধু দেখতেও আসতেন, তার ইয়ত্তা নেই। দেশের নানা স্থানের, বিশেষ করে হাওড়া শহরের সাহিত্যিকরা তো প্রায়ই তাঁর কাছে আসতেন। হাওড়ার সাহিত্যিকদের মধ্যে বাজে শিবপুরে আমাদের প্রতিবেশী কবি গিরিজাকুমার বসু ঘন ঘন আসতেন। গিরিজাবাবু খুব গল্পুটে মানুষ ছিলেন, তিনি এলে সহজে উঠতে চাইতেন না। এই গিরিজাবাবুর মতো আরও যাঁরা এসে অযথা শরৎচন্দ্রের সময় নষ্ট করে যেতেন, তাঁদের সচেতন করবার জন্যই শরৎচন্দ্র একদিন আমাকে বললেন —খাঁদু, একটা কাজ করো তো। একটা সাদা কাগজে বড় বড় করে লেখো— 'আমারও কাজ আছে।' লিখে আমার এই বসবার চেয়ারের পিছনে মাথার উপর দেয়ালে ঝুলিয়ে দাও।

শরৎচন্দ্রের কথামতো আমি ঐ কথা লিখে টাঙিয়ে দিয়েছিলাম। লেখাটা অনেক দিন ছিল। দেখেছিলাম, ফল ভালোই হয়েছিল। কারণ, গিরিজাবাবু ঘন ঘন আসা এবং এসে বহুক্ষণ থাকা দুইই কমিয়ে দিয়েছিলেন। অন্যান্যরাও এসে প্রয়োজনমতো কথা বলেই চলে যেতেন।

## ট্রামে একদিন

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রায় মাঝামাঝি সময়ের একদিনের কথা। শরৎচন্দ্র তখন তাঁর কলকাতার বালীগঞ্জের বাড়িতে বাস করছেন। সেদিন রবিবার বিকালে তিনি কোথায় যেন গিয়েছিলেন; কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন ট্রামে। ট্রাম বাড়ির কাছাকাছি এলে, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ও পন্ডিতিয়া রোডের সংযোগস্থলের স্টপেজে নামবেন বলে একটু আগে থেকেই উঠে গেটের কাছা-

কাছে এসেছেন। এমন সময় তাঁর সামনে বসা এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক সামনের সিটের এক যুবকের উপর চটে গিয়ে তাঁকে তিরস্কার করে বলছেন—বলি খুব তো তন্ময় হয়ে বই পড়ছেন মশায়, এদিকে আপনার হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা যে আমার নতুন জামাটা পুড়িয়ে দিল, সে হুঁশ আছে!

যুবকটি বইটা মুড়ে প্রৌঢ় ভদ্রলোককে বললেন—অন্যায় হয়ে গেছে, ক্ষমা করবেন। সত্যিই বইটা পড়তে পড়তে বইয়ের মধ্যে এমনি ডুবে গেস্‌লাম যে, খেয়ালই ছিল না হাতে সিগারেটটা আছে।

শরৎচন্দ্র যুবকটির হাতের মোড়া বইটির মলাটের উপর দৃষ্টি দিতেই দেখতে পেলেন, তাঁরই উপন্যাস—বিপ্রদাস, যা কিছুদিন আগেই প্রকাশিত হয়েছে।

ট্রাম পণ্ডিতিয়া রোডের মোড়ের স্টপেজে এসে গেল। শরৎচন্দ্র নেমে পড়লেন। নামবার সময় বলে গেলেন—জামা পোড়ানোর জন্য যুবকটি দায়ী নয়। দায়ী আমিই।

ট্রামের গেটের নিকটের কয়েকজন আরোহী, যাঁরা শরৎচন্দ্রের ফটো ইতি-পূর্বে দেখেছেন—তাঁরা এই কথা শুনে যুবকটির হাতের বইয়ের দিকে তাকিয়েই সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, ঐ তো শরৎবাবু! ওঁরই বই অত তন্ময় হয়ে পড়-ছিলেন বলে উনি ঐ কথা বলে নেমে গেলেন। আমরা আগে অত খেয়াল করি নি, তাই ওঁকে ট্রামে চিনতেও পারি নি।

এঁদের এই কথায় ট্রামে বসা ও দাঁড়ানো আশপাশের কয়েকজন যাত্রী কৌতূহলী হয়ে চলে যাওয়া শরৎচন্দ্রকে দেখতে লাগলেন। যাঁর জামা পুড়ে-ছিল সেই প্রৌঢ ভদ্রলোকও ট্রামের জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে শরৎচন্দ্রকে দেখলেন। একটু আগেই জামা পুড়িয়ে দেবার জন্য তিনি যে রাগ করছিলেন, সে রাগ ভুলে গিয়ে এখন হাসতে হাসতে বললেন—ভাগ্যিস্ জামাটায় আগুন লেগেছিল মশায়, তাই বললাম বলেই তো সকলে শরৎচন্দ্রকে দেখতে পেলাম!

এই কাহিনীটি আমি প্রথম শুনি, আমার এক বন্ধু কলকাতার বিখ্যাত অর্থপেডিক সার্জন ডাঃ সমীরকুমার গুপ্ত এম, সি, এইচ, অরথ্ (লিভারপুল), এফ, আর, সি, এস, (ইংলন্ড)-এর কাছে। সমীরবাবু কাহিনীটি শুনিয়ে বলেছিলেন—আমি যখন বৈদ্যবাটী বনমালী মুখার্জী হাই স্কুলে পড়তাম, সেই সময় স্কুলে আমার এক অত্যন্ত ভক্তিভাজন মাষ্টার মশায় নিতাইচরণ সরকারের কাছে এই গল্পটা শুনেছিলাম। আপনি নিতাইবাবুর সঙ্গে দেখা করে কাহিনীটির সত্যতা সম্বন্ধে জেনে নিতে পারেন।

আমি একদিন বৈদ্যবাটী স্কুলে গিয়ে নিতাইবাবুকে সমীরবাবুর বলা এই কাহিনীটা শোনালে, তিনি শুনে বললেন—ঐ কাহিনীটা আমি কোন একটা পত্রিকায় পড়েছিলাম। সে পত্রিকার নাম এবং লেখকের নাম আজ আর মনে নেই।

স্কুলের টিচার্স কমনর‍ুমে বসে নিতাইবাব‍ুর সংগে যখন আমার এই কথা হচ্ছিল, তখন সেখানে উপস্থিত অন্য এক শরৎ-ভক্ত তর‍ুণ শিক্ষক স‍ুরেন্দ্রনাথ ঘোষ আমাকে বললেন—এই কাহিনীটাই আমিও দেবানন্দপ‍ুরে একবারের শরৎ-জয়ন্তীতে একজন সাহিত্যিক বক্তার ম‍ুখে শ‍ুনেছিলাম। সেই সাহিত্যিক ভদ্রলোক কে ছিলেন ঠিক মনে পড়ছে না।

**আত্ম-প্রচারে বিম‍ুখ**

নিজের সম্বন্ধে প্রশংসা শ‍ুনতে মান‍ুষ স্বভাবতঃই ভালবাসে। কিন্তু শরৎ-চন্দ্রের স্বভাব ছিল এর বিপরীত। একবার তিনি এক জায়গায় সম্মান ও প্রশংসার ম‍ুখোম‍ুখি পড়ে, কিভাবে কৌশলে ও নির্বিকারচিত্তে সেখান থেকে চলে এসেছিলেন, এখানে তারই একটা কাহিনী বলছি।

'তপোবন' নামক একটি প‍ুজা-বার্ষিকীতে সাহিত্যিক বিমল মিত্র 'মিথ্যে কথা' নাম দিয়ে এই কাহিনীটি লিখেছেন। বিমলবাব‍ুর এই লেখাটাই এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম।

ছোট থেকে শ‍ুনে এসেছি মিথ্যে কথা বলা পাপ। পড়ে এসেছি—কদাচ মিথ্যা কথা কহিবে না। যে মিথ্যা কথা বলে, কেহ তাহাকে ভালবাসে না।...

কিন্তু মিথ্যে কথাও কত স‍ুন্দর হতে পারে, কত মহৎ কত উদার হতে পারে তা একদিন হঠাৎ দেখতে পেলাম। সেই ঘটনাটিই এখানে বলি।

আমি তখন কলেজে পড়ি। সেই সময়ে আমার বাবার খ‍ুব ভারী অস‍ুখ হলো একটা।..কলকাতার একজন বড় ডাক্তারকে ডাকা হলো। তিনি অনেক-ক্ষণ পরীক্ষা করে একটা লম্বা প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন। তিনি তাঁর কর্তব্য সেরে চলে গেলেন বটে, কিন্তু আমি তা নিয়ে বড় ম‍ুশকিলে পড়লাম। যে দোকানেই যাই, দোকানদার বলে সে ওষ‍ুধ নেই।

খাঁ খাঁ করছে দ‍ুপ‍ুরের রোদ। সারা শরীর গরমে ঝলসে যাচ্ছে।...কিন্তু হতাশ হয়ে ওষ‍ুধ না পেয়ে বাড়িতে ফিরে এলে চলবে না। ওষ‍ুধ আমাকে পেতেই হবে।...দেশপ্রিয় পার্কের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের দিকে একটা দোকানে গিয়ে ঢ‍ুকে পড়লাম শেষ চেষ্টার জায়গা হিসাবে।...একটি খদ্দেরও নেই সেখানে। শ‍ুধ‍ু একজন অল্পবয়েসী কর্মচারী কোলে একটা মোটা বই নিয়ে একমনে পড়ে চলেছে। পেছনে একটা পর্দা ঝ‍ুলছে দ‍ুটো আলমারির ফাঁকের মধ্যে। সেখান দিয়ে ভেতরে কম্পাউণ্ডারের যাওয়া-আসার রাস্তা। ভেতরে পর্দার আড়ালে একজন বৃদ্ধ কম্পাউণ্ডার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিকশ্চার তৈরি করছেন।

আমি গিয়ে আমার প্রেসক্রিপশনখানা এগিয়ে দিয়ে বললাম—দেখ‍ুন তো, এই ওষ‍ুধ আপনাদের এখানে হবে কিনা।

ভদ্রলোকের সময় নেই আমার কথা শোনবার। তিনি সেই একমনে পড়তে পড়তেই নীচু মুখে চেঁচিয়ে ডাকলেন—হরিপদ, দেখ তো ভদ্রলোক কী চাইছেন—

ভেতর থেকে কম্পাউন্ডার হরিপদবাবু এসে কাগজখানা দেখে বললেন—হ্যাঁ, হবে। এক ঘণ্টা সময় লাগবে।

বলে তিনি কাগজখানা নিয়ে চলে গেলেন। আমি চেয়ারে পাখার তলায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কর্মচারী ভদ্রলোকটির অন্য কোন দিকে মন নেই। তিনি একমনে কী একটা বই পড়ে চলেছেন তো পড়েই চলেছেন।

আমার একবার কৌতূহল হল। ভাবলাম ওটা কী এমন বই যেটা পড়তে পড়তে অন্য দিকে চোখ ফেরানো যায় না। একটু উঠে দাঁড়িয়ে দেখি, বইটা অন্য কিছু নয়, উপন্যাস একটা। নাম বিপ্রদাস, লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বিপ্রদাস বইটা তখন নতুন বাজারে বেরিয়েছে।

যাহোক, আমি বসে আছি। হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটলো। অবাক হয়ে চেয়ে দেখলাম, সেই দোকানেরই সিঁড়ি দিয়ে শরৎচন্দ্র ভেতরে ঢুকছেন।

শরৎচন্দ্র তখন বালিগঞ্জের পণ্ডিতিয়ার কোথাও বাড়ি করেছেন শুনেছিলাম। রাস্তায়, সভা-সমিতিতে তাঁকে ততদিনে অনেকবার দেখেছি। তিনি আমার বহুপরিচিত লোক এবং তাঁর লেখারও আমি বহুদিনের পাঠক। তবে আমাকে যে তিনি চেনেন না, সে-কথা বলাই বাহুল্য।

তা তিনি দোকানে ঢুকে কর্মচারীটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—দেখুন তো ভাই, এই ওষুধটা আপনাদের দোকানে হবে কিনা?

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন না। উত্তর দেবার তাঁর তখন সময়ই নেই। তিনি গলার আওয়াজে বুঝলেন, একজন নতুন খরিদ্দার এসেছে, সে কিছু ওষুধ চায়।

তিনি বইতে মুখ রেখেই চেঁচিয়ে ডাকলেন—হরিপদ, দেখ তো ইনি কী চান। বলে আবার সেই বইটা পড়তে লাগলেন, যেমন আগে থেকেই পড়ছিলেন।

কম্পাউন্ডার হরিপদ ওষুধটা বার করে দিতে শরৎচন্দ্র টাকা বার করে দিলেন।

এই কর্মচারী ভদ্রলোক একটু বিরক্ত হলেন। কারণ টাকার ভাঙানি তাঁকেই দিতে হবে। ক্যাশে তো আর হরিপদ হাত দিতে পারে না।

—কত?

হরিপদবাবু বললেন—ওঁকে তের আনা ফেরত দিতে হবে।

চোখ দুটো বইয়ের পাতায় আর হাতে তের আনার খুচরো শরৎচন্দ্রের দিকে এগিয়ে দিতে মুখটা তুলতে হল।

মুখটা তুলে শরৎচন্দ্রকে দেখেই একেবারে চমকে উঠেছে। সে যেন ঠিক

ভগবান দেখার মতো—এমনি মুগ্ধ দৃষ্টি। খানিকক্ষণ কর্মচারী ভদ্রলোকও নির্বাক, শরৎচন্দ্রও নির্বাক। কেউ পয়সা দেয়ও না, কেউ পয়সা নেয়ও না।

হঠাৎ কর্মচারী ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে এতক্ষণে কথা বেরুল। বললেন—দেখুন, কিছু মনে করবেন না? একটা কথা জিজ্ঞেস করব আপনাকে?

শরৎচন্দ্র নির্বিকার দৃষ্টি দিয়ে বললেন—বলুন।

কর্মচারী ভদ্রলোক তখন উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছেন। বললেন—দেখুন, আপনাকে ঠিক শরৎচন্দ্রের মতো দেখতে।

খুচরো পাওনা পয়সাটা আর ওষুধ দুইই তখন শরৎচন্দ্রের নেওয়া হয়ে গিয়েছে। তিনি বললেন—ওই ভুল সকলেই করে।—বলে আস্তে আস্তে দোকানের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর বাড়ির দিকে চলতে লাগলেন।

আমি আর থাকতে পারলাম না। আমার ওষুধ তৈরি তো তখনও অনেক দেরি। আমি একবারে ফুটপাথের ওপর রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম দেশপ্রিয় পার্কের কোণের গেটটা খুলে তিনি পার্কের ভেতর গিয়ে পড়লেন। তারপর ঘাসের ওপরকার যে পায়ে-চলা পথটি ছিল তাই ধরে সোজা উত্তর-পূর্ব কোণের দিকে হেঁটে চলতে লাগলেন। তারপর যতক্ষণ না তাঁর দেহটা অদৃশ্য হয়ে গেল, ততক্ষণ একদৃষ্টে সেই দিকে চেয়ে রইলাম। ভাবতে লাগলাম, আশ্চর্য, মিথ্যে কথাও এত সুন্দর এত মহৎ এত উদার হতে পারে।

# শরৎচন্দ্রের জীবনবৃত্ত

১৮৭৬ দেবানন্দপুরের (হুগলি) এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম (১৫ই সেপ্টেম্বর, বঙ্গাব্দ ১২৮৩, ৩১ ভাদ্র)। পিতা মতিলাল। মাতা ভুবনমোহিনী। পুত্রদের মধ্যে শরৎচন্দ্র জ্যেষ্ঠ।

১৮৮১ গ্রামের প্যারী পণ্ডিতের (বন্দ্যোপাধ্যায়) পাঠশালায় ভর্তি। এক বৎসর পরে পরিবারের সঙ্গে বিহারের ডিহিরিতে গমন।

১৮৮৬ পিতার চাকরি শেষ হলে ডিহিরি থেকে পিতার সঙ্গে ভাগলপুরে প্রত্যাবর্তন। এখানে দুর্গাচরণ বালক বিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে ভর্তি।

১৮৮৭ ছাত্রবৃত্তি পাস। তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি।

১৮৯০ দেবানন্দপুরে প্রত্যাবর্তন। হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্তি। ১৮৯৩ সালে যখন ২য় শ্রেণীর (ক্লাস নাইন) ছাত্র তখন সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত। দারিদ্র্যের জন্যে কিছুদিন পড়া বন্ধ। পরে পুনরায় ভাগলপুরে গিয়ে তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে (বর্তমানের ১০ম শ্রেণী) ভর্তি।

১৮৯৪ মাতুলালয় ভাগলপুর থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ। সাহিত্য-সভার সৃষ্টি ও নেতৃত্ব। 'শিশু' নামক হাতে-লেখা মাসিকপত্রের পরিচালনা।

১৮৯৫-৯৬ তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে ভর্তি। মাতা ভুবনমোহিনীর মৃত্যু (সেপ্টেম্বর)। পরীক্ষার ফী সংগৃহীত না হওয়ায় এফ, এ, পরীক্ষা দিতে পারেন নি।

১৮৯৬-৯৯ বনেলী এস্টেটে কিছুদিনের জন্য চাকরি গ্রহণ। ভাগলপুরে আদমপুর ক্লাবে যোগদান। অভিনয়, খেলাধুলা, সাহিত্যচর্চা ও গানবাজনায় মেতে ওঠেন।

১৯০১ ভাগলপুর থেকে যোগেশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় 'ছায়া' নামে হাতে-লেখা পত্রিকার প্রকাশ। শরৎচন্দ্র উক্ত পত্রিকার সঙ্গে জড়িত এবং অন্যতম লেখক। 'ছায়া'য় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ 'ক্ষুদ্রের গৌরব'। St. C. Lara [(St.=শরৎ, C.=চট্টোপাধ্যায়, এবং Lara=ন্যাড়া (তাঁর ডাকনাম)] ছদ্মনাম গ্রহণ। বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ। সন্ন্যাসিবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ। মজঃফরপুরে অবস্থিতি, প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব।

১৯০২ মজঃফরপুরে অবস্থানকালে পিতা মতিলালের মৃত্যুসংবাদ শুনে ভাগলপুরে গমন। অর্থের সন্ধানে কলকাতায় আগমন। মাসিক ৩০ টাকায় আত্মীয় লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট কর্ম গ্রহণ।

১৯০৩ 'মন্দির' নামক গল্প কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতায় প্রেরণ এবং প্রথম পুরস্কার লাভ। গল্পটি সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে ছাপা হয় (১৩১০ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে)। রেঙ্গুনে মেশো-মশাই অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে গমন (জানুআরি)। বর্মা রেলওয়েতে চাকরি গ্রহণ।

১৯০৫ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু (৩০ জানুআরি)। মাসীমা অন্নপূর্ণা দেবী রেঙ্গুনের বাস উঠিয়ে দিলে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে গভর্নমেণ্ট হাউসের ওভারসীয়ার অন্নদাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের বাড়িতে ওঠেন। রেলওয়ের চাকরি পরিত্যাগ করে বর্মার একজামিনার অব পাবলিক ওয়ার্কস অ্যাকাউণ্টস্ অফিসে চাকরি গ্রহণ (জুলাই)। কিছুদিন পরে সেই চাকরি পরিত্যাগ করে পেগুতে। পেগু-ডিভিশনের এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের অফিসে ৫০ টাকা বেতনে চাকরি গ্রহণ। আড়াই মাস এই অফিসে চাকরি করার পর বেকার হন।

১৯০৬ পুনরায় বর্মার একজামিনার অব পাবলিক ওয়ার্কস অ্যাকাউণ্টস্ অফিসে চাকরি গ্রহণ (এপ্রিল)। শান্তি দেবীকে বিবাহ। ছবি আঁকার চর্চা। প্রথম ছবির নাম 'রাবণ মন্দোদরী'।

১৯০৭ 'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' উপন্যাস প্রকাশ (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩১৪)। এটিই স্বনামাঙ্কিত প্রথম রচনা।

১৯০৮ স্ত্রী শান্তি দেবীর প্লেগে মৃত্যু।

১৯১০ কলকাতায় প্রত্যাবর্তন এবং মেদিনীপুর-নিবাসী কৃষ্ণদাস অধিকারীর (চক্রবর্তী ?) কন্যা হিরণ্ময়ী দেবীকে বিবাহ। স্ত্রীসহ পুনরায় বর্মায় গমন।

১৯১২ কলকাতায় আগমন (ডিসেম্বর)। 'যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালের সঙ্গে পরিচয়। যমুনায় 'বোঝা'র শুভাগমন।

১৯১৩ যমুনায় নিয়মিত রচনা দানের স্বীকৃতি। 'রামের সুমতি', 'পথ-নির্দেশ' প্রকাশ, 'বড়দিদি' প্রকাশ (সেপ্টেম্বর)। ভারতবর্ষে 'বিরাজ-বৌ'।

১৯১৪ যমুনার সম্পাদক (জুন)। 'বিরাজ-বৌ' প্রকাশ (মে)। 'বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য গল্প' প্রকাশ (জুলাই), 'পরিণীতা' (অগস্ট), 'পণ্ডিত মশাই' (সেপ্টেম্বর) প্রকাশ।

১৯১৫ যমুনার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ, ভারতবর্ষে যোগদান, 'মেজদিদি ও অন্যান্য গল্প' প্রকাশ (ডিসেম্বর) প্রকাশ।

১৯১৬ 'পল্লীসমাজ' (জানুআরি), 'চন্দ্রনাথ' (মার্চ) প্রকাশ। অসুস্থ অবস্থায় রেঙ্গুন থেকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে বরাবরের জন্য এদেশে আসেন (১১ই এপ্রিল)। 'বৈকুণ্ঠের উইল' (জুন), 'অরক্ষণীয়া' (নভেম্বর) প্রকাশ। হাওড়ার বাজে শিবপুরে বসবাস। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়।

১৯১৭ 'শ্রীকান্ত' ১ম পর্ব (ফেব্রুআরি), 'দেবদাস' (জুন), 'নিষ্কৃতি' (জুলাই), 'কাশীনাথ' (সেপ্টেম্বর), 'চরিত্রহীন' (নভেম্বর) গ্রন্থের প্রকাশ।

১৯১৮ 'স্বামী' (ফেব্রুআরি), 'দত্তা' (সেপ্টেম্বর), 'শ্রীকান্ত' ২য় পর্ব (সেপ্টেম্বর) গ্রন্থ প্রকাশ।

১৯১৯ 'বসুমতী' কর্তৃক গ্রন্থাবলী প্রকাশের সূচনা।

১৯২০ 'ছবি' (জানুআরি), 'গৃহদাহ' (মার্চ) গ্রন্থের প্রকাশ।

১৯২১ কংগ্রেসে যোগদান।

১৯২২ 'শ্রীকান্ত' ১ম পর্ব, ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস)।

১৯২৩ 'নারীর মূল্য' (এপ্রিল), 'দেনা-পাওনা' (অগস্ট) গ্রন্থের প্রকাশ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' দান।

১৯২৪ 'নববিধান' (অক্টোবর) গ্রন্থ প্রকাশ। নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের সহযোগে 'রূপ ও রঙ্গ' নামক পত্রিকার সম্পাদনা (অক্টোবর)।

১৯২৫ কাশীতে বিশ্বনাথ লাইব্রেরির নবম বার্ষিক সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতিত্ব (২৫ জানুআরি)। মুন্সিগঞ্জে (ঢাকা) অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্য শাখার সভাপতি (১১-১২ এপ্রিল)। পানিত্রাসে গৃহনির্মাণ।

১৯২৬ 'হরিলক্ষ্মী' (মার্চ), 'পথের দাবী' (অগস্ট) গ্রন্থ প্রকাশ। শিলচর ছাত্রসঙ্ঘ কর্তৃক মানপত্র দান। মধ্যম ভ্রাতা প্রভাসচন্দ্রের মৃত্যু।

১৯২৭ 'শ্রীকান্ত' ৩য় পর্ব (এপ্রিল), 'ষোড়শী' [দেনা-পাওনার নাট্যরূপ] (অগস্ট), 'বামুনের মেয়ে' গ্রন্থ প্রকাশ। শিবপুর সাহিত্য সংসদ কর্তৃক সংবর্ধনা (১৩ ফেব্রুআরি)। 'শ্রীকান্ত' ১ম পর্বের ইতালীয় অনুবাদ প্রকাশ। রমাঁ রলাঁ কর্তৃক বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের সম্মান দান।

১৯২৮ 'রমা' [পল্লীসমাজের নাট্যরূপ] গ্রন্থ প্রকাশ। ৫৩তম জন্মদিন উপলক্ষে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে দেশবাসী কর্তৃক সংবর্ধনা।

| | |
|---|---|
| ১৯২৯ | মালিকান্দা অভয় আশ্রমে বিক্রমপুর যুবক ও ছাত্র সম্মিলনীর সভাপতিত্ব (১৫ই ফেব্রুআরি)। রংপুরে বঙ্গীয় যুব-সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব (৩০ মার্চ)। 'তরুণের বিদ্রোহ' প্রকাশ (এপ্রিল)। |
| ১৯৩০ | লাহোর-প্রবাসী বাঙালী সমাজ কর্তৃক অভিনন্দন। |
| ১৯৩১ | 'শেষপ্রশ্ন' (মে) প্রকাশ। রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে মানপত্র রচনা এবং সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতিত্ব গ্রহণ (ডিসেম্বর)। |
| ১৯৩২ | 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থ প্রকাশ (অগস্ট)। কলকাতার টাউন হলে নাগরিক ও সাহিত্যিকগণের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জ্ঞাপন (১৮ সেপ্টেম্বর)। |
| ১৯৩৩ | 'শ্রীকান্ত' ৪র্থ পর্ব (মার্চ) গ্রন্থ প্রকাশ। |
| ১৯৩৪ | ফরিদপুর সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি (২৭ জানুআরি)। 'অনুরাধা, সতী ও পরেশ' গ্রন্থ প্রকাশ (মার্চ)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য মনোনীত (জুলাই)। 'দত্তা'র নাট্যরূপ 'বিজয়া' গ্রন্থাকারে প্রকাশ (ডিসেম্বর)। কলকাতার ২৪ অশ্বিনী দত্ত রোডে নতুন বাড়িতে প্রবেশ। |
| ১৯৩৫ | 'বিপ্রদাস' গ্রন্থাকারে প্রকাশ (ফেব্রুআরি)। |
| ১৯৩৬ | সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে কলকাতার টাউন হলের সভায় উদ্বোধন বক্তৃতা (১৫ জুলাই)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি, লিট, উপাধি লাভ। ঢাকা মুসলিম সাহিত্য-সমাজে সভাপতিত্ব (৩১ জুলাই)। |
| ১৯৩৮ | কলকাতার পার্ক নার্সিং হোমে মৃত্যু (১৬ জানুআরি, ২ মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪)। |